শিক্ষায়

প্রকৃতির পন্থা

চট্টগ্রাম নর্ম্ম্যাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট

শ্রীকুঞ্জবিহারী হার

প্রণীত

চট্টগ্রাম মিণ্টো প্রেসে

কে, বি বসু দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ দেড় টাকা

ভূমিকা।

ফরাসী দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লব পৃথিবী বিখ্যাত ঘটনা। কেবল রাজনীতি ক্ষেত্র বলিয়া নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নানা দিক্ দিয়াই উক্ত দেশে বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এবং ইউরোপের সর্ব্বাংশেই উহার ক্রিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে সমুদয় খ্যাতনামা ব্যক্তি উক্ত পরিবর্ত্তন আনয়নের অগ্রণী স্বরূপ ছিলেন জীন্ জাক রুশো (Jean Jack Rousseau) উঁহাদের অন্যতম। তদানীন্তন রাজনীতি, ধর্ম্ম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন প্রণালীর বিবিধ দোষ দর্শনে তিনি উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই সমুদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার কল্পে যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহার নাম "Emile"

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে "Emile" প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে উহার তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল বটে এবং গ্রন্থকারকে তজ্জন্য বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিলও বটে। কিন্তু কালক্রমে উহার গুণ সমগ্র ইউরোপই অনুভব করিয়াছিল। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক Basedow, Peslatozzi এবং Froebel উহার সারবত্তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রত্যুত তাঁহাদের দ্বারা আদৃত হওয়াতেই উহা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে।

সত্য বটে এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে এমন কথা আছে যাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে, বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের পক্ষে

প্রযোজ্য নহে। স্থল বিশেষে বিসদৃশ ধারণা ও যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন উপদেশ সর্ব্বাংশে কার্য্যক্ষেত্রে গ্রহণোপযোগী বলিয়া মনে হয় না এবং গ্রন্থখানি অনেক স্থলে পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু মোটের উপর গ্রন্থখানি এমন সুচিন্তিত বিষয়ে পরিপূর্ণ, এমন ওজস্বিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত লিখিত যে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই, প্রত্যেক অভিভাবক এবং শিক্ষকেরই উহা একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। আজ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যে যে নীতি গৃহীত এবং যে যে নূতন নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উক্ত গ্রন্থে রুশো প্রায় তাহার সকলগুলিরই অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — শিশুর শিক্ষাদানে ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলে চলিবে না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনে প্রাকৃতিক উন্মেষের অনুবর্ত্তী হইয়া শিশুর শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ছাত্রগণের চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সম্যক্ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা যাহাতে নিজেরা নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে শিখে তাহার বিধান করিতে হইবে। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণ শীলতার কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত রাখিতে হইবে। তাহারা যেন শুধু শব্দ সর্ব্বস্ব বা পুস্তক সর্ব্বস্ব হইয়া না পড়ে। যেন প্রকৃত বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে শিখে। শারীরিক ব্যায়ামকে উচ্চ স্থান দিতে হইবে। শিক্ষা কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ছাত্রের মানসিক ক্ষমতা ও চরিত্রগত বিশেষত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুশাসনের নামে বিবিধ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া শিশুর জীবন বিষাদময় করিয়া তুলিতে হইবে না। প্রফুল্লতা শিশুর জন্মগত অধিকার, উহা হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে না। কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান ঘাড় পাতিয়া লইতে তাহাকে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এক কথায়, প্রকৃতির আদেশ উপদেশ ও ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াই শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

'Emile, পুস্তকখানা বৃহৎ। ইহা পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথমকার তিনভাগে ভূমিষ্ট হওয়া অবধি পঞ্চদশবর্ষ বয়স অর্থাৎ যৌবনোদ্গম পর্য্যন্ত কালের শিক্ষার কথা আলোচিত হইয়াছে। ৪র্থ ভাগে যুবকের শিক্ষা বিধান এবং ৫ম ভাগে স্ত্রীশিক্ষার কথা আছে। ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে এই পুস্তকে ১ম ২য় এবং তৃতীয় ভাগেরই ভাবানুবাদের প্রয়াস পাইয়াছি। মূল গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত এবং পরিবর্ত্তিত করাও হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রথিত নামা রুশোর শিক্ষা বিষয়ক ভাবগুলির আভাস দেওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। তাই স্বীয় ক্ষমতাব সঙ্কীর্ণতাবোধ সত্ত্বেও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছি।

চট্টগ্রাম
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। } গ্রন্থকার

শিক্ষায় প্রকৃতির শিক্ষা

প্রথম ভাগ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

বিশ্বস্রষ্টার হস্ত হইতে সদ্য আবির্ভাব-কালে বস্তুমাত্রই কত মনোরম, কত মধুর থাকে। আর যেই উহা মানুষের হাতে পড়িল, অমনই উহার অধঃপতন আরম্ভ হয়। মানব তূলার জমিতে ধান জন্মাইতে চায়, এক গাছে অন্য গাছের ফল ফলাইতে চায়, জলবায়ুগত, প্রকৃতিগত ও ধাতুভেদগত যাবতীয় বৈষম্য দূর করিয়া ফেলিতে চায়, পশুপক্ষী ও ভৃত্যগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া ছিঁড়িয়া কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ফেলে! বৈসাদৃশ্যেই যেন তাহার আনন্দ। বস্তুর নৈসর্গিক আকার ও প্রকৃতির বিকার সাধন করিতে না পারিলেই যেন তাহার স্বস্তি নাই। এই প্রবল ইচ্ছার হাত হইতে মানবজাতির ও নিস্তার নাই। বাগানের গাছগুলিকে কাটিয়া ছাটিয়া নিজের অভিরুচির অনুযায়ী করিয়া রাখা যেমন মানুষের অভ্যাস, মানুষকেও সেইরূপ কাটিয়া ছাটিয়া নিজের মনোমত করিয়া রাখাতেও তাহার নিয়ত প্রয়াস।

এখন সমাজের অতি শোচনীয় দশা। এই অবস্থায় মানব মানুষ গড়িবার যে চেষ্টাটুকু করিতেছে, তাহাও যদি সে না করিত, তবে শিক্ষার আরও দুরবস্থা ঘটিত। বর্ত্তমান সমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের মত, সাধারণের স্বাধীন মত ও স্বাধীন চিন্তার উপর অদম্য

প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে। দায়ে ঠেকিয়া লোকে প্রভুত্বের নিকট আত্মবলি দিতেছে। কুদৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈদৃশ সমাজে মানুষটিকে আপনার মনে ছাড়িয়া দিলে কি আর রক্ষা ছিল! তাহা হইলে নৈসর্গিক গুণ ও প্রবৃত্তিগুলি একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত, অথচ উহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য আর কিছুই পাওয়া যাইত না। যে পথে মানুষের সর্ব্বদা যাতায়াত, তথায় কোন উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় না, যদিও বা কোনটি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, অবিরত পাদক্ষেপে তাহাও নানাভাবে বক্র হইয়া যায়। বর্ত্তমান সমাজের চাপে মানবের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশেরও সেই অবস্থা ঘটে।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কর্ষণ ও জল সেচনাদির যেমন প্রয়োজন, মানবের উন্নতির জন্য শিক্ষাদানেরও তেমন প্রয়োজন। জন্মিবার কালেই যদি মানব পূর্ণায়তন হইত, তাহার যদি প্রচুর শারীরিক বল থাকিত, তাহা হইলে কখনই উহা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইত না। দেহটা খুব বড় হইলে এবং দেহে খুব বল থাকিলে কি হইবে? সেই বল ও আয়তনের ব্যবহার কি ভাবে করিতে হইবে, তাহার সে শিক্ষা চাই। শৈশবকালেই দেহটা খুব বড় হইলে এবং খুব শক্তি থাকিলে সম্ভবতঃ প্রাপ্তবয়স্ক মানবেরা তাহার সাহায্যার্থ আসিত না। শিক্ষার অভাবে অন্যের সাহায্য-ব্যতীত তাহার পদে পদে অসুবিধা ঘটিত। আমরা সাধারণতঃ আক্ষেপ করি, 'শৈশবকাল কত দুঃখময়' কিন্তু একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা ভুলিয়া যাই। কথাটা এই যে, মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া যদি প্রথম হইতেই পূর্ণবয়স্কের ন্যায় হইয়া জন্মিত, তবে তাহাকে অপরের সাহায্য ব্যতীত অল্প দিন মধ্যেই মরিয়া যাইতে হইত।

জন্মিবার কালে আমরা অতি দুর্ব্বল থাকি। তাই আমাদের বল বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। আমরা নিঃসম্বল হইয়া সংসারে আসি, তাই প্রতি পদে আমাদের পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জন্মিবার সময় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি দুর্ব্বল থাকে, তাই আমাদের বুদ্ধি ও বিচার-

ক্ষমতার প্রয়োজন। এই সব আমরা কোথা হইতে পাই? শিক্ষাই আমাদের এই সমুদয় অভাব পূরণ করে। মোটের উপর জন্মগ্রহণকালে আমাদের যাহা কিছু থাকে না অথচ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে যাহার প্রয়োজন হয়, শিক্ষাই আমাদিগকে সেই সব বিষয় দিয়া থাকে।

শিক্ষার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভবস্থল দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—স্বভাব, পারিপার্শ্বিক জড়জগৎ এবং অন্য মানব। কালক্রমে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্টি লাভ করে। উহাতে অন্যের চেষ্টার কোন কার্য্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের বলেই উহা ঘটিয়া থাকে। তারপর পারিপার্শ্বিক জড়জগৎ হইতে শিশু স্বয়ং অনেক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। শিশু জল, স্থল, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, বন, উপবন ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনার উপলব্ধি করিয়া কতকগুলি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানের সাধারণ নাম অভিজ্ঞতা। তৃতীয়তঃ অভিভাবক শিক্ষক অথবা প্রাপ্তবয়স্ক অন্য কোন লোক প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্বুদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি অবলম্বনে শিশুকে কতকগুলি জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকে এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা প্রাকৃতিক, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং মানবপ্রদত্ত।

এই ত্রিবিধ শিক্ষার মধ্যে প্রাকৃতিক শিক্ষার উপর মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ প্রকৃতির প্রতি হস্তচালনা করিয়া তৎপ্রদত্ত শিক্ষা-ধারার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিশুর অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার উপরও মানুষের হাত এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কারণ, পারিপার্শ্বিক জড়জগতের পরিবর্ত্তন-সাধন মানুষের একপ্রকার অসাধ্য শিশুকে জড়জগতের কেবল নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বস্তুর সম্মুখীন হইতে দিব, কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক ঘটনা উপলব্ধি করিতে দিব, অন্যান্য বস্তু বা ঘটনা-নিচয় হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিব, ইহা কেবল কল্পনারাজ্যেরই কথা। তবে মানব-প্রদত্ত শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত

করার ক্ষমতা মনুষ্যের কতকটা আছে বটে। শিশু যে মানবের সংস্পর্শে আসিবে, সেই মানবই জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, শিশুকে কতকটা জ্ঞান দান করিবে। শিশুর অভিভাবক চেষ্টা করিলে শিশুকে কেবল কতকগুলি মানবের সঙ্গলাভের অধিকারী করিতে এবং কতকগুলি মানবের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত রাখিতে পারেন বটে; কিন্তু তাহাই বা কতটা পারেন?

যে ত্রিবিধ শিক্ষার কথা উল্লিখিত হইল, উহাদের পরস্পরের অনুকূল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উহারা পরস্পর বিরোধী বা বিভিন্ন পথগামী হইলে শিশুর শিক্ষা প্রায় পণ্ড বা অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। মোটের উপর এই ত্রিবিধ শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ঐককেন্দ্রিক করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা বা শিশুর অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার উপর মানুষের কোন হাত নাই, উহারা আপন মনে আপন দিকেই চলিবে। কেবল মানবপ্রদত্ত শিক্ষার উপরই মানুষের কতকটা হাত থাকে। সুতরাং এই শেষোক্ত প্রকারের শিক্ষাকেই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষার অনুগামী করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষার অন্তরালে কি উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যসমাজে নানাবিধ শ্রেণীভেদ আছে—ব্যবসার ভেদ ও কার্য্যভেদের অন্ত নাই। কেহ রাজা কেহবা প্রজা, কেহ আইন-ব্যবসায়ী, কেহবা চিকিৎসক, কেহ বণিক, কেহবা ধর্ম্মযাজক। কিন্তু এই অনন্ত বিভিন্নতার মধ্যে একটা সাধারণধর্ম্ম বিদ্যমান থাকা চাই। রাজাই হউন, প্রজাই হউন, চিকিৎসকই হউন, আর শ্রমজীবীই হউন — সকলকেই মানুষ হইতে হইবে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধারণ ভিত্তির উপরই কার্য্য ও ব্যবসায়গত পার্থক্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া কি করিয়া প্রত্যেক শিশু মনুষ্যত্বের পদবী লাভ করিতে পারে,

শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই হওয়া চাই। প্রকৃতিপ্রদত্ত এবং শিশুর অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলে দেখাযায়, উহাদের উদ্দেশ্য ও তাহার প্রকৃতি শিশুকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতেই চায়।

আমরা দেখিতে পাই মানুষের অবস্থা অবিরত পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে সুখের ক্রোড়ে আনন্দে দিন কাটাইতেছে, কালই হয় তো তাহাকে দুঃখের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে হয়। আজ যে স্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী, কালই তাহাকে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে হয়। মানুষ কখনও বসন্তঋতুর সুখানুভব করে আবার তাহাকে কখনও নিদারুণ গ্রীষ্মের তাপ বা তীব্র শীতের যাতনা অনুভব করিতে হয়। মানুষ যদি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে তবে তাহার বড় দুর্দ্দশা। আবার সুখাতিশয্যে যদি তাহার চিত্ত বিচলিত হয়, তাহাও আর এক প্রকার দুর্দ্দশা। সুতরাং মানুষকে টিকিয়া থাকিতে হইলে বিবিধ সম্পদ্ বিপদ্ সুখ ও দুঃখের মধ্যে পড়িয়া অবিচলিত থাকিতে হইবে। যে তাহা না পারিবে তাহার মনুষ্য হওয়া হইল না। সুতরাং সুখ ও দুঃখের বিবিধ তরঙ্গাঘাতে পড়িয়া ঠিক থাকাই মনুষ্যত্ব। যে শিক্ষায় মানুষকে এই মনুষ্যত্বলাভের উপযুক্ত করে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এবং সর্ব্ববিধ শিক্ষার উদ্দেশ্যও ইহাই। এই শিক্ষা কেবল মুখের কথায় হয় না। জীবনে আচরণ করিতে হয়। দুঃখ ও সুখের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাক্কা খাইয়া সহিয়া থাকা অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে দুঃখ ও সুখের আঘাতের বল বাড়ে এবং সহিতে সহিতে সহ্য করিবার ক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা ও শিশুর অভিজ্ঞতা শিশুকে পূর্ব্বোক্ত সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত করিয়া থাকে। সুতরাং মানবপ্রদত্ত শিক্ষাকেও উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায়, পিতামাতা সন্তানকে আপদ্ বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্যই অতি ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টা-সত্ত্বেও সন্তানকে অসংখ্য আপদ্ বিপদের মুখে পড়িতেই হইবে। সুতরাং কেবল সন্তানের রক্ষা-বিধানে সমস্ত চেষ্টা

প্রয়োগ করিলে চলিবে না। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া যাহাতে আপদ বিপদের হস্ত হইতে নিজে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। সে যেন সম্পদের ও বিপদের কশাঘাত সহ্য করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে বরফময় হিমমণ্ডলে অথবা উষ্ণমণ্ডলের অত্যুষ্ণ স্থানে অনায়াসে বাস করিতে পারে, তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত সাবধান হওয়াই যাউক না কেন, কিছুতেই উহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইবে না। মরে মরুক, কিন্তু যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, যেন মানুষের মতন মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাই চাই। শারীর যন্ত্রগুলির গতি অব্যাহত থাকা আর বাঁচিয়া থাকা এক কথা নহে। মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকার অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিগুলির সম্যক পরিচালনা করা—কার্য্য করা।

যদি কেহ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকেন, অথচ বিশেষ কিছু কাজ করিয়া না থাকেন, তাহাকে দীর্ঘজীবী বলিব না। কিন্তু যিনি অল্প বয়সেই মরিয়া গেলেন অথচ কাজের মত কাজ করিয়া গেলেন, তাহাকেই বরং দীর্ঘজীবী বলিব।

শিশু

মাতৃগর্ভে অবস্থিতিকালে শিশুর দেহ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র গুটাইয়া সমস্ত দেহটা একটা গোলার মত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইলে আর ঐরূপ সঙ্কোচনের প্রয়োজন থাকেনা—তখন দেহের জড়তা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, হাতপাগুলিকে প্রসারিত ও সঞ্চালিত করিবার সুযোগ দিতে হয়। সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি টানিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই শিশুকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কাপড়-চোপড় দিয়া এমনই আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় যে, সে আর অবাধে অঙ্গসঞ্চালন করিতে পারে না। ইহার ফলে শিশুর নানারূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে। দেহের রক্তসঞ্চালন

ক্রিয়ার ব্যাঘাত তাহাদের অন্যতম। পিত্তকোষ এবং আরও কয়েকটী শারীর যন্ত্র হইতে বিবিধ প্রকার রসের উদ্গম শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। অঙ্গ-সঞ্চালনের অভাবে এই সমুদয় রস যথোচিত পরিমাণে নিঃসৃত হইতে পারেনা, সুতরাং যথানিয়মে দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে না। শিশুর মনোবৃত্তির উপরও এই কুপ্রথার ক্রিয়া হইয়া থাকে। জন্মাবধি এইরূপে পিষ্ট ও যাতনাগ্রস্ত হওয়াতে তাহাদের মন অবসন্ন হইয়া পড়ে; ফলে তাহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতার অন্তরায় ঘটে।

এই কুপ্রথার অনুকূলে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে। শিশুর মাথায় টুপি দিয়া রাখিলে এবং হাত পা প্রভৃতি অন্যান্য পরিচ্ছদ দ্বারা আটিয়া রাখিলে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হইয়া উঠে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই অস্বাভাবিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত রাখার ফলে যে গঠন মিলে তাহাই সুগঠন, না প্রকৃতির ক্রোড়ে নির্ম্মুক্তভাবে আপনা আপনি বাড়িয়া উঠিয়া যে গঠন ঘটে তাহাই সুগঠন?

আর এক যুক্তি এই যে, শিশুকে অবাধে অঙ্গসঞ্চালন করিতে দিলে উহাদের হাত-পা প্রভৃতি আহত হয়, এমন কি ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে।—এ কথার ঠিক নহে শিশু অতি দুর্ব্বল; যে পরিমাণ বলের সহিত অঙ্গ সঞ্চালন করিলে আঘাত লাগিবার বা অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা সেই পরিমাণ শক্তি শিশুর নাই। ইতর জন্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করুন্। কুকুর ও বিড়ালছানাগুলি অবাধে অঙ্গ-সঞ্চালন করে, অথচ তাহাদের তো অঙ্গহানি হইতে ও আঘাত পাইতে প্রায়ই দেখা যায় না। তবে কুকুর বিড়াল ছানার তুলনায় মানব শিশু অনেকটা ভারী বটে, কিন্তু শিশুর বল ও দেহের ভারের অনুপাতে অতি কম। তাই শিশু প্রায় নড়িতেই পারে না, কেবল এক স্থানে থাকিয়াই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে মাত্র। আর এক কথা এই যে, যে যে দেশে মানবশিশুকে পরিচ্ছদে আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রথা নাই, সেই সব

দেশের শিশুগণের ত তজ্জন্য অঙ্গহানি হইতে দেখা যায় না, তাহারা পঙ্গু বা বিকলাঙ্গও হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই কুপ্রথার মূল কোথায়? জননী মাতৃত্বের আসন ছাড়িয়া যখন হইতে ধাত্রীর হস্তে শিশুপালনের ভার দিয়াছেন, তখন হইতেই এই কুপ্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এখনকার অনেক মা আর শিশুসন্তানকে নিজের বুকের দুধ দেন না; নিজে আর শিশুকে লালন-পালন করেন না। বেতনভোগী ধাত্রীর স্কন্ধে এই ভার অর্পিত হয়। কিন্তু ধাত্রী কি মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে? তাহার স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ আসিবে কোথা হইতে? শিশুকে কাপড়চোপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধানের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহার হাত-পায়ে আঘাত লাগিবারও সম্ভাবনা থাকেনা। শিশুর পিতামাতাও দেখিতে পান যে, ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে শিশু বেশ নিরাপদে আছে—তাহার অঙ্গে কোন আঘাত নাই, মুখে কান্নাকাটির রবও নাই; ইহাতেই পিতামাতা সন্তুষ্ট। কিন্তু নিরন্তর পরিচ্ছদশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া যে তাহার শরীর ও মনের ভাবীস্বচ্ছন্দতার পথ বন্ধ হইতেছে সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

এই সকল অস্বাভাবিক ব্যবস্থা পারিবারিক জীবনের সর্ব্ববিধ বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ের আর সন্তানেরপ্রতি তাদৃশ নৈসর্গিক স্নেহ নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় আর সেরূপ সদ্ভাব নাই। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম নাই। কাজেই সংসার দুঃখের আগার হইয়াছে। পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে না পারিলে লোকের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। ঘরে ঘরে এখন এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মাতৃগণ আবার ধাত্রীর পরিবর্ত্তে নিজে সন্তান লালন পালনের ভার লউন; তাহা হইলে আবার সব পারিবারিক সুখশান্তি ফিরিয়া আসিবে; সকলে অপত্য-স্নেহের রসাস্বাদ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন, সন্তানগণ মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া মায়ের প্রতি অনুরক্ত হইবে, এক পরিবারে একই

মায়ের কাছে লালিতপালিত হইয়া সহজেই আবার ভাই ভাইকে ভাল বাসিতে শিখিবে। সন্তানগণের লালনপালনের ভার নিজেদের হস্তে লইলে পিতা ও মাতাকে পদে পদে পরস্পরের সাহায্য এবং একত্র অবস্থান করিতে লইবে। সুতরাং স্বামিস্ত্রীর প্রণয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। নৈতিক অধঃপতন নিবারিত হইবে — পারিবারিক জীবন আবার মধুময় হইবে।

সন্তানের প্রতি মায়েব যত্নের অভাব হইলে পারিবারিক জীবনে যে কুফল হয় তাহা এই পর্য্যন্ত বলা হইল। পক্ষান্তরে অনেক স্থলে অত্যধিক যত্ন লইয়াও জননী সন্তানের অমঙ্গল বিধান কবিয়া থাকেন। তিনি সন্তানকে সর্ব্ববিধ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত কবিতে চান, উপাস্য বিগ্রহের সেবার মত, পাছে সন্তানের তত্ত্বাবধানের এতটুকুও ত্রুটী ঘটে, এই ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকেন। বলা বাহুল্য ইহাও ঠিক নহে। পদে পদে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ ও যন্ত্রণাব হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা শিশুব ভাবী আপদ বিপদ ও দুঃখ দুর্দ্দশার পথ প্রশস্ত করিয়া তুলি। কথিত আছে, আকিলিসের জননী আকিলিসকে অস্ত্রশস্ত্রে দুর্ভেদ্য কবিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে ষ্টিক্স নদীর হিমশীতল জলে ডুবাইয়াছিলেন। এই কথাটি আমাদেব সকলেবই স্মরণীয়। অত্যধিক যত্নপরায়ণা জননীগণ কিন্তু ঠিক ইহার বিপবীত আচবণ করিয়া থাকেন। তাঁহাবা আপন আপন সন্তানকে আদব সোহাগ ও ভীরুতার জলে ডুবাইয়া দেহের প্রতি অণুপরমাণুকে নিতান্ত কোমল দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর করিয়া তোলেন। তাই তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আপদ বিপদের আঘাত পাইবা মাত্র এলাইয়া পড়ে।

একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখুন — শিশুর প্রতি তাঁহাব কি ব্যবস্থা। তিনি শিশুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে নিয়তই অভ্যস্ত করিতেছেন। শৈশবে দাঁত উঠিবার কালে শিশুগণের জ্বর হয়, তাহারা তড়্কায় কষ্ট পায়, ক্রিমিতে কত যন্ত্রণা ভোগ করে।

কত শিশু এই সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আট বছর পার না হইতেই লোকান্তর গমন করে। কিন্তু যাহারা এই সব যন্ত্রণার হাত ছাড়াইয়া উঠে, তাহারাই সবল হয় এবং সংসারে চলিবার ফিরিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা কি সঙ্গত? মা মনে করেন, আমার স্নেহের পুত্তলির গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিতে দিব না। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন না তাঁহার এই ব্যবস্থায় সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখকষ্টের তীব্রতা কত বাড়িয়া যায়। দেখা যায়, শৈশবে যাহারা অতি সন্তর্পণে লালিত পালিত হয়, তাহাদের মধ্যেই অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। দুঃখকষ্ট সন্তানকে শীতাতপ সহ্য করিতে এবং পরিশ্রমী হইতে শিক্ষা দেয়। শৈশব কালই অভ্যাস গঠনের সময়। বয়স বেশী হইলে পুরাতন অভ্যাস ভাঙ্গিয়া নূতন অভ্যাস গড়িয়া লওয়া অনেক সময় অসাধ্য হইয়া পড়ে। গাছ একবার বড় হইয়া উঠিলে উহাকে নোয়ানো শক্ত —নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। মাটি শক্ত হইয়া গেলে তাহাদ্বারা ইচ্ছামত কিছু গড়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হও। শৈশব-কালেই তাহাদিগকে দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করাইয়া ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তোল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের মূল্য বাড়ে। সন্তান প্রতিপালনের জন্য জনকজননীকে নিরন্তর যত্নচেষ্টা লইতে হয়। জন্মাবধি সন্তানকে যে আদর যত্ন করা হয় তাহা পুঞ্জীভূত আকারে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাহার মৃত্যুজনিত শোককে তীব্র করিয়া তোলে। সন্তান যদি নিজে বুঝিতে পারে, সে মরিতেছে সেই অনুভূতিও জনকজননীর শোকাবেগ বাড়াইয়া তোলে। সুতরাং মৃত্যুকালে সন্তানের বয়স যত অধিক হয় জনকজননীর শোকও তত বেশী হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে বয়স্ক হইবার পর সহজে তাহার মৃত্যু না হইতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। এতদবস্থায় শৈশবকালে দুঃখযন্ত্রণার

ভার মোটে সহিতে না দেওয়া এবং বড় হইলে উক্ত ভার প্রচুর পরিমাণে চাপাইয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ?

জীবনের কোন স্তরেই যন্ত্রণার হস্ত হইতে মানুষের অব্যাহতি নাই। শৈশবকালে শুধুই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; মানসিক যন্ত্রণা বোধের ক্ষমতা তত থাকেনা। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কেবল শারীরিক যন্ত্রণা নহে, মানসিক যন্ত্রণা ও মানুষকে অভিভূত করে। সুতরাং যাতনার তীব্রতা শিশু অপেক্ষা প্রাপ্তবয়স্ক মানবেরই বেশী।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে, আর কাঁদিতে কাঁদিতেই তাহার শৈশব জীবনের প্রথম ভাগটা অতিবাহিত করে। কান্না নিবারণ করিবার জন্য আমরা হয় তাহাকে আদর-যত্ন করি, না হয় ধমক দেই বা প্রহার করি। মোটের উপর আমরা হয় তাহার বশ্যতা স্বীকার করি, না হয় তাহার উপর ক্রোধ করি। তাহার ফল এই হয় যে, শিশুর মুখে ভাল করিয়া কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই সে আদেষ্টা ও শাসক হইয়া বসে, অথবা কার্য্য করিতে শিখিবার পূর্ব্বেই অধীনতা শিক্ষা করে, অপরাধ জানিবার কিংবা অপরাধের জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই শাস্তি ভোগ করে। এই কুব্যবস্থার ফলেই তাহাদের চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা, একগুয়েমী প্রভৃতি কতকগুলি দোষ প্রবেশ করে। তারপর আমাদেরই হাতেগড়া এই দোষগুলি প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা শিশুদের সংশোধনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করি।

সাধারণতঃ ৬।৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুগণ ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকে। তাহারা হয়, শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে অযথা খর্ব্ব করে, না হয় উক্ত ইচ্ছার অযথা প্রশ্রয় দিয়া থাকে। ধাত্রীরা শিশুর দুর্ব্বল স্মৃতিশক্তির উপর এমন কতকগুলি শব্দের বোঝা চাপাইয়া দেয়, যাহার অর্থ শিশু বুঝিতে পারে না অথবা এমন কতকগুলি বিষয় শিখাইতে প্রয়াস পায়, যাহা শৈশব জীবনে মোটেই প্রয়োজনে আসে না। তার পর শিশুর শিক্ষার ভার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত হয়। ধাত্রীর হস্তে যে

অস্বাভাবিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়, শিক্ষক তাহার উপরেই সৌধ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে—শিশু না শিখে আপনাকে চিনিতে, না শিখে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে, না শিখে কেমন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা জানিতে। এইরূপ শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া শিশু এক অপূর্ব্ব জীবে পরিণত হয়। স্বাধীন চিন্তার অভাবে তাহার মন ক্রীতদাসোচিত হইয়া পড়ে। আবার অস্বাভাবিকরূপে প্রশ্রয় পাওয়াতে কেহ কেহ যথেচ্ছাচারী রাজার মত হয়। যতই বিদ্যা উপার্জ্জন করুক না কেন, তাহাদের অজ্ঞতা কিছুতেই ঘুচে না, অধিকন্তু শরীর ও মন উভয়ই দুর্ব্বল হয়। এইরূপ শিক্ষা পাইবার পর সংসারে অবতরণ করিয়া সে প্রতিপদেই অকৃতকার্য্য হয়। তখন অনেকে বলিয়া থাকেন, এইগুলি মানুষের প্রকৃতিগত দোষ সুতরাং উহা দূর করা অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মনুষ্যপ্রদত্ত কুশিক্ষা হইতেই এইগুলির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃতির হাতে পড়িলে শিশুচরিত্র কখনই এইভাবে গঠিত হইয়া উঠিত না।

শিশুর চরিত্র ঠিক্ ঠিক্ গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার শিক্ষার ভার যাহার-তাহার হাতে দিলে চলিবে না। শিশুর জন্মাবধিই তাহার শিক্ষার জন্য যত্ন লইতে হইবে। তাহার লালনপালনভার যেমন জননীকে স্বহস্তে লইতে হইবে, তেমনই তাহার শিক্ষার ভারও পিতাকেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। পিতার বিদ্যাবুদ্ধি কম হইলেও ক্ষতি নাই।

বিদ্যাবিশারদ শিক্ষকও শিশুকে তাহার নিজের পিতার মত শিক্ষা দিতে পারিবে না। কারণ, একপক্ষে আছে প্রাণের টান আর অপর পক্ষে পাণ্ডিত্য। এই ক্ষেত্রে প্রাণের টান পাণ্ডিত্যের অভাব-জনিত ত্রুটিও পূরণ করিতে পারে, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রাণের টানের অভাব-জনিত ত্রুটি পূরণ করিতে পারে না।

পিতার ঋণ ত্রিবিধ। মানব জাতির কাছে তাঁহার ঋণ সন্তান উৎপাদন করা। স্বসমাজের কাছে তাঁহার ঋণ সন্তানকে স্বসমাজের উপযোগী

করিয়া তোলা। আর রাজ্যের কাছে তাহার ঋণ প্রজার ধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করিতে পারে, শাসনযন্ত্র চালাইতে সাহায্য করিতে পারে, এমন লোক গড়িয়া তোলা। যিনি ক্ষমতা সত্ত্বেও উক্ত ঋণত্রয় শোধ না করেন তিনি পাপী। যিনি উক্ত ঋণত্রয়ের অংশমাত্রও শোধ করেন না, তাঁহার পাপ সম্ভবতঃ আরও বেশী। যিনি পিতার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না, তাঁহার সন্তান উৎপাদনে ন্যায়তঃ অধিকার নাই। পিতা হইলে স্বহস্তে সন্তানের শিক্ষার ভার লইতে হইবেই। দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া, অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার দোহাই দিয়া, অথবা সম্মান নাশের আশঙ্কার দোহাই দিয়া কেহ উক্ত কর্ত্তব্যের হাত এড়াইতে পারেন না। যে পিতা ক্ষমতা-সত্ত্বেও সন্তানের শিক্ষাদান করেন না কালে তাঁহাকে তীব্র অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়।

যদি পিতার নিজের হস্তে সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্ভব হয়, তবে তিনি উপযুক্ত বন্ধুর হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ লোক অতি দুর্লভ। শিক্ষকের প্রধান গুণ অর্থলোভ-রাহিত্য। কতকগুলি কার্য্য এমনই উচ্চ যে অর্থে তাহার প্রতিদান হইতে পারে না। সৈনিকের কার্য্য এবং শিক্ষকতা-কার্য্য সেই শ্রেণীভুক্ত। প্রত্যুত প্রকৃত শিক্ষক মেলা ভার। জনক ব্যতীত অন্য কেহ শিক্ষক হইলে তাহাকে অতিমানুষ হইতে হয়। আর আমরা কিনা বেতনভোগী ব্যক্তির উপর সেই গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি!

শৈশবের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা।

সর্ব্ব-প্রথমে শিশুগণের কেবল সুখদুঃখেরই অনুভূতি থাকে। তাহাদের নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা বা হাত দিয়া কোন বস্তু ধরিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং তাহারা নিজেদের দেহের বাহিরে অবস্থিত কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিবার বেশী সুবিধা পায় না। তবে বাহিরের অনেক বস্তু অগ্রসর অথবা বিস্তৃত হইতে হইতে অনেক সময় তাহাদের খুব

নিকটে আসিয়া পড়ে, আবার সরিতে সরিতে তাহাদের কাছ হইতে অনেক দূরে পিছাইয়া যায়। ইহা হইতে তাহারা বস্তুর আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অস্পষ্ট রকমের কিছু ধারণা করিয়া করিয়া থাকে। বারে বারে একই রকমের বস্তুজ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হয় বলিয়া তাহারা নানাবিধ অভ্যাসের অধীন হইয়া থাকে। শিশুদিগকে সর্ব্বদাই আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখা যায়। আলোক কোন এক পার্শ্ব হইতে আসিলে তাহারা যেন আপনা আপনি সেই দিকে চক্ষু ফিরাইতে চায়। সুতরাং ঐ সময়ে সাবধানে তাহাদিগকে পাশ ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা বক্রভাবে চাহিবার অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে। তাহার ফলে চক্ষু টেরা হওয়া বিচিত্র নয়। শিশুদিগকে সর্ব্বদা আলোকে রাখিলে তাহাদের এমন অভ্যাস হইবে যে, তাহারা মোটেই অন্ধকারে থাকিতে চাহিবে না। সুতরাং সর্ব্বদা আলোকে না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখাও উচিত। তাহাদের আহার ও নিদ্রা একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত করিলেও ফল ভাল হইবে না; পরিণামে চুলমাত্র ব্যতিক্রম হইলেও তাহা তাহারা সহ্য করিতে পারিবে না। প্রকৃতি যাহা চায় তাহাই সর্ব্বথা পূরণ করা উচিত। কিন্তু অভ্যাস আবার কতকগুলি নূতন নূতন অভাব জাগাইয়া দেয়। এই প্রকারের অভাব যত কম জন্মিতে দেওয়া যায়, ততই ভাল। অভ্যাস বিশেষের অধীন হইয়া না পড়ার অভ্যাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভ্যাস। শিশুকে শুধু ডান্ কোলে বা বাম কোলে অনেকক্ষণ রাখা উচিত নহে। তাহাকে শুধু ডান হাত বাড়াইয়া দিতে বা শুধু ডান্ হাত দিয়া দ্রব্যাদি ধরিয়া দেওয়া উচিত নয়—যাহাতে উভয় হাতের ব্যবহার হয়, তেমন কিছু করিতে দেওয়া উচিত। শিশুদিগকে আহার, নিদ্রা বা অন্য কোন কার্য্য সর্ব্বদা এক ছাঁচে সম্পন্ন করিতে দেওয়া উচিত নহে। মোট কথা শিশুকে কোন রকম অভ্যাসের দাস না করিয়া প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইতে দেও; যখন তাহার ইচ্ছা

শক্তি সম্যক্ উদ্বুদ্ধ হইবে, তখন সে যাহাতে আপন ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখ।

শিশুদের কাছে অভিনব কোন বস্তু উপস্থিত করিলে অনেক সময় তাহারা ভীত হইয়া পড়ে। তাহাদের এই ভয় ভাঙাইয়া দেওয়া উচিত। এইজন্য তাহাদিগকে কদাকার, কুৎসিৎ ও অসাধারণ বস্তু দেখিতে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। তবে অকস্মাৎ নহে—খুব ধীরে ধীরে। প্রথমতঃ ঐরূপ বস্তু দূরেই রাখিতে হইবে, পরে ক্রমশঃ নিকটে আনিবে। প্রথম প্রথম শিশুদের সম্মুখে সেই বস্তুতে কেহ হস্তার্পণ করিবে, তারপর শিশুদিগকে হস্তার্পণ করিতে দিবে। ইহাতে শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের ভয় দূর হইবে এবং সাহসও বাড়িবে। এইরূপে শৈশবে ভেক, সর্প, কাঁকড়া প্রভৃতি নির্ভয়ে দেখিতে অভ্যস্ত হইলে বড় হইয়া কোন জন্তু দেখিয়াই তাহারা ভীত হইবে না। প্রতিদিন ভয়াবহ কোন বস্তু দেখিলে আর সে বস্তুর ভয়াবহতা থাকে না। মুখোস-পরা লোক দেখিলে শিশুগণ সাধারণতঃ ভীত হয়। সেই ভয় দূর করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে; শিশুর নিকট প্রথমতঃ খুব সুন্দর মুখোস উপস্থিত করিব। কিছুকাল তাহা লইয়া নাড়া-চাড়া করিবার পর আর কেহ সেই মুখোসটি পরিবে। তাহা দেখিয়া আমি হাসিতে আরম্ভ করিব, সেই সঙ্গে অন্যান্য লোক হাসিবে এবং আমাদের দেখা-দেখি শিশুও হাসিয়া ফেলিবে। তারপর সুন্দর মুখোসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বিকটাকার মুখোস উপস্থিত করিব এবং সে ক্রমে ক্রমে সেগুলি দেখিতেও অভ্যস্ত হইবে। পরে বিকট আকার মুখোস দেখিয়া সে আর ভয় পাইবে না বরং হাসিবে। এইরূপ করিলে আর সে কোন দিন কোন মুখোস-পরা লোক দেখিয়া ভীত হইবে না।

ট্রয়ের যুদ্ধে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হেক্টর তাঁহার স্ত্রী আণ্ড্রোমেকাসের নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। বীরবরের শিরোদেশে মুকুট।

উক্ত মুকুট হইতে একগুচ্ছ পালক তুলিতেছে। নিকটে তাঁহার শিশুপুত্র দাড়াইয়া। শিশু মুকুট-পরা পিতাকে চিনিতে পারিল না—ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সরিতে লাগিল। তাহার ধাত্রী অমনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য বিদায় দিতে বসিয়া আণ্ড্রোমেকাসের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু শিশুপুত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সেই হাসিব আভায় তাহার অশ্রুভরা চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হেক্টর তখন মাথার মুকুটটি খুলিয়া রাখিয়া শিশুপুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। যাহা করিবার তাহা অবশ্য তিনি ঠিকই করিলেন তবে তাঁহার মন তখন আবেগপূর্ণ তাই চিত্ত প্রশান্ত থাকিলে যাহা করা উচিত, ছিল তাহা করিতে পারিলেন না। তাঁহার উচিত ছিল, মুকুটটি খুলিয়া রাখিয়া প্রথমে তাহাতে তাঁহার হাত দেওয়া, তারপর উপস্থিত অন্যান্য লোকেরও হস্তার্পণ করা, তাহা হইলে শিশুও অবশেষে উহাতে হাত দিত। তারপর ধাত্রী যদি মুকুটটি ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে নিজেব মাথায় পড়িত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত, শিশুর ভয় একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইত।

অমল আমার ছাত্র। তাহাকে আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ শুনিতে অভ্যস্ত করাইবার অভিপ্রায়ে আমি প্রথমতঃ একটা পিস্তলে কিছু বারুদ পুরিয়া জ্বালাই। ক্ষণস্থায়ী একটা অগ্নিশিখার আবির্ভাব হয়। ইহাকে একটা নূতন রকমের বিদ্যুচ্ছটা বলিয়া মনে হওয়ায় সে বেশ আনন্দ লাভ করে। তারপর বারুদের পরিমাণ অল্প অল্প করিয়া বাড়াইয়া উহা জ্বালাইয়া দিই। তার পর বারুদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ গোলা গাদিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করি। ক্রমে গোলার পরিমাণ বাড়ানো হয়। এই প্রণালীতে অমলকে কামান, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির ভীষণ শব্দ শুনিতে অভ্যস্ত করানো হইয়াছিল। সাধারণতঃ সামান্য বজ্রনাদে শিশুগণ ভীত হয় না। তবে তুমুল নাদ হইলে যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে গুরুতর আঘাত লাগিতে ও শিশুগণ ভীত হইতে পারে, তার সন্দে

নাই। লোকের মুখে প্রায়ই তাহারা উহার অনিষ্টকারিতার কথা শুনিতে পায়। বজ্রপাত দ্বারা যে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে, এই সব কথা শুনিয়া তাহারা ভীত হইয়া পড়ে। অতএব শৈশব কাল হইতে নির্ভয়ে বজ্রনাদ প্রভৃতির কথা শুনিতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। পরে যুক্তি বলে উহার অনিষ্টকারিতার কথা অবগত হইয়াও বেশী ভীত হইবার কারণ থাকিবেনা। ধীরে ধীরে অভ্যাস করাইলে শিশু-গণের যে কোন বস্তুর ভয় ভাঙান যাইতে পারে।

শৈশব কালে স্মৃতি ও কল্পনা শক্তি অতি দুর্ব্বল থাকে, তাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিকেই তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতিই বিদ্যাশিক্ষার আদিম উপাদান। অতএব যদি শৃঙ্খলার সহিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির উদ্বোধন করিতে পারা যায়, তবে কালক্রমে উহারা স্মৃতিপটে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অঙ্কিত থাকিবে। পরে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হইলে স্মৃতি আবার সেই অনুভূতিগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে বুদ্ধিবৃত্তির গোচর করিতে পারিবে। কিন্তু শৈশবাবস্থায় মনোযোগ কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং উহাদিগের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে তাহা, আর যে যে বাহ্য বস্তু ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মাইতেছে, তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল।

শিশু যে কোন বস্তু হাতে লইবার এবং উহা নাড়া চাড়া করিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাহার এই চঞ্চলতায় বাধা দেওয়া উচিত নহে। এই উপায়েই সে বস্তুর উষ্ণতা ও শীতলতা, কাঠিন্য ও কোমলতা, লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করে। শিশু নানাবিধ বস্তু দেখে, তাহাদের গায়ে হাত বুলায়, কাণের কাছে ধরিয়া তাহাদের শব্দ শোনে। কোন বস্তুর দর্শনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের তুলনা করে, চক্ষুতে দেখিয়াই অনুমান করে,—হাতে লইলে বস্তুটি কেমন লাগিবে। এই উপায়েই সে নানাবিধ বস্তুর আকার আয়তন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়লভ্য গুণের বিষয় শিখিয়া থাকে।

গতির জ্ঞান হইতেই বাহ্য বস্তুর সত্তার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আমাদের নিজের গতিদ্বারাই জড়-পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম যে বিস্তৃতি তাহার জ্ঞান আমরা লাভ করিয়া থাকি।

শিশুরা তাহাদের অতি নিকটস্থ বস্তু ধরিবার জন্য যেমন হাত বাড়ায় শত গজ দূরস্থিত বস্তু ধরিবার জন্যও সেইরূপ হাত বাড়াইয়া থাকে। আপাততঃ মনে হইতে পারে, যেন শিশু দূরস্থ বস্তুটিকে তাহার নিকটে আনিবার জন্য আদেশ করিতেছে; যেন তোমাকে বলিতেছে,— "ঐ বস্তুটি আমার কাছে লইয়া আইস।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তাহার দূরত্বের বোধ জন্মে নাই। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত বস্তুটি দর্শন করিবামাত্র তাহার মনে হয়, উহা তাহার মস্তিষ্কস্থিত বা চক্ষুসংলগ্ন, তারপর হাত বাড়াইয়া মনে করে, উহা হাতের গণ্ডির মধ্যে। এতদপেক্ষা অধিক দূরত্বের জ্ঞান তাহার তখনও হয় না। এতদবস্থায় অতি সাবধানে শিশুকে সঙ্গে লইয়া বস্তুটির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ক্রমশঃ যে তাহার অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে—এইরূপে সে দূরত্ব জ্ঞানের শিক্ষা-লাভ করিতে পারিবে। এই শিক্ষালাভ হইবার পর প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তখন আর তাহাকে লইয়া তাহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক বস্তুটির দিকে যাইতে হইবে না, তখন আর সে দূরত্ব জ্ঞানের অভাবের জন্য প্রতারিতও হইবে না।

শিশুগণের কান্না তাহাদের অভাব জ্ঞাপনের একটা সঙ্কেত বই আর কিছুই নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, শিশুর মানসিক ক্রিয়া সুখ ও দুঃখের অনুভূতির মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। শিশু নীরবে সুখানুভব করিতে থাকে। আর দুঃখ উপস্থিত হইলে সে ক্রন্দনের সাহায্যে প্রতিকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। মনোভাব প্রকাশের সঙ্কেতের নামই ভাষা। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনকেই তাহার প্রথমকার ভাষা বলা যাইতে পারে। না হাসিয়া এবং না কাঁদিয়া মাঝামাঝি একটা অবস্থায়

থাকা শিশুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। শিশু যতক্ষণ জাগ্রত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে হাসি বা কান্না লইয়াই থাকিতে হইবে।

মানব-সমাজে আমরা যতপ্রকার ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই, তাহার সবগুলিই মানুষের তৈয়ারী। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সাধারণ স্বাভাবিক কোন ভাষা আছে কিনা, ইহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে অনেক আলোচনা হইয়াছে। শিশুগণ কথা বলিতে শিখিবার পূর্ব্বে যদ্দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে তাহাকেই সেই ভাষা বলা যাইতে পারে। সেই ভাষায় উচ্চারণের স্পষ্টতার অভাব আছে বটে, কিন্তু উচ্চারিত শব্দের অংশবিশেষে জোর পড়ায়, উহা শ্রুতিমধুর এবং মনের ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়। আমরা সর্ব্বদা নিজেদের ভাষার ব্যবহার করি বলিয়াই ঐ ভাষাটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। শিশুগণের ব্যাপারে মনোযোগ দিলেই আমরা উহাদের ভাষা শিখিয়া লইতে পারি। ধাত্রীগণ এই ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে। তাহারা শিশুগণের মনোভাব বেশ বুঝিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এই ভাষায় তাহারা শিশুগণের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলাপ পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। ধাত্রীগণ এই ভাষায় আলাপ করিতে যাইয়া অনেক সময় দেশ-প্রচলিত ভাষার শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে বটে। কিন্তু ঐ সমুদয় শব্দ শিশুগণের পক্ষে নিরর্থক। তবে ঐ সমুদয় শব্দ উচ্চারণ করিতে যাইয়া উহার অংশ বিশেষে তাহারা যে জোর দিয়া থাকে, তাহাতেই মনোভাব আদান প্রদানের কার্য্য সম্পন্ন হয়।

শিশুগণের অস্পষ্ট উচ্চারিত কণ্ঠস্বর যে ভাষার কাজ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা বলা হইল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের অঙ্গভঙ্গীরও ভাষার আসন অনেকটা অধিকার করিবার দাবী আছে। অঙ্গভঙ্গী অর্থে আমি বিবিধ প্রকারের হস্তসঞ্চালনের কথা ধরিতেছি না। মুখ-মণ্ডলের বিবিধ পরিবর্ত্তনের কথাই বলিতেছি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাদের মুখ-মণ্ডলের কতই না পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। হাসি, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়

মুখমণ্ডলে বিদ্যুতের মত ফুটিয়া উঠিয়া পরমুহূর্ত্তেই আবার অন্তর্হিত হয়। ক্ষণে ক্ষণেই তাহাদের মুখমণ্ডল যেন নূতন আকার ধারণ করে। প্রাপ্ত বয়স্ক লোক অপেক্ষা শিশুর মুখমণ্ডলের পেশীগুলি অধিকতর পরিবর্ত্তনসহ, সেই জন্যই এত ভিন্ন ভিন্ন রকমের আকার পাওয়া সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে শিশুর চাহনি অপেক্ষাকৃত অর্থ শূন্য। উহা দ্বারা তাহাদের কোন মনোভাব প্রায়ই ব্যক্ত হয় না।

শিশুগণের অভাব প্রায়ই কোন না কোন বস্তু ঘটিত। সেই জন্যই তাহাদিগের মনোভাব প্রকাশের প্রণালী পূর্ব্বোক্তরূপ। অঙ্গ-ভঙ্গীই ইন্দ্রিয় বোধ প্রকাশের প্রধান সাধন। আর সমগ্র বদন মণ্ডলের এক এক প্রকার আকার গ্রহণই এক একটি মনোবৃত্তির নিদর্শন।

শৈশব দুর্ব্বলতা ও দুর্দ্দশার কাল। তাই শিশুগণের সর্ব্ব প্রথমকার ভাষা কেবল অভাব অসুবিধা ব্যঞ্জক ও ক্রন্দনময়। শিশু অভাব অনুভব করে কিন্তু স্বয়ং তাহা পূরণ করিতে পারে না, কেবল কাঁদিয়া অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে। অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগিলে কাঁদে, নড়িবার চড়িবার বা স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইলে কাঁদে, ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলেও কাঁদে। স্বীয় জীবন-যাপন-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা যত কম থাকে তত বেশী করিয়া সে অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহার ইন্দ্রিয়গণের অপরিপক্কতা বশতঃ সে অনুভূতি সমূহের মধ্যে ইতর বিশেষ করিতে পারে না। সর্ব্ববিধ অভাব অসুবিধাই তাহার মনে কেমন একটা বেদনার জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। তাহার অনুভূতি সুধু একই প্রকারের, তাই তাহার ভাষাও সুধু একই প্রকারের অর্থাৎ সে ক্রন্দন সর্ব্বস্ব।

শিশুর কান্নাকে অনেকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষে মানুষে যত কিছু সম্পর্ক শিশুর কান্নাই তাহার ভিত্তি ভূমি। ইহা হইতেই সমাজ শৃঙ্খলের আদিম গ্রন্থির জন্ম।

শিশু কাঁদিলেই আমরা বুঝিতে পারি তাহার একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে। অমনি আমবা অনুসন্ধান পূর্ব্বক উক্ত অসুবিধাটা নির্ণয় করিয়া লইয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করি। যদি উহা নির্ণয় করিতে অথবা দূর করিতে না পারি তবে শিশু কাঁদিতেই থাকে। তখন তাহার কান্নায় আমরা বিরক্ত হইয়া পড়ি। তাহার ক্রন্দন নিবৃত্তির জন্য তাহাকে সোহাগ করি, দোলাই, তাহার কাছে গান করি বা তাহাকে ঘুম পাড়াই। যদি তাহাতেও কৃত কার্য্য না হই তবে আমরা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ি—তাহাকে ধমকাই। নির্দ্দয় প্রকৃতি ধাত্রীগণ এতদবস্থায় শিশুকে প্রহার করিয়াও থাকে। জীবনের প্রথম অঙ্কে মানবের এইরূপ ব্যবহার করার ব্যবস্থাটা অদ্ভুত বটে!

প্রার্থনা বিজ্ঞাপনই শিশুর প্রথমকার ক্রন্দনের উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু অভিভাবকগণের সুবিবেচনাও সাবধানতার অভাবে উক্ত ক্রন্দনই পরে আদেশের আকার ধারণ করিয়া বসে। প্রথমাবস্থায় শিশুগণ ক্রন্দনচ্ছলে আমাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, আবার শেষে উক্ত ক্রন্দনের বলেই জোর করিয়া আমাদিগের দ্বারা তাহাদিগের কাজ করাইয়া লয়। শৈশব কালে মানব অতি অক্ষম ও দুর্ব্বল থাকে। তজ্জন্যই তখন শিশুগণ বেশ বুঝিতে পারে যে তাহারা পদে পদে পরমুখ প্রত্যাশী কিন্তু আমরা পদে পদে তাহাদিগের কাজ করিয়া দিতে থাকি বলিয়া পর-নির্ভর-শীলতাটাকে আর নিজেদের অক্ষমতা-মূলক বলিয়া বিবেচনা করেনা। তাই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্রে স্বভাবানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম জনিত নানাবিধ কুফল দেখা দেয়। তাই সুকুমারমতি শিশুগণের ক্রন্দনের ও অঙ্গভঙ্গীর অন্তরালেও কোনও অসদুদ্দেশ্য থাকিবার আশঙ্কা জন্মে এবং তাহা নির্ণয় করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শিশু যখন চেষ্টা করিয়া তাহার হস্ত প্রসারিত করে কিন্তু কোনও শব্দ করেনা তখন তাহার মনে হয় সে কোনও বস্তুর নাগাল পাইতেছে কারণ তখন তাহার দূরত্বের সম্যক জ্ঞান থাকেনা তাই সে ভুল করিয়া বসে।

শিশু যখন চেষ্টা করিয়া তাহার হস্ত প্রসারিত করে কিন্তু কোন শব্দ করেনা তখন তাহার মনে হয় সে কোনও বস্তুর নাগাল পাইতেছে কারণ তখন তাহার দূরত্বের সম্যক্ জ্ঞান থাকেনা তাই সে ভুল করিয়া বসে।

কিন্তু হাত বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কান্দিয়া কাটিয়া অস্থির হয় তবে বুঝিতে হইবে যে বস্তুটি যে তাহার হইতে দূরে আছে তাহা বুঝিতে তাহার বাকী নাই কিন্তু সে চায় কেহ তাহাকে বস্তুটি আনিয়া দেউক অথবা বস্তুটি তাহার আদেশানুসারে আপনা আপনি তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হউক। প্রথমোক্ত অবস্থা হইলে ধীর-পাদ-বিক্ষেপে শিশুটিকে ক্রমে ক্রমে বস্তুটির নিকটে লইয়া যাইতে হইবে। আর শেষোক্ত অবস্থা হইলে তাহার কান্না কাটিতে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করিবেনা — যেন মোটেই কিছু বুঝিতে পার নাই। শিশুকাল হইতেই তাহাকে ইহা বুঝিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে যে সে কাহারও প্রভু নয় সুতরাং যে কোন মানুষকে আদেশ করিতে পারেনা আর যে কোনবস্তুকেও আদেশ করিতে পারেনা কারণ বস্তুর বুঝিবার শক্তি নাই। এই উদ্দেশ্যেই শিশুকে দূর হইতে আনিয়া কোনও বস্তু তাহার হাতে দিতে নাই। যখন বুঝিবে, শিশু কোন বস্তুর প্রতি তাকাইয়া উহা পাইবার ইচ্ছা করিতেছে তখন সেই বস্তুটি তাহার কাছে আনিয়া দিবেনা বরং শিশুকেই ধীরে ধীরে উহারদিকে লইয়া যাইবে। এই নিয়ম অবলম্বন করিলে তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইবে।

কয়েকটি উপদেশ।

ন্যায় অন্যায় বুঝাইয়া দেওয়া যুক্তি বা বিচার শক্তির কার্য্য। আর, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ এবং অন্যায়ের প্রতি বিরাগ উৎপাদন বিবেকের কার্য্য। তাই যুক্তি বা বিচার শক্তির সম্যক্ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবেক সবল হইতে পারেনা। যাহার বিচার শক্তি

বিকাশ পাইয়াছে অর্থাৎ যে ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারে সে যদি কোন অন্যায় কার্য্য করে তবে তাহাকে নীতি ভ্রষ্ট বলা যায়। কিন্তু যাহার ন্যায়ান্যায় জ্ঞান জন্মে নাই সে যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে তবে সে কার্য্যকে নীতিবিগর্হিত বলা যাইতে পারেনা। শৈশবে বিচার শক্তি অন্তর্লীন বা সুপ্ত সুতরাং অতি দুর্ব্বল থাকে। অতএব শিশুগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য নীতি, অনীতির গণ্ডির বাহিরে। সে অবলীলাক্রমে পক্ষি-শাবককে মৃৎপিণ্ডের মত টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। এতদুভয়ের মধ্যে যে কিছু পার্থক্য আছে সে তাহা দেখিতেই পায়না। শিশু কেন এমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে একদল পণ্ডিতের মত এই:— উহা তাহার জাতি-গত পাপ প্রবণতার ফল — আত্মম্ভরিতা স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতা মানবজাতির প্রকৃতিগত দোষ। শৈশবে মানব স্বভাবতঃই অতি দুর্ব্বল থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকৃতিগত দোষ বশতঃ সে আপনাকে সবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়। তাই যে কার্য্যে বলের প্রয়োজন তেমন কার্য্যে সে আগ্রহের সহিত হস্তার্পণ করে — যাহা হাতে পড়ে তাহাই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু এই মতটি যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয়না। স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাই যদি শিশুগণের উক্ত প্রবৃত্তির কারণ হয় তবে বৃদ্ধগণের প্রতি একবার দৃষ্টি পাত করিনা কেন? জীবন-চক্রের আবর্ত্তন প্রায় শেষ করিয়া তাঁহারাওতো শিশুগণের মত দুর্ব্বল হইয়াই পড়েন। কিন্তু তাঁহারাতো মোটেই চঞ্চল নহেন। নাড়া চাড়া করা, ওলট পালট করা, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলাতো তাহাদের মোটেই অভ্যাস নাই। পক্ষান্তরে তাঁহারা চান যে বস্তুটি যে স্থানে আছে তাহাই স্থির ও অবিকৃত থাকুক। যদি দুর্ব্বলতাই পূর্ব্বোক্ত শিশু স্বভাবের কারণ হইত তবেতো বৃদ্ধগণের বেলায়ও উহা খাটিত। সুতরাং শিশু ও বৃদ্ধের প্রকৃতিগত পার্থক্যের মধ্যেই প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করিতে হইবে। শিশুর জীবনী শক্তি বাড়িবার পথে, আর বৃদ্ধের পক্ষে উহা কমিবার পথে।

একজন জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে আর অপর মৃত্যুর দিকে চলিতেছে। বৃদ্ধের শক্তি অপচীয়মান। তিনি সেই শক্তিটুকু অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিতে; চান বাহিরের কোন বিষয় বা বস্তুতে উক্ত শক্তি যত কম ব্যয় করিতে পারেন সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। পক্ষান্তরে শিশুর শক্তি উপচীয়মান। তাই সে তাহার বিবর্দ্ধমান্ শক্তি প্রয়োগ করিতেই ব্যগ্র। সে শক্তি সঞ্চয় করিতে চায়না, সে চায় কেবল শক্তির ব্যবহার — সে চায় কাজ। ভাঙ্গে কি গড়ে সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। গড়া হইতে বরং ভাঙ্গার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশী কারণ গড়িতে হইলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয় আর ভাঙ্গিবার বেলায় শক্তির প্রয়োগটা খুব তাড়া তাড়ি হইয়া থাকে।

সৃষ্টিকর্ত্তা শিশুর জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ বাড়াইয়া তোলেন বটে। কিন্তু তাহার দৈহিক বল অতি অল্প থাকে। তাই কার্য্য করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও শিশুব আপনা আপনি কোন গুরুতর অনিষ্ট করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু সে অত্যল্প কাল মধ্যেই মাতা ধাত্রী বা, রক্ষককে স্বেচ্ছা পূরণের স্বরূপ করিয়া লয়। অন্যের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে লইতে সে অত্যাচারী ও দাম্ভিক হইয়া উঠে। এই দাম্ভিকতা ও পরপীড়কতা তাহার প্রকৃতি-গত দোষ নহে — মানুষই তাহার চরিত্রের এই দোষের জন্য দায়ী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বল বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং পরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন কমিয়া আসে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পরের উপর প্রভুত্ব করিতে করিতে ঐ কাজে তাহার অভ্যাস হইয়া দাড়ায়. কাজেই আর সে উহা পরিত্যাগ করিতে পারেনা। পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি মনে রাখিয়া একবার দেখা যাউক কি কি নিয়ম অবলম্বন করিলে শিশুকে প্রকৃতির অনুমোদিত পথে চালিত করা যাইতে পারে।

১। শিশুর শারীরিক বল বেশী তো নয়ই বরং যেটুকু থাকা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাও নাই। সুতরাং তাহাকে বল প্রয়োগ করিবার অবসর দিতে হইবে।

২। শিশুকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যতটুকু বল ও জ্ঞান না হইলে তাহার জীবন রক্ষাই অসম্ভব হইয়া পড়ে তাহাকে ততটুকু বল ও জ্ঞান দিয়া অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে।

৩। তাহাকে সাহায্য করিবার বেলায় লক্ষ্য করিতে হইবে তাহার যতটুকু সাহায্য না হইলে চলিতেই পারেনা যেন কেবল সেই টুকুই সে পায়। আমরা যেন তাহার আব্দার ও অলৌকিক আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দিয়া না বসি। মনে রাখিতে হইবে আব্দার বা একগুয়েমী শিশুর সহজাত দোষ নহে। শিক্ষাদানের দোষেই উহা জন্মিয়া থাকে।

৪। শিশুকালে মনে যে ভাব থাকে তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। মনে এক এবং মুখে আর করিয়া চলা শিশুর প্রকৃতি নয়। সুতরাং শিশু মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে বিবিধ সঙ্কেত বা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা সবিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। তাহা হইলেই আমরা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারিব তাহার কোন ইচ্ছাটার পূরণ অবশ্য প্রয়োজনীয় আর কোন ইচ্ছাটা সুধু আব্দার মূলক।

এই সমুদয় নিয়মের মূল লক্ষ্য এই—শিশুগণকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথেষ্ট দিতে হইবে বটে কিন্তু অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবার সুবিধা দিতে হইবেনা—তাহারা যতটা পারে নিজেদের কার্য্য নিজেরা করুক—অপরকে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যথা সম্ভব কম হউক। এই ভাবে অভ্যস্ত হইলে তাহাদের অন্যায় ইচ্ছার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে যে সমুদয় ইচ্ছার পরিপূরণ নিজেদের সাধ্য সেই সমুদয় ইচ্ছাই তাহাদের মনে আসিবে আর যাহার পূরণের জন্য অন্যের সাহায্যের আবশ্যক হয় সেই ইচ্ছা আদৌ তাহাদের মনে উদিত হইবেনা।

শিশুগণ যাহাতে অব্যাহতভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করিতে পারে তাহাদিগকে সেই ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। তবে দেখিতে হইবে যেন পড়িয়া না যায় আর এমন কোন জিনিষ তাহাদের খুব নিকটে

না থাকে যে তাহা হইতে আঘাত পাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে ৪টী নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের প্রথম ৪টির দৃষ্টান্তচ্ছলেই আমরা এই সব কথা বলিতেছি। কাপড় চোপড় দিয়া আটিয়া সাটিয়া রাখিলে শিশুর কাঁদিবার সম্ভাবনা বেশী। অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকিলে শিশু সহজে কান্দেনা। শিশুকালে শারীরিক দুঃখ ছাড়া অন্য কোন প্রকার দুঃখের বোধ থাকেনা। কাজেই পরিচ্ছদের নিগড়ে আবদ্ধ না থাকিয়াও যদি শিশু কান্দিয়া উঠে তবেই বুঝিতে হইবে তাহার বাস্তবিকই কোন শারীরিক দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তখন অবিলম্বে তাহার সাহায্যার্থে যাওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু যদি সেই দুঃখ উপশম করা সম্ভব না হয় তবে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তখন শিশুকে সোহাগ করিতে নাই কারণ সোহাগে তাহার যাতনার কিছুই নিবৃত্তি হইবেনা। কিন্তু যদি তাহাকে সোহাগ করা যায় তবে সে বুঝিয়া লইবে কান্দিলেই সোহাগ পাওয়া যায় এবং পদে পদেই তাহা পাইবার চেষ্টা করিবে। এইরূপ করার ফলেই শিশু অভিভাবককে পাইয়া বসে।

অনেক সময় দেখা যায় শিশুগণ কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া পড়ে। কোন শিশু কান্দিতে আরম্ভ করিলে যদি কেহ তাহার কাছে না যায় তবে তাহার কান্না উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না হইয়া বরং শেষে থামিয়াই যায়। কিন্তু তাহাকে কান্দিতে দেখিবা মাত্রই যদি কেহ শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তাহার কাছে যায় তবেই তাহার কান্নার বেগ অত্যধিক বাড়িয়া পড়ে। তাই দেখা যায় যেসমুদয় শিশু আদর যত্ন কম পায় তাহাদের কান্না কাটিও কম। কিন্তু তাই বলিয়া বলিতেছিনা শিশুগণকে অবহেলা করিতে হইবে। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তাহার শারীরিক যাতনা হইতেছে অনুমান করিয়া তৎপ্রতিকার করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই বিবেচনা পূর্ব্বক যাহাতে উক্ত যাতনা না হইতে পারে তাহার বিধান করাই শ্রেয়স্কর। কিন্তু আব্দার রক্ষা করানই

যে কান্নার উদ্দেশ্য তাহা অবহেলা করাই উচিত। যদি ক্রন্দন শুনিবা মাত্রই শিশুর আব্দার পূর্ণ করা যায় তবে আব্দার ক্রমশঃ এতটা বাড়িয়া যাইবে যে তাহার পূরণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তখন অবিরত কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু অধীর ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে।

কোনও অসুখ নাই কাপড় চোপড় দ্বারা আটিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় নাই অথচ শিশুর কান্নার বিরাম নাই ইহা কুশিক্ষারই দোষ, প্রকৃতিগত নহে। এই কুঅভ্যাস দূর করিবার একমাত্র উপায় উহার দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করা। যদি দৃঢ়তা সহকারে উক্ত ক্রন্দনকে অবহেলা করিয়া আসিতে পার তবে শিশুর এক গুঁয়েমী দমিয়া আসিবে আর কাঁদা কাটি করিবে না। এই উপায় অবলম্বন করিলে শিশুগণের কান্নাকাটি অনেক কমিয়া যাইবে, শারীরিক কোন কষ্ট না পাইলে আর কাঁদিবে না।

পূর্ব্বোক্ত কঠোর উপায় ব্যতীত আর একটি উপায়ও অবলম্বন করা যাইতে পারে। কোনও প্রীতি জনক বিষয়ে শিশুর মন আকর্ষণ করিয়া তাহাকে কাঁদাকাটির বিষয় ভুলাইয়া ফেল। ধাত্রীগণ অনেক সময় দক্ষতার সহিত এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিবার সময় দেখিতে হইবে যে শিশু যেন আমাদিগের এই উদ্দেশ্য টের না পায়। সে যেন বুঝিতে না পারে যে তাহার প্রফুল্লতা বিধানের জন্যই আমরা এইরূপ করিতেছি। ধাত্রীগণ এই সাবধানতা লইতে প্রায়ই অপারগ হয়।

শিশুদিগকে অনেক সময় অতি সকালে সকালে দুধ ছাড়ান হয়। দাঁত উঠিবার সময়ই দুধ ছাড়ানের উপযুক্ত কাল। এই সময়টা শিশুগণের পক্ষে অতি কষ্টজনক। এই সময়ে তাহারা আপনা আপনি যাহা পায় তাহাই মুখে দেয় এবং চিবাইতে চেষ্টা করে। আমরা মনে করি এই সময়ে কঠিন বস্তু চিবাইতে দেওয়া ভাল — তাহা হইলে দাঁত সহজে উঠিবে। কিন্তু সেটা ভুল। কঠিন বস্তু চিবাইলে

মাড়ি শক্ত হইয়া যায়। ঐ শক্ত মাড়ি ভেদ করিয়া দাঁত উঠাই বরং কষ্টকর হয়। এই বিষয়ে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইতর জন্তুগণ কি করে তাহাই দেখনা কেন? দাঁত উঠিবার কালে কুকুরের ছানা অস্থি, প্রস্তর প্রভৃতি অতি কঠিন কোনও দ্রব্য চিবায় না, তাহারা চর্ম্ম, নেকড়া এবং কাষ্ঠই চিবাইয়া থাকে।

আমরা কচি শিশুদিগকেই বিলাসিতায় অভ্যস্ত করিয়া ফেলি। তাহাদিগকে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত গোলক, স্ফটিক, প্রবাল আরও কত কি মূল্যবান খেলনা দিয়া থাকি। ইহাদের কিছুই প্রয়োজন নাই। এইরূপ ভালবাসা পরিণামে শিশুগণের পক্ষে অনিষ্টকর বই ইষ্টকর নহে। পত্র ও ফলযুক্ত পল্লব, তেঁতুল প্রভৃতির বীজ দিয়াই তাহারা বেশ খেলিতে পারে।

ভাষা।

ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই শিশুগণ চারিদিক হইতে লোকের কথা বার্ত্তা শুনিতে আরম্ভ করে। প্রথমাবস্থায় সেই সমুদয় কথা বার্ত্তা স্পষ্টরূপে শুনিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও তাহাদের থাকেনা। শব্দোচ্চারণের ক্ষমতা জন্মিতে তো আরো সময় লাগে। তারপর, শব্দ শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারা সে তো আরও অধিকতর সময় সাপেক্ষ। সে বুঝুক বা না বুঝুক, শব্দোচ্চারণ করিতে পারুক বা না পারুক, আমরা কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকি। তাই উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বেই সে অভ্যাসারে আমাদিগের উচ্চারিত শব্দ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং শিশুর সহিত কথা বলিতে সবিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। তাহার নিকট যে সমুদয় শব্দ উচ্চারণ করিবে সেই গুলি সহজোচ্চার্য্য হইবে। এবং সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবে। একই শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা উচিত এবং বিভিন্ন শব্দের সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া সঙ্গত। শিশু সচরাচর যে সমুদয় পদার্থ সর্ব্বদা

দেখিতে পায় সেই সমুদয় পদার্থ বাচক শব্দই শিশুকে প্রধানতঃ শুনিতে দেওয়া উচিত। ধাত্রীগণ নানা প্রকার মিষ্ট স্বরে শিশুর কাছে গান করুক তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু শিশুদের সঙ্গে কথা বলিবার সময় অধিক শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নয়। ঐ সব শব্দের সুরের দিকেই কেবল তাহাদিগের খেয়াল থাকে। শিক্ষকগণ অনেক সময় শিশুগণের সম্মুখে তাহাদিগের দুর্ব্বোধ্য অনেক শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না।

শিশুগণের কথা বলিতে শিখার প্রণালী বড় অদ্ভুত। আমরা চিন্তা করিয়া তাহার কূল কিনারা করিতে পারিনা। তাহাদিগের যেন পৃথক রকমের একটা ব্যাকরণ আছে। সেই ব্যাকরণের নিয়মগুলি অনেকটা ব্যাপক। একটুকু মনোযোগ করিয়া তাহাদিগের কথা বার্ত্তা শুনিলে আমরা দেখিতে পাইব তাহারা কেমন দৃঢ়তাব সহিত তাহাদের সেই ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। আমাদিগের কাছে সে গুলি ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে, আমাদিগের কাণে তাহাদের কথা কেমন কেমন শুনাইতে পারে। কিন্তু তাহারা তাহাদের ভাবে যথা নিয়মেই কথা বার্ত্তা বলে। শিশুগণের কথা বার্ত্তার ভুল সংশোধন করিতে যাওয়ার কোন ফল নাই। উহা কেবল আমাদের অহঙ্কারের পরিচায়ক। শিশুর সঙ্গে কথা বলিতে সর্ব্বদা শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার কর। সে যাহাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বদা তোমার কথা শুনে তাহার বন্দোবস্ত কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে সে অজ্ঞাতসারে তোমার অনুকরণ করিয়া শুদ্ধভাষায় কথা বলিতে শিখিয়াছে। ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহার ভাষা সংশোধনের চেষ্টা বৃথা।

আমাদিগের আর একটি দোষ শিশুদিগের মুখে অতি তাড়াতাড়ি কথা ফুটাইয়া উঠিবার জন্য ব্যস্ত হই। এই ব্যস্ততার ফল অনেক স্থলেই বিপরীত হইয়া থাকে। তাহারা যাহা কিছু উচ্চারণ করে তাহাতেই আমরা অতি মনোযোগেরর সহিত কর্ণপাত করি।

তাহার এক কুফল এই যে তাহাদের উচ্চারণ অতি অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। শিশুদের মুখের কথা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহারা স্পষ্টোচ্চারণের জন্য সচেষ্ট হয়না এবং কিরূপ উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ তাহাও ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং উক্ত ব্যস্ততা পরিহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে আপন মনে উচ্চারণ করিবার অবসর দেও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে প্রথমাবস্থায় যে যে শব্দ বা শব্দাংশ স্পষ্টভাবে তাহাদের মুখে আসে তাহারা কেবল সেই গুলিই উচ্চারণ করিবে। যে যে অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা সেই সেই শব্দ বা শব্দাংশের ব্যবহার করে তাহাদের অঙ্গভঙ্গী দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। কাজেই তোমার শব্দ না শিখিয়া তাহারা প্রথমতঃ তোমাকে তাহাদের শব্দ শিখিতেই অভ্যস্ত করে। পরে যখন তাহারা তোমার শব্দের অর্থ বুঝিতে পারে তখন সেই শব্দ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করে। আপাততঃ তাহার নিজের শব্দেই শিশুর কাজ চলিয়া যায়। তাই সে ধীরে ধীরে তোমার শব্দের অর্থ বুঝিয়া লয়। তাদপর ক্রমে ক্রমে নিজের শব্দ ছাড়িয়া তোমার শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

অতি তাড়াতাড়ি কথা বলাইবার চেষ্টার আর এক কুফল এই হয় যে তাহারা প্রথমে যে সমুদয় শব্দ ব্যবহার করে তাহাদিগের প্রচলিত অর্থ তো বুঝেইনা বরং সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন অর্থে উহাদের প্রয়োগ করিয়া থাকে। কাজেই আমাদের মনে হয় বটে যে তাহারা ঠিক ঠিক উত্তর দিতেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাও আমাদের কথা বুঝে না এবং আমরাও তাহাদের কথা বুঝিনা। এইজন্য আমরা অনেক সময় শিশুদের মুখে এক একটা কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। আমরা মনে করি শিশুর মনে এমন সুন্দর ভাবের উদয় হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শিশু তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। শব্দ ও অর্থের এইরূপ অসামঞ্জস্যের ফল অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়ায়।

কালক্রমে উক্ত ভুল সংশোধিত হইলেও শিশুর মনের উপর উহার একটা আজীবন ব্যাপী ক্রিয়া থাকিয়া যায়।

শিশুর নানাবিধ বিকাশ প্রায় একই সময়ে হইয়া পড়ে। শিশু প্রায় একই বয়সে কথা বলিতে নিজে নিজে খাইতে এবং চলিতে শিখে। বলিতে গেলে এক হিসাবে তখনই শিশুর জীবন নাটকের যবনিকা উত্তোলিত হয়। এই বয়স পর্য্যন্ত শিশুর কেবল শারীরিক সুখ দুঃখের একটা বোধ থাকে, না থাকে কোন জ্ঞান, না থাকে কোন ভাব, এমন কি নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতাটা পর্য্যন্ত থাকে না। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এই বয়সের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অবস্থাটা মাতৃ গর্ভে অবস্থানের অনুরূপ।

দ্বিতীয় ভাগ।

পাঁচ বৎসর হইতে বার বৎসরের কথা।

সংক্ষিপ্ত সার

পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে মানবকে আর শিশু বলা চলেনা। তখন তাহার বালকত্ব প্রাপ্তি হয়। জীবনের এই ভাগে তাহাকে লিখিতে পড়িতে অথবা সাংসারিক কর্ত্তব্য শিখাইতে হইবেনা। ভাল ভাল খেলা বাছিয়া লইয়া, বিবিধ আমোদ জনক বিষয় ও শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষার উদ্ভাবন করিয়া সেই গুলিই বালককে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার জন্য পদে পদে সাবধানতা লইতে হইবেনা। আবার তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতে বা তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতেও হইবেনা। বালককে ভাল বাসিবে এবং খেলায় উৎসাহ দিবে। তাহাকে [illegible] নিজের দুর্ব্বলতা ও তাহার ক্ষমতার সঙ্কীর্ণতা

বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে কেবল নৈসর্গিক ঘটনাবলীর বশ্যতা স্বীকার করাইলেই চলিবে—শিক্ষকের কঠোর শাসন নিগড়ে শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন নাই। নগর অপেক্ষা গ্রামই শিক্ষাদানের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। বস্তুপলক্ষে শিক্ষাদান অতিশয় প্রয়োজনীয়। চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিয়ত ব্যবহার দ্বারাই বালকগণের উন্নতি হইয়া থাকে।

সাবধানতার বাড়াবাড়ি

শৈশবকালের কথা বলা হইয়া গিয়াছে। বালক-কালের কথাই এখন আলোচ্য।

কথা বলিতে শিখিবার পরই বালকের কান্নাকাটি অনেক কমিয়া যায়। শৈশবের ভাষা ছিল কান্নাকাটি, এখন বালক কালের ভাষা কথা। কথা বলিয়াই যখন এখন অভাব অভিযোগ জানাইতে পারে তখন আর কান্দিবে কেন? তবে দুঃখ যদি এত তীব্র হয় যে মুখের কথায় তাহা প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারেনা তখন কান্দিতে পারে। অমল বলিতে শিখিয়াছে "আমি ব্যথা পাই"। অতঃপর খুব তীব্র যাতনা না পাইলে আর সে কান্দিবে কেন?

কোন কোন বালক এত দুর্ব্বল ও ভীরু যে যৎসামান্য কিছু হইলেই কাঁদিয়া ফেলে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় এই যতক্ষণ সে কাঁদিবে ততক্ষণ আর তাহার নিকটে যাইবেনা, আর যখন তাহার কান্না থামিবে তখনই দৌড়িয়া তাহার নিকটে যাইবে। তাহা হইলে সে শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে কাহাকেও নিকটে আনার উপায় চুপ করিয়া থাকা অথবা বড় জোর সুধু সামান্য একটুকু শব্দ করা। তারপর সে তদনুসারেই চলিবে। কারণ বালকগণ তাহাদের নিজেদের কোন সঙ্কেতের বা ভাষার শব্দগত অর্থ বোঝেনা। উহা দ্বারা বাহ্য জগতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাই উহার অর্থ বলিয়া গ্রহণ করে।

কোনও বালক নিজে নিজে আঘাত পাইলে যদি দেখে নিকটে কেহ আছে তবেই কাঁদিয়া ফেলে। নিকটে কেহ না থাকিলে অথবা তাহার কান্না কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া আশা না করিলে সে প্রায়ই কাঁদে না।

বালক আছাড় পড়িলে, তাহার মাথা কাটিয়া গেলে, আঘাতের চোটে নাক দিয়া রক্ত পড়িলে অথবা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে তাহা দেখিবা মাত্র কাহারও অধীরতা প্রকাশ করা উচিত নহে। আঘাত জনিত বেদনা যতটা হউক বা না হউক ভীত হইলেই উক্ত বেদনাটা বাড়িয়া যায়। অভিভাবককে অস্থির হইতে দেখিলে বালক ভয় পায়। সুতরাং তাহার যাতনা বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে অভিভাবক ধীরতা অবলম্বন করিলে বালক বেদনাটাকে তত গ্রাহ্য করেনা। এইরূপে নির্ভয়ে ছোট খাট বেদনা সহিবার অভ্যাস হইতেই ভবিষ্যতে গুরুতর কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে।

অমন মোটেই কখনও আঘাত পাইবেনা ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। বরং আমার ইচ্ছা সে আঘাত যন্ত্রণা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হউক। দুঃখ যাতনা সহ্য করিতে শিক্ষা করা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় ভগবান্ শিশুকে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশু হাটিবার বা দৌড়াইবার কালে অনেকবার সটান মাটিতে পড়িয়া যায়। তাহাতে তাহার হাত পা প্রায়ই ভাঙ্গেনা। শিশুর হাতে একখানা লাঠি। লাঠিখানা নাড়িতে চাড়িতে নিজের গায়ে মাঝে মাঝে লাগে বটে। কিন্তু সে আঘাত গুরুতর হয়না। শিশুর হাতে একখানা ছুরি। সে সহসা ধারাল দিকটা চাপিয়া ধরিল। তাহাতে কি হাতটা একবারে দুইখান হইয়া যায়? কখনই নহে। কারণ সে কখনই এত জোরে চাপিয়া ধরেনা যে সাংঘাতিক রূপে কাটিয়া যাইতে পারে।

নিজে নিজে যাহা শিখিতে পারে বালককে তাহা শিখাইবার জন্য অন্যের চেষ্টা করা নিতান্ত অন্যায়। বালকদিগকে হাটা শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেই না দেখা যায়। বুঝিবা তাহা না হইলে উহারা হাটিতে পারিতই না! কৃত্রিম উপায়ে এইরূপে হাটা শিখানের ফলে অনেকের হাটায় আজীবন ত্রুটি থাকিয়া যায়।

অনেক স্থলে বালকদিগকে ঠেলাগাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে দেওয়া হয়। শিশুদিগকে হাটা শিখাইবার জন্য একপ্রকার রজ্জুর শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া হয়। অমলকে এইসব কিছুই দিবনা। সে পা ফেলিতে শিখিলেই এমন ব্যবস্থা করিব যে ধরিয়া চলিবার কিছু না পায়। তবে মসৃণ পাথর বসান জায়গায় একটুকু ধরিবার দরকার হইতে পারে। বলিতে পার এইরূপ ব্যবস্থা করিলে সে বারে বারে আছাড় পড়িবে। তাহাতে ক্ষতি কি? যতই আছাড় পড়িবে ততই তাড়াতাড়ি নিজে নিজে হাটিতে শিখিবে। বাড়ীর বদ্ধ বাতাসে না রাখিয়া তাহাকে খোলা মাঠে লইয়া যাইব। তথায় মুক্ত বাতাসে দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিতে পাইয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। বল দেখি শিশুপালনের কোন প্রণালী ভাল? চিরাচরিত প্রণালী না আমার প্রণালী? প্রচলিত প্রণালী অনুসরণ করিলে সে অবশ্য কম আঘাত পাইবে বটে কিন্তু তাহাতে তাহার বাধ বাধ লাগিবে। সে স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাইবেনা। স্বাধীনতা সম্ভোগের জন্য বহু আঘাত পাইতে হইলেও উহা বরণীয়।

শারীরিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের কান্নাকাটিও কমিয়া আইসে। আত্মরক্ষার ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরের সাহায্যের প্রয়োজন ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বল প্রয়োগ করার জ্ঞানও বাড়িতে থাকে। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত জীবনের আরম্ভ হয়। এই সময়েই তাহার আত্ম শক্তির জ্ঞান হয়। স্মৃতি শক্তি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা-বলীতে

তাহাকে নিজের ব্যক্তিগত সত্তা বুঝাইয়া দেয়। এখন হইতেই সে তাহার জীবন ধারায় একটা একত্ব অনুভব করিতে শিখে, তাই তাহার সুখ ও দুঃখের জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে। সুতরাং এই সময় হইতেই তাহাকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান বিশিষ্ট জীবগণের একজন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

"হাস হাস হাস শিশু"

মানবের আয়ুর ঊর্দ্ধতম সীমা গণণা করা হইয়াছে বটে। কোন্ কোন্ যুগে মানবের পরমায়ু কত থাকিবার সম্ভাবনা তাহা অনুমিত হইয়াছে বটে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ কতদিন বাঁচিবে তাহা কি কেহ বলিতে পারে? বিশেষতঃ কয়টি লোকইবা পূরা আয়ু পাইয়া থাকে। জীবনের প্রথম ভাগেই মৃত্যুর সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যাহার বয়স যত কম তাহারই মরিবার আশঙ্কা তত অধিকতর।

যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই যৌবনে পদার্পণ করা ঘটিয়া উঠেনা। তোমার ছাত্র আজ শিশু। সে যে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া উঠিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? শিশুর বর্ত্তমান জীবনকে বিষদিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে, অনিশ্চিত ভাবী মঙ্গলের জন্য তাহার বর্ত্তমান জীবনকে বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত ও শৃঙ্খলিত করিতেছ। হয়তো সেই ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্ভোগ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াই উঠিবেনা। কোমল প্রাণ, অসহায় শিশুগণকে গাধার মতন খাটাইতেছ অথচ এই বিষম পরিশ্রম-লভ্য ফল ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে কিনা তাহার ঠিক নাই। আহা, জীবনের যে ভাগটুকু স্ফূর্ত্তিতে উৎফুল্ল থাকিবে সেই ভাগটিই শিক্ষকের তর্জ্জন গর্জ্জন, কঠোর শাস্তি ও অশ্রু বিসর্জ্জনে অতিবাহিত হইতেছে। মঙ্গলের নামে শিশুকে তীব্র যাতনাগ্রস্ত করিতেছ। এই অবস্থায় প্রকারান্তরে মৃত্যুকেই ডাকিয়া আনা হইতেছে। একদিন হয়তো অজ্ঞাতসারে অতর্কিত ভাবে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। পিতা বা শিক্ষকের

কঠোরতার ফলে এইরূপ বৎসর বৎসর কত শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে তাহা কে বলিবে? মরিয়া তাহাদের অন্ততঃ একটা শান্তি হয়। বাঁচিয়া থাকা কালে কেবল কঠোরতার নিষ্পেষণেই নিষ্পিষ্ট হইতেছিল অন্ততঃ তাহার হাত হইতে রক্ষা পায়।

মানব! স্নেহশীল হও। অবস্থা ও বয়স নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতিই তোমাদের দয়া বারি বর্ষিত হউক। দয়াই তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। শিশুগণকে ভালবাস। শিশুগণের সর্ব্ববিধ খেলা ও আমোদ প্রমোদে উৎসাহ প্রদান কর। শৈশবের হাস্যময় ও শান্তিময় জীবনের দিকে ফিরিয়া তাকাও দেখি। উহা ফিরিয়া পাইবার নিস্ফল প্রয়াসের কথা মনে করিয়া কাহার হৃদয় বিষণ্ণ না হয়? তবে কেন আমরা নিষ্কলঙ্ক চরিত্র শিশুগণকে সেই অল্পকাল স্থায়ী মধুময় শৈশবকাল সম্ভোগে বঞ্চিত করিব? তাহারাতো কখনই উহার অপব্যবহার করিবেনা। শৈশব চলিয়া গেলে আমাদের বেলায় ও ফিরিয়া আসে নাই আর উহাদের বেলায়ও আসিবেনা। তবে কেন তাহাদের শৈশব কালটুকু দুঃখ যন্ত্রণা দিয়া বিষময় করিয়া তোল? পিতৃগণ! বলিতে পার কি কখন শমন আসিয়া তোমাদের সন্তান গণের শিয়রে দাঁড়াইবে? প্রকৃতি তোমাদের সন্তানদিগকে যে সুখের কাল-টুকু দিয়াছেন যদি তাহাদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত কর তবে যে তোমাদিগকে আজীবন অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। সাবধান হও যেন সেই অনুতাপানলে চির জীবন দগ্ধ হইতে না হয়। জীবনের সুখা-স্বাদনের ক্ষমতা যখন তাহাদের জন্মে তখনই তাহাদিগকে উহা ভোগ করিতে দেও। সেই সুখাস্বাদন একবার না করিয়া যেন তাহাদিগের ভবধাম পরিত্যাগ করিতে না হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত কথার বিরুদ্ধে হয়তো নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে— মনুষ্যের হৃদয়ে যে সমুদয় অসৎপ্রবৃত্তি আছে বাল্যকালই তৎসমুদয় সংশোধনের সময়। কারণ বাল্যকালে শাস্তি জনিত যন্ত্রণা

বোধ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। সুতরাং সেই কালে বেশী বেশী শাস্তি দিয়া উহাদের বেশীর ভাগ সংশোধন করিয়া ফেলা আবশ্যক। তাহা হইলে বালকের বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের পর তাহাকে অতি অল্প শাস্তি দিলেই চলিবে।" কিন্তু এই ব্যবস্থা করিবার তোমার কি অধিকার আছে? বালককে শাস্তি দিতে বসিয়া তুমি যে উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করিবেনা তাহার নিশ্চয়তা আছে কি? তুমি যে বালকের অসৎ প্রকৃতি সংশোধনের কথা বলিতেছ সেই গুলি কি বালকের প্রকৃতি গত না তোমারই কুশিক্ষা প্রণালী প্রসূত? জোর করিয়া বালকের মন যে উপদেশের ভারে ভারাক্রান্ত করিতেছ, পরিণামে সেইগুলি দ্বারা বালকের উপকার হইবে কি অপকার হইবে বলিতে পার কি? মনে করিওনা স্বাধীনতা পাইলেই বালক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক কথা নহে। মনে করিওনা বালক প্রফুল্ল হইতে পারিলেই তোমাকে পাইয়া বসিবে। প্রফুল্লতা ও প্রশ্রয় প্রাপ্তি এই দুইটি এক কথা নহে।

জগতে অসংখ্য পদার্থ নিচয়ের মধ্যে মানব জাতির একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। আর সমগ্র মানব জীবনের মধ্যে বাল্যকালের ও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। মানব জাতির কথা বুঝিতে হইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে। আর বাল্যকালের কথা আলোচনা করিতে হইলে বালকের পক্ষে কি প্রযোজ্য বা অপ্রযোজ্য তাহাই দেখিতে হইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির কি কি প্রবৃত্তি প্রবল এবং বালকেরই বা কোন প্রবৃত্তি প্রবল তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, কাহার বেলা কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর তাহা বুঝিয়া লইয়াই চলিতে হইবে। এই পর্য্যন্তই মানুষের হাতে, ইহার বাহিরে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বালকের বর্ত্তমান জীবন বিষময় করিয়া ফেলিলে তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার হইবে না।

না হইবে দাস না হইবে প্রভু।

যাহার আকাঙ্ক্ষা আত্ম ক্ষমতার গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ সেই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন। আমার নিজের যাহা যাহা করিবার ক্ষমতা আছে আমার ইচ্ছা যদি তাহার বাহিরে কখনও না যায় তবে আমার যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই পাইতে পারিব, তবেই আমি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিলাম। পক্ষান্তরে আমার নিজের যাহা সাধ্য নাই সেই দিকে যদি আমার আকাঙ্ক্ষা যায় তবেই আমাকে পরের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে সুতরাং আমার আর স্বাধীনতা রহিল না। এই সত্যটি হইতেই বালকের শিক্ষা প্রণালীর যাবতীয় নিয়ম উদ্ভাবন করা যাইতে পারে।

বুদ্ধিমান্ লোকে নিজের ক্ষমতার দৌড় বুঝিয়া চলিতে পারে। কিন্তু বালক তাহা বুঝেনা এবং তদনুসারে চলিতেও পারেনা। তাই তাহারা সহস্রদিক্ দিয়া উন্মার্গগামী হইতে চায়। বালককে উক্ত গণ্ডির মধ্যে রক্ষা করা অভিভাবকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। তাহাকে পশু প্রকৃতিতে নামিতে দিতেও হইবে না অথচ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সিঁড়িতেও উঠাইয়া দিতে হইবে না। তাহাকে বালকই রাখিতে হইবে। সে যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহা তাহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত অথচ তজ্জন্য তাহার যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাও করা উচিত। তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে কিন্তু কাহারও আদেশ বহ ভৃত্য হইতে হইবেনা। অন্যের নিকট নানা বিষয় চাহিতে হইবে কিন্তু অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে হইবে না। কিসে অনিষ্ট হইবে এবং কিসে ইষ্ট হইবে তাহা অন্যে ভাল বুঝিতে পারে এবং তাহার অনেক অভাব পূরণ ও অন্যের সাহায্য না হইলে হয় না এই জন্যই কেবল তাহাকে অন্যের অধীন হইতে হয়। তাহার নিজের কোনও প্রয়োজনেই আসিবেনা এমন কিছু করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিতে কাহারও অধিকার নাই — পিতারও নয়।

বালককে কেবল প্রাকৃতিক ঘটনার বশ্যতাপন্ন কর; তাহার শিক্ষা দান বিষয়ে প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তনকর। তাহার কোন অন্যায় ইচ্ছা হইলে নিজে কোন বাধা দিবেনা কেবল কোন নৈসর্গিক ঘটনা বা কোন জড় পদার্থ হইতেই যেন সে বাধা প্রাপ্ত হয়; আর শাস্তি দিতে হইলেও এমন শাস্তি দিবে যাহা তাহার নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্যেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। তাহাহইলে পরে তদনুরূপ অবস্থায় পড়িলে ঐ ফলের কথা তাহার মনে পড়িবে। সে কোনও অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে তাহা করিবার অবসর প্রাপ্ত না হয় তাহাই কর কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিওনা। অভিজ্ঞতা ও আত্মক্ষমতার অভাব বোধই যেন তাহার পক্ষে বিধি ও নিষেধের কার্য্য করে। বালক চাহিতেছে এই জন্যই তাহাকে কিছু দিবেনা; যদি তাহার প্রয়োজন থাকে তবেই তাহাকে উহা দিবে। তাহাকে দিয়া যদি কিছু কাজ করাইয়া লও তবে সে যেন বুঝিতে না পারে যে সে তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছে, আর তুমি যখন তাহাব জন্য কিছু কর তখনও যেন সে বুঝিতে না পারে যে তুমি তাহার আদেশ বা অনুরোধ পালন করিতেছে। সে বুঝুক যে তাহার নিজের কার্য্যে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং তোমার কোনও কার্য্যদ্বারা তাহার স্বাধীনতার সঙ্কোচন হয় নাই। কোন কাজ করিতে বসিয়া বালক আত্ম ক্ষমতার অল্পতা বশতঃ আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না এতদবস্থায় কেবল যতটুকু সাহায্য না হইলে চলেনা ততটুকু সাহায্যই করিবে। তবে আর তোমাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে বলিয়া তাহার মনে অহঙ্কার আসিবেনা। বরং সাহায্যের যাচ্ঞা করিতে হইল বলিয়া একটা অপমানের ভাবই মনে আসিবে এবং অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া যে দিন নিজের কাজ নিজে করিতে পারিবে সেই দিন আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে। বালকের দেহের পোষণ ও বল বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিরই নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে। সেই বিধানে কোন বাধা দিওনা। বালক যখন চলিয়া

যাইতে চায়, তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই আর যখন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় তখনও ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা প্রণালীর দোষে তাহার ইচ্ছাশক্তি অনেক সময় বিকৃত হইয়া যায় বটে। কিন্তু তাহা না হইলে বালকের মনে প্রায়ই অসঙ্গত ইচ্ছার উদয় হয় না। আহাদের যখন ইচ্ছা তখন দৌড়ান, লাফান এবং চীৎকার করা উচিত। তাহারা যে বিবিধ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকে উহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় কারণ উহা দ্বারাই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যে সমুদয় অভিলাষ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরা পূরণ করিতে পারে না সেই গুলি ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। অভাব দ্বিবিধ। কতকগুলি প্রকৃত, উহাদের পূরণ জীবন ধারণের জন্যই অবশ্য প্রয়োজনীয় আর কতকগুলি কেবল কল্পনা প্রসূত — পূরণ না হইলে কিছু আসে যায় না। যে অভিলাষগুলি প্রকৃত অভাব হইতে উদ্ভূত সেই গুলির পূরণে শিশুকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু কল্পিত অভাব পূরণে সাহায্য করা কখনই উচিত নয়।

বালক কাঁদাকাটি করিলে কি করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে। এই স্থলে সেই সম্পর্কে আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। মনে কর বালক কথা বলিতে শিখিয়াছে এবং কিছু চাহিয়াছে। তুমি তাহাকে উক্ত জিনিষ দিতেছ না অথবা দিতে অস্বীকার করিয়াছ। এই অবস্থায় যদি সে উক্ত জিনিসের জন্য কান্না যুড়িয়া দেয় তবে কখনই তাহাকে উহা দেওয়া উচিত নয়। যদি বালকের উক্ত জিনিসের বাস্তবিক প্রয়োজন থাকে তবে তাহাকে চাহিবা মাত্রই উহা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে কাঁদিবার পর যদি তাহাকে উহা দেও তবে তাহার কাঁদারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে আর তোমার শুভানুধ্যায়িতা ও দয়ালুতা সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আসিবে সে মনে করিবে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনার কাছেই তুমি অবনত হইয়া পড়।

একবার যদি সে তোমাকে দুর্ব্বলমনাঃ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে তবে সে অত্যন্ত জেদী হইয়া পড়িবে। যাহা তাহাকে দিতে তোমার আপত্তি নাই তাহা দিতে বিলম্ব করিওনা; সাধারণতঃ তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিওনা। কিন্তু একবার যে অস্বীকারোক্তি করিয়াছ কখনও তাহার প্রত্যাহার করিওনা। অনেক সময় বালকগণকে শিষ্টতা সূচক কতকগুলি বাঁধা বুলি শিখাইয়া দেওয়া হয়। ঐ বুলির এমনই মোহিনী শক্তি যে উহা উচ্চারণ করিলে লোকে আর তাহাদের অনুরোধ পালন না করিয়া পারেনা। সাধারণতঃ ধনীর গৃহের বালকগণেরই এইরূপ কুশিক্ষা হইয়া থাকে। ঐ বুলিগুলির মধ্যে বিনয়ের ভাব প্রায়ই থাকেনা। অধস্তন জনগণের প্রতি আদেশ করিবার বেলায় তাহাদের যেমন ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সব বুলি আওড়াইয়া অনুরোধ করার সময়ও তাহাদিগের মধ্যে সেই ঔদ্ধত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়, বরং শেষোক্ত স্থলে উহার পরিমাণ একটু বেশীই হয় কারণ তাহারা জানে আদেশ অমান্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু এই অনুরোধ কখনই ব্যর্থ হইবে না। তাহাদের মুখে "অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা করুন" ইহার অর্থ "আপনার ইহা অবশ্য করিতে হইবে।" আমি প্রার্থনা করি ইহার অর্থ "আদেশ করিতেছি।" ইহা শিষ্টাচারের চমৎকার উদাহরণই বটে! ভাষাগত অর্থ এক আর উচ্চারকের মনোভাবগত অর্থ ঠিক উহার বিপরীত। আমার ইচ্ছা অমলের কথাবার্ত্তা বরং অভদ্রোচিত হউক কিন্তু সে যেন উদ্ধত হয়না। মনে আদেশের ভাব রাখিয়া বাহিরে "আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি" ইহা বলা অপেক্ষা মনে বিনয়ের ভাব রাখিয়া বাহিরে "ইহা কর" এইটা বলাও প্রার্থনীয়। শব্দ নির্ব্বাচনে ভুল হয় হউক কিন্তু মনোগত অর্থটী যেন ঠিক থাকে।

কঠোর শাসন এবং প্রশ্রয় দান এই উভয়ই বর্জ্জনীয়। প্রথমটীর ফলে বালকের জীবন দুঃখময় হইয়া পড়ে, তাহার স্বাস্থ্য এমন কি

জীবন পর্য্যন্তও নষ্ট হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি কাঁটার আঁচরটী পর্য্যন্ত তাহার গায়ে লাগিতে না দেও, তবে সে অতি কোমল প্রকৃতি হইয়া উঠিবে। ভবিষ্যতে তাহাকে পদে পদে অত্যন্ত অসুখী হইতে হইবে। সংসারে থাকিতে হইলে মানুষ মাত্রেরই দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তোমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে উহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবে না বরং অন্যান্য লোক অপেক্ষা উহার যাতনার অনুভূতি তীব্রতর হইয়া পড়িবে। প্রকৃতি প্রদত্ত দুঃখের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহাকে অতিরিক্ত দুঃখের মধ্যে ফেলিবে।

দূর ভবিষ্যতের সুখের আশায় বালকের বর্ত্তমান জীবন দুঃখময় করার বিরুদ্ধে ইতি পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিতে পারেন যে এই স্থলে আবার বালককে দুঃখ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে কেন? কিন্তু বাস্তবিক তাহা করা হইতেছেনা। আমিতো বালককে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থাই করিতেছি। স্বাধীনতা জনিত সুখের তুলনায় আনুষঙ্গিক যৎসামান্য কষ্ট কষ্টই নহে। শীত প্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায় বালকেরা বরফ লইয়া খেলায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। শীতে হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি সঙ্কুচিত এবং আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে তথাপি বালক শীতবোধ করিতেছেনা। আমরা মনে করি বালককে টানিয়া আনিয়া উনানের ধারে বসাইয়া দিলে তাহার ভাল লাগিবে। কিন্তু সে ঠিক তাহার বিপরীত বুঝিতেছে। সেইরূপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বালক রৌদ্রে খেলিতেছে সূর্য্য কিরণে তাহার শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, গায়ে ঘাম ঝরিতেছে কিন্তু তাহাতে বালকের ভ্রুক্ষেপ নাই। তাহাকে ছায়ায় আনিলেই সে অধিকতর কষ্ট অনুভব করে। তবেই দেখ তাহাকে স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিয়া আমি তাহার উপকারই করিতেছি। জীবনে যে সমুদয় কষ্ট ভোগ না করিয়া অব্যাহতি নাই আমি তাহাকে সেই সমুদয় কষ্ট অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে শিখাইতেছি। বল দেখি

সে কোন প্রণালী পছন্দ করিবে—তোমাদের চির-প্রচলিত প্রণালী না আমার প্রণালী ?

স্বভাবসিদ্ধ বিষয় সমূহের বাহিরে লইয়া গেলে কেহই সুখী হইতে পারেনা। দুঃখ দুর্বিপাক হইতে একবারে নির্ম্মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ নহে। ছোট খাট দুঃখ ভোগ একেবারে না করিলে মানুষ কি করিয়া সুখের আস্বাদ পাইবে ? যে জীবনে কোন দিন যাতনা ভোগ করেনাই সুকুমার দয়াবৃত্তি অনুভব করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি অবিছিন্ন ভাবে শারীরিক সুখ ভোগ করিয়াই আসিতেছে তাহার নৈতিক চরিত্র কলুষিত হইবার খুব সম্ভাবনা। এই শ্রেণীর লোক সমাজে দশ জনকে আপনার করিয়া লইতে শিখিতে পারেনা।

বালকের প্রত্যেক বাসনাই যদি পূর্ণ কর, তবে উত্তরোত্তর তাহার বাসনা বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে যে ইচ্ছা থাকিলেও তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিবে না। কাজেই তোমাকে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। তখন বালক ঈপ্সিত বিষয়ের অভাবে যতটা দুঃখিত না হইবে তুমি তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেনা বলিয়া তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইবে। প্রথমে সে হাতের লাঠিটি চাহিবে, তারপর তোমার ঘড়ীটি চাহিবে তারপর সে বনের পাখী বা আকাশের চাঁদ চাহিয়া বসিবে। মোটের উপর দুই চক্ষে যাহা দেখিবে তাহাই চাহিবে। তুমিত পরমেশ্বর নও যে তাহাকে সব দিতে পারিবে! সুতরাং বালকের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা তাহাকে ভবিষ্যতে অসুখী করিবার একটি অবশ্যম্ভাবী পন্থা বই আর কিছুই নহে।

মানুষ যাহা হাতে পায় তাহাই নিজস্ব বলিয়া মনে করিতে চায়। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির উপায়ও যদি বাড়িয়া যায় তবে প্রত্যেক বস্তুর উপরই স্বামিত্বের জ্ঞান আসিয়া পড়ে। ইচ্ছা

হইবা মাত্র তাহার পুরণ হইতে দেখিতে পাইলে শিশু জগৎটাকে তাহার নিজের বলিয়াই মনে করিয়া বসে। সে মনে করে সকল মানবই যেন তাহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। এইরূপে পদে পদে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পরিণামে অমঙ্গল জনক হইয়া থাকে। কালক্রমে কখনও তাহার কোন ইচ্ছার পুরণ হইতেছেনা দেখিতে পাইলে তাহার মনে হয় সংসার তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। তখনও তাহার বিচার শক্তি জন্মে নাই তাই তাহার নিকট যত যুক্তিই উপস্থিত করা যাউক না কেন সে মনে করে ঐ সবই তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্য বাগ্‌জাল মাত্র। সে তখন তোমার প্রতি কার্য্যেই অসদুদ্দেশ্য দেখিবে। তাহার প্রতি অবিরত অত্যাচার ও অবিচার হইতেছে সর্ব্বদা এই কল্পনা করিতে করিতে সে কোপন স্বভাব হইয়া পড়িবে। সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। উপকার পাইয়া মোটেই কৃতজ্ঞ হইতে শিখিবেনা। পক্ষান্তরে বাধা পাইবা মাত্র রাগিয়া উঠিবে।

যে বালক সর্ব্বদা ক্রোধ পরবশ সে কি কখনও সুখী হইতে পারে? সে যথেচ্ছ বিনিয়োগ ক্ষম প্রভু হইবার জন্য লালায়িত হয় বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে দাসের দাস এবং নিরতিশয় হতভাগ্য জীব। কোন কোন শিশু তাহার রক্ষক বা অভিভাবককে বলিয়া বসে "মুষ্টির আঘাতে এই দালানটা ভাঙ্গিয়া ফেল," "ঐ যে মন্দিরের মাথায় ত্রিশূলটি রহিয়াছে উহা আমাকে আনিয়া দাও," "ঐ যে জয়ঢাক বাজাইয়া সেনাদল যাইতেছে, উহারা এইখানে থামিয়া আমাকে গান শোনাক।" বলা বাহুল্য যে তাদৃশ শিশুগণের এরূপ অসম্ভব ইচ্ছা চারিতার্থ হইতে পারে না। বলা মাত্র তৎক্ষণাৎ কাজ হইলনা দেখিয়া তাহারা তারস্বরে চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে থাকে। তখন কেহই তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারে না।

ইহা কুশিক্ষা দানেরই ফল বিশেষ। প্রথমাবস্থায় অভিভাবক বা রক্ষকগণ নির্ব্বিচারে তাহাদের সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। তাই

প্রশ্রয় পাওয়াতে তাহারা অত্যন্ত জেদী হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এইক্ষণে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতেও রাগান্বিত হইয়া পড়িতেছে। পদে পদে বাধা বিঘ্ন পাইয়া তাহারা অস্থির হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে তাহাদের ভাগ্যে কেবল পর্য্যায় ক্রমে ক্রন্দনও ক্রোধ প্রকাশ। ইহারা আবার সুখী হইবে কি করিয়া? আত্মক্ষমতার অভাব ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা এই দুইয়ের সমবায় হইলে কেবল ক্রোধান্মত্ততা ও দুর্দশা আসিয়াই উপস্থিত হয়। এই শ্রেণীর শিশুগণের মধ্যেই কেহবা চেয়ার, টেবলকেই প্রহার করে আর কেহ বা তরঙ্গায়িত সমুদ্র বক্ষেই কশাঘাত করে।

প্রভুত্ব করিবার এবং যথেচ্ছাচারী হইবার প্রবৃত্তি থাকিলে বাল্যাবস্থায়ই এত কষ্ট পাইতে হয়। তারপর ভবিষ্যতে উহা আরও অশেষ দুঃখের আকর হইয়া পড়ে। কারণ বয়োবৃদ্ধি হইলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নানা প্রকারে বাড়িয়া যায়। তাই তখন পদে পদে ইচ্ছা প্রতিহত হয়। পূর্ব্বোক্ত বালকগণ জীবনের প্রথম ভাগে নিজেদের ইচ্ছার কাছে সকলকেই নত হইতে দেখিয়াছে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া দেখে সমগ্র বিশ্ব যেন তাহাদের ইচ্ছাকে পিষিয়া মারিতে চায়। তাই তাহারা অতিমাত্র বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন ও দম্ভে কোন ফলই হয় না। কেবল নিজেরাই মর্ম্মাহত এবং অন্যের বিদ্রূপ ভাজন হয়। তাহাদিগকে পদে পদে অপমানগ্রস্ত হইতে হয়। এই বিষম সমস্যায় পড়িয়াই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারে যে তাহাদের ক্ষমতা কত সঙ্কীর্ণ। তাই তাহারা একবারে আত্ম প্রত্যয় হারাইয়া ফেলে। তখন কোন কোন কাজে হাত দিয়া উহা করিতে না পারিয়া মনে করিয়া বসে নিজেদের কোনও কাজ করিবারই ক্ষমতা নাই। নানাদিক্ হইতে আকস্মিক বাধা আসিয়া তাহাদিগকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কত অবজ্ঞার কটাক্ষপাতে তাহারা সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাজন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে কল্পনা বশে আপনাদিগকে অত্যধিক

বড় মনে করিত এইক্ষণ আবার তেমনই আপনাদিগকে অত্যধিক ক্ষুদ্র মনে করিয়া বসে।

শিশুগণকে অন্যে ভাল বাসুক ও সাহায্য করুক ইহাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। কিন্তু তাহাদের আজ্ঞাপালন করুক বা তাহাদিগকে ভয় করুক ইহা কখনও প্রকৃতির অভীপ্সিত নহে। দেখ, অন্যের ভয়োৎপাদনোপযোগী কোন কিছুই তো শিশুদের নাই। তাহাদিগের আকৃতি গুরু গম্ভীর নয়, দৃষ্টি তীব্র নয়, কণ্ঠস্বরও কর্কশ বা ভীতিজনক নয়। সিংহের ঘোর গর্জ্জনে অন্যান্য জন্তু ভীত হইতে পারে। তাহার বিশাল বদন মণ্ডল দেখিবা মাত্র অন্যান্য জন্তু ভয়ে জড়সর হইতে পারে ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই অমাত্যবৃন্দ দলে দলে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে শিশুর পদ তলে লুণ্ঠিত হয় তখন মনে হয় ইহা অপেক্ষা অস্বাভাবিক ও বিদ্রূপাত্মক দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

শিশু সর্ব্বদা অসহায় পরমুখ-প্রত্যাশী ও কৃপাপাত্র। বুঝিবা লোকের স্নেহরসোদ্রেক করিবার জন্যই ভগবান্ শিশুর সমস্ত অবয়বে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা ও লাবণ্য মাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং কোন শিশু যদি উদ্ধত ও কোপন স্বভাব হয়, সে যদি ঔদ্ধত্যও প্রভুত্ব ব্যঞ্জক স্বরে অন্যের সঙ্গে কথা বলে তবে উহার মত অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকর বিষয় আর কি হইতে পারে?

আবার অন্যদিক্ দিয়া চাহিয়া দেখ। দুর্ব্বলতা শৃঙ্খলে শিশু কতদিক্ দিয়া বান্ধা! তাহার স্বাধীনতা কত সঙ্কীর্ণ! এই যৎসামান্য স্বাধীনতাটুকু ভোগ করিতে যাইয়া উহার অপব্যবহার করিবার অবসর কতটুকু আছে। এই সামান্য স্বাধীনতাটুকুও সঙ্কুচিত করিলে তাহাদিগের কোনই ইষ্ট সাধিত হইবেনা এবং তাহাতে অন্যেরও কোন লাভ নাই। এতদবস্থায় শিশুর নৈসর্গিক বন্ধন শৃঙ্খল বাড়াইয়া ফেলিলে তাহার মত নৃশংস ব্যবহার আর কি হইতে পারে? শিশুর ঔদ্ধত্য যেমন

অপ্রীতিকর দৃশ্য শিশুর ভয় বিহ্বলতা ও কি তেমন করুণ দৃশ্য নহে ?

শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেশ প্রচলিত আইন কানুনের বন্ধনে তাহাকে তো বদ্ধ হইতেই হইবে। তবে প্রকৃতি তাহাকে যে কয়টা দিন স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিয়াছেন তাহার উপর আবার আমরা হস্তক্ষেপ করিব কেন ? তাই তীব্র শাসন পক্ষপাতী শিক্ষক ও প্রশ্রয় প্রদাতা অভিভাবক উভয়কেই আহ্বান করিতেছি। প্রত্যেকেই আপন আপন নীতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া উহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া লউন।

কিলাইয়া কাঁটাল পাকাইওনা।

জন লক্ বলেন বালকদিগকে যুক্তি দিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবে। এই উপদেশটি আজকাল অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের নিকট তাহাদিগের বাল্যকালে কথায় কথায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হয় তাহারই পরে অত্যন্ত নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং ফল দেখিয়া গুণ বিচার করিতে হইলে উক্ত উপদেশটি মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয় না। বিচার শক্তির উদ্বোধন অন্যান্য মানসিক শক্তি নিচয়ের সমবায় সাপেক্ষ। উহার বিকাশ অতি ধীরে ধীরে ও সর্ব্বশেষে হইয়া থাকে। অথচ যে সমুদয় মানসিক শক্তির উদ্ভব পূর্ব্বে হয় তাহাদেরই বিকাশের জন্য বিচার শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে এ অদ্ভুত ব্যবস্থা বটে। শিক্ষার চরম সীমা হইল মানুষকে বিচারক্ষম করিয়া তোলা। আর আমরা কিনা শিশুর শিক্ষা বিধানের জন্য তাহাকে তাহার বিচারশক্তি প্রয়োগ করিতে বলি। কোনও বিষয় প্রতিপাদন করিতে বসিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে কি কখনও উপকরণ রূপে ব্যবহার করা যায় ? শিশুরা যদি নিজেরাই বিচার করিতে সমর্থ হয়, তবে তো তাহাদিগকে

শিক্ষা দিবারই প্রয়োজন থাকেনা। আমরা তাহাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যে সমুদয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি তাহারা প্রায়ই উহাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। অথচ আমরা তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে নির্ব্বিচারে ঐরূপ ভাষারই ব্যবহার করি। ইহার ফলে এমন হয় যে অর্থের প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য থাকে না। শব্দ শুনিলেই মনে করে সব বুঝিয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগের সম্মুখে কেহ কিছু বলিলে কেবল তাহার দোষ দর্শনেই ব্যস্ত হয়। আপনাদিগকে জ্ঞানে শিক্ষকগণের সমকক্ষ মনে করিয়া কেবল তাহাদিগের সঙ্গে তর্ক করিতে চায় এবং পদে পদে তাহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। আমরা চাই বটে তাহারা ন্যায়ান্যায় বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করুক কিন্তু দেখিতে পাই তাহারা তাহাতে অপারগ। অবশেষে আমরা লোভ, ভয় বা অহঙ্কার বৃত্তির উদ্রেক করতঃ তাহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য্য করাইয়া লইতে বাধ্য হই। মানবগণ শৈশবাবস্থায় অপূর্ণ থাকিবে তারপর বয়স্ক হইলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আমরা শিশুগণের বিচার শক্তির প্রয়োগ ও বিকাশের চেষ্টা করিতে যাইয়া উক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসি। উহাতে আপাততঃ খুব ফল পাইতেছি বলিয়া বোধ হয় বটে। কিন্তু উক্ত ফল অপরিপক্ক ও ক্ষণস্থায়ী। এই প্রথা অনুসরণ করাতে বালকগণকে অল্প বয়সে বিজ্ঞ ও পণ্ডিতের ন্যায় দেখায় বটে। কিন্তু তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের চরিত্রে বয়সোচিত বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে বালক স্বভাব সুলভ বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা, শোনা, ভাবা এবং অনুভব করার প্রণালী বালকের এক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির আর। এই সমস্ত বিষয়ে বালকগণকে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিগণের সহিত একই সোপানে স্থাপিত করার চেষ্টা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য আর নাই। দশ বছরের ছেলে পূরা মাপে তিন হাত লম্বা হইয়া উঠুক এইরূপ আশা করা যেমন অযৌক্তিক সে বিচারশক্তি সম্পন্ন হউক এইরূপ আশা করা

ততোধিক অলৌকিক। বাস্তবিক এই বয়সে সে কোন্ কাজেই বা বিচারশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে? বিচারশক্তি দ্বারা শারীরিক বল নিরোধ করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু ঐ বয়সে বল নিরোধের কোন প্রয়োজনই হয় না।

ঔচিত্যানৌচিত্য বুঝাইয়া ছাত্রগণ দ্বারা তোমার আজ্ঞা পালন করাইয়া লইতে চাও। কিন্তু তাহা পারিয়া উঠ কই? উহার জন্য তোমার বলপ্রয়োগ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে হয় এমন কি তোষামোদ এবং প্রতিশ্রুতিও করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা স্বার্থের লোভে ভয়ে তোমার কথা পালন করিতে অগ্রসর হয় কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াই যেন উহা করিতেছে এইরূপ ভাণ করে মাত্র। তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে তোমার চক্ষে বাধ্য প্রতিপন্ন হইলেই তাহাদের মঙ্গল আর অবাধ্য হইলেই অমঙ্গল। কিন্তু তুমি যাহা চাও তাহা উহাদের নিকট অপ্রীতিকর। সর্ব্বদা অন্যের ইচ্ছা পালন করা তো অপ্রীতিকর হইবেই। তাই তাহারা গোপনে গোপনে নিজেদের ইচ্ছা চরিতার্থ করে। তোমার কাছে ধরা না পড়িয়া যাহা করে তাহাই সঙ্গত বলিয়া তাহাদের স্থির বিশ্বাস। কিন্তু দুষ্কার্য্য ধরা পড়িবার পর আপনাদের দোষ স্বীকার না করিলে তাহাদের অদৃষ্টে গুরুতর শাস্তি আছে একথা তাহারা বেশ জানে, তাই ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করে। অনুষ্ঠেয় কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বুঝিবার ক্ষমতাই তাহাদের নাই সুতরাং কেহই প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে উহা বুঝাইতে পারে না। তবে যে তাহারা বুঝিয়াছে বলিয়া বলে তাহার কতকগুলি কারণ আছে—যথা শাস্তির ভয়, অপরাধ ক্ষমা লাভের আশা, শিক্ষক বা অভিভাবকের নির্ব্বন্ধাতিশয় অথবা প্রতিবাদে অসামর্থ্য। তোমরা মনে কর বালক বিষয় বিশেষের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত কথা এই তাহারা

হইয়াছে অথবা নানাদিক দিয়া তর্ক করিয়া তোমরা তাহাদিগকে হয়রাণ করিয়া ফেলিয়াছ।

দেখ পূর্ব্বোক্ত কুশিক্ষার কুফল কত গুরুতর! তাহারা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না তুমি সেইগুলিই কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেও। তাই তোমার প্রতি তাহাদের একটা বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। তোমার প্রতি তাহাদিগের ভালবাসা ও সম্মানের ভাব অন্তর্হিত হয়। পুরস্কার পাইবার লোভে অথবা শাস্তি এড়াইবার ভয়ে তাহারা তোমার সহিত প্রতারণা করে এবং কপটাচারী হয়। গূঢ় উদ্দেশ্য লোক দেখান উদ্দেশ্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠে। উহার ফলে তাহারা নিরন্তর তোমার সঙ্গে ছলনা করিতে শিক্ষা করে—তাহাদের প্রকৃত চরিত্র তোমার নিকট গোপন করিয়া রাখিতে শিখে এবং প্রয়োজন হইলেই শূন্য-গর্ভ বাক্য দ্বারা তোমার ও অন্যান্য ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে শিখিয়া থাকে। তোমরা হয়তো বলিতে পার "কেন? বালক বলিয়া কেন? যাহা যুক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত তাহাই যে সকলে স্বেচ্ছাক্রমে মানিয়া চলে তাহাতো নয়। দৃষ্টান্তচ্ছলে আইনের কথা বলা যাইতে পারে। আইনতো ন্যায় ও যুক্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরাওতো স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আইন মান্য করিয়া চলে না। তাহাদিগের প্রতিও বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মানাইতে হয়।" একথা সত্য বটে। কিন্তু বাল্যকালে যাহারা আমাদের হাতে কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ঐরূপ ঘটে। আর যাহাতে এইরূপ না ঘটিতে পারে তাহার বিধান করাইতো আমাদের উদ্দেশ্য। বালকদের বেলায় শিক্ষাদানের প্রধান সাধন জড়জগতের বলপ্রয়োগ আর প্রাপ্ত-বয়স্কদের বেলায়, বিচার শক্তির প্রয়োগ। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। জ্ঞানী লোকের বেলায় আইনের বলে বাধা দিবার প্রয়োজন হয় না।

সুসংযত স্বাধীনতা।

ছাত্রের বয়সানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা কর। বয়সানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে ছাত্র কখনও উহা এড়াইতে চেষ্টা করিবে না এবং যুক্তিযুক্ততা না বুঝিতে পারিলেও আপনা হইতে উহা মানিয়া চলিবে। যথেচ্ছ বিনিয়োগক্ষম প্রভুর আসন লইয়া তাহার প্রতি কখনও আদেশ করিও না। সে যেন কল্পনাও করিতে না পাবে যে তুমি তাহার উপর প্রভুত্ব করিবার দাবী রাখ। ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে বুঝিতে দেও যে সে দুর্ব্বল আর তুমি সবল তাই পদে পদে তাহাকে তোমার কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। সে এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝুক ও প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুক। তাহাকে জীবনের প্রথম ভাগেই বুঝিতে দেও যে সকলের স্কন্ধেই প্রকৃতির একটা অলঙ্ঘনীয় চাপ আছে — ঐ চাপের বোঝা ঘাড়ে লইয়াই সকলকে এই সংসারে আপন আপন কাজ করিতে হইবে।

তাহাকে নিজে নিজেই বুঝিতে দেও যে ঐ চাপ কোন মানবের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত নহে — নৈসর্গিক ঘটনা বা জড়জগৎ হইতেই উহা উদ্ভূত। তাহার প্রতি কখনও নিষেধাজ্ঞা করিও না — অনুচিত কোন কার্য্য করিতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিবে। কিন্তু বাধা দিবার সময় কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করিও না। তাহার কোন প্রার্থনা পূর্ণ করা সঙ্গত বোধ করিলে প্রথমবার চাহিবা মাত্রই উহা পূর্ণ করিবে — তজ্জন্য যেন তোমার কাছে তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে না হয়। আর ঐ প্রার্থনা পূরণের জন্য তাহাকে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া লইও না। আনন্দের সহিত তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইও। সহজে তাহার কোন প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না। আবার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনাতে কখনও টলিবে না। একবার যাহা না করিয়াছ

তাহা যেন দুর্ভেদ্য দেওয়ালের মতন অটুট থাকে। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যর্থ প্রয়াস কয়েকবার করিয়া বালক ক্লান্ত হইয়া আপনা আপনিই উক্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে বালকের প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেও সে সহিষ্ণু, শান্ত ও স্থিরমনাঃ হইয়া উঠিবে। কারণ মানুষের অসঙ্গত ইচ্ছার গুরুভাব লোকে সহিতে চায় না বটে কিন্তু প্রকৃতিসম্ভূত, অনিবার্য্য নিয়ম সহিষ্ণুতার সহিত ঘাড় পাতিয়া বহন করিতে পারে। বালক কিছু চাহিতেছে মা বলিলেন "আর নাই।" সে যদি বুঝিতে পারে যে কথাটা সত্য তবে আর দৌরাত্ম্য করে না। বালককে হয় স্বাধীনতা দিতে হইবে না হয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশ্যতাপন্ন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহার নিজের ইচ্ছা এবং তোমার ইচ্ছা এতদুভয়ের মধ্যে যদি তাহাকে দোলায়মান থাকিতে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটাকে প্রাধান্যলাভ করিতে দিতে হইবে যদি অবিরত তাহার সঙ্গে ইহার মীমাংসা লইয়া তর্ক করিতে হয় তবে তদপেক্ষা দুর্দ্দশার কথা আর কিছু হইতে পারে না। তাহার ইচ্ছাকে প্রাধান্য লাভ করিতে দেওয়াই আমি শতগুণে শ্লাঘ্য মনে করি।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষাদান করিতে যাইয়া বালকগণের হৃদয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ্যা, অহঙ্কার, লোভ ও ভয় প্রভৃতি বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সমুদয় বৃত্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর। ইহারা অনিষ্ট সাধন করিবার জন্যই যেন সতত প্রস্তুত। বালকের হৃদয়ও ইহারা কলুষিত করিয়া ফেলিতে পারে। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বালকের মস্তিষ্কে এক একটা নূতন বিষয় প্রবেশ করাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে এক একটী পাপের বীজ বপন করা হয়। ...লে মস্তিষ্কে বালকের মনে সততার ধারণা জন্মাইতে যাইয়া অদূরদর্শী

শিক্ষকগণ তাহাকে অসৎ করিয়া তোলেন। তাহারা মনে করেন—অল্পবয়স্ক বালককে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দিয়া একটা অসাধ্য সাধন করিয়া বসিলেন। তারপর যখন দেখিতে পান শিশু অসৎ হইয়া উঠিয়াছে তখন কেবল গম্ভীরভাবে বলেন "মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ।" কথাটা ঠিক! শিক্ষকরূপী মানুষের শিক্ষাদানের ফলেই ছাত্ররূপী মানুষের প্রকৃতি এইভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

সুসংযত স্বাধীনতা প্রদানই বালকগণের শিক্ষাবিধানের মূল মন্ত্র—এইটা বাদ দেওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিতেছে। কোন্ কোন্ বিষয়ে বালকের স্বাধীন ইচ্ছার পরিপূরণ সম্ভব, কোন্ সীমা অতিক্রম করিতে চাহিলে প্রকৃতির বাধা আসিয়া তাহার স্বাধীন ইচ্ছার গতি প্রতিহত করে—এই বিষয়ে বিশেষ প্রাজ্ঞ হওয়া চাই। তাহা হইলে বালককে স্বাধীনতা দিয়া ও নিজের ইচ্ছামত চালান যাইতে পারে। এই গুণ না থাকিলে কাহারও বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহার এই গুণ আছে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বালককে কার্য্যে প্রণোদিত করিতে অথবা কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারেন। তাহাতে বালক একটুকুও অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক কেবল মধ্যে মধ্যে নৈসর্গিক বাধা উপস্থিত করিয়াই বালকের দৃঢ় ইচ্ছাকে আনত করিতে এবং তাহাকে শিক্ষা দিবার পথে আনিতে পারিবেন অথচ তাহার হৃদয়ে কোন পাপ প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইবে না। কারণ কোনও দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিতে না পারিলে বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না।

বালককে যাহাই শিখাইতে চাও তাহার অভিজ্ঞতার সাহায্যেই শিখাইবে শুধু মুখের কথা বলিয়াই কিছু শিখাইতে চেষ্টা করিও না। তাহাকে কোন শাস্তি দিও না কারণ অপরাধ কাহাকে বলে তাহাইতো সে জানে না। আর তাহাকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও

বাধ্য করিও না — কারণ তোমাকে অসন্তুষ্ট করা ব্যাপারটা যে কি তাহাতো সে জানে না। তাহার নৈতিক জ্ঞান নাই। সুতরাং তাহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যকেই নীতিসঙ্গত বা নীতি-বিগর্হিত বলা যাইতে পাইতে পাবে না। অতএব সে কোন কার্য্যের জন্যই শাস্তি বা তিরস্কার ভাজন হইতে পারে না।

বালক-চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা শুনিয়া হয়তো পাঠক বিস্মিত হইবেন। তিনি তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বালকগণের চরিত্র দেখিতে অভ্যস্ত তাই তিনি মনে করিবেন আমার সব কথা ভুল। কিন্তু ভুল তাহারই, আমার নহে। সাধারণতঃ ছাত্রগণকে তোমরা কঠোর শাসনের অধীন করিয়া রাখ তাহারা যতক্ষণ তোমাদের চক্ষে চক্ষে থাকে ততক্ষণ ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে আবার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিলেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। সহর হইতে এইরূপ দুইটি বালককে কোন গ্রামে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহারা এত অনিষ্ট করিয়া বসে যে গ্রামের সমস্ত যুবক মিলিয়াও [illegible] করিতে পারেনা।

একটি ভদ্রলোকের ছেলে এবং একটি কৃষকের ছেলেকে একই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ। দেখিবে অল্পক্ষণ মধ্যে ভদ্রলোকের ছেলেটি গৃহের সমস্ত জিনিষ এলোমেলো করিয়া ও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে অথচ কৃষকের ছেলেটি স্থির হইয়া বসিয়াই আছে। এই পার্থক্যের কারণ কি বলিতে পার? প্রথমোক্ত বালক সাধারণতঃ স্বাধীনতা পায় না মুহূর্ত্তের জন্য যে স্বাধীনতাটুকু পাইয়াছে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে আর কৃষকের ছেলে সর্ব্বদাই স্বাধীনতা পাইয়া থাকে তাহার উহা হারাইবার ভয় নাই তাই স্বাধীনতার ব্যবহার করিবার জন্য সে তত ব্যস্ত নয়। আবার এই কৃষকের ছেলেকেই অত্যধিক প্রশ্রয় বা পদে পদে বাধা দিলে সেও কেমন কেমন হইয়া উঠে।

ধীরে ধীরে।

অতি সন্তর্পণের সহিত আপাততঃ অযৌক্তিক একটা কথা বলিতেছি। আমার বিশ্বাস শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে উহার মত প্রয়োজনীয় ও সারগর্ভ উপদেশ আর নাই। তাহা এই — ত্বরা করিও না, সময় লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না বরং সময় হারাও। জীবনের প্রথম দ্বাদশ বর্ষ এক হিসাবে অতি সমস্যাময় সময়। ঐ সময়ে বালকের মনে ভুল ভ্রান্তি ও অসৎ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইতে থাকে অথচ যে উপকরণের সাহায্যে এইগুলি বিদূরিত করা যাইতে পারে তখনও তাহার বিকাশ হয় না। যদি শিশুগণ মাতৃস্তন্য পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিমান হইয়া পড়িতে পারিত তবেই প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী কার্য্যকরী হইত বটে। কিন্তু প্রকৃতির বিধান তাহা নহে। সুতরাং তাহাদের জন্য চিরাচরিত প্রথা হইতে সর্ব্বথা বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রণালী আবশ্যক। কথা এই ঐ বয়সে যখন মানসিক ক্ষমতাগুলির আবির্ভাব হয় না সুতরাং তখন তাহাদিগের মানসিক চর্চ্চা করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। অন্ধের নিকট মশাল জ্বালিলে তাহার কি কোন উপকার হইতে পারে? সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ পথ খুঁজিয়া লইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ব্যক্তিরও কষ্ট হয় অন্ধ কেমন করিয়া তথায় পথ খুজিঁয়া পাইবে? সেইরূপ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে স্থলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে কষ্ট বোধ করেন সেই স্থলে অবিকশিতমনাঃ বালক কিরূপে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে?

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণাত্মক না হইয়া বরং বর্জ্জনাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কোন সত্য বা ধর্ম্ম শিখাইবার চেষ্টা করিতে হইবে না তৎপরিবর্ত্তে চেষ্টা করিতে হইবে মনে যেন কোন ভুল ধারণা এবং হৃদয়ে যেন কোন দুষ্প্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে না পারে। বার বছর বয়স

পর্য্যন্ত ছেলেকে কিছুই লেখা পড়া না শিখাইলেও ক্ষতি নাই। সে যদি ডান হাত বাম হাত চিনিতে না পারে তাহাতেও ক্ষতি নাই। যদি তাহার দেহ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে তবেই যথেষ্ট। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের বয়স আসিলে আপনা আপনিই তাহার বুদ্ধি খুলিয়া যাইবে যদি ঐ বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে মানসিক চর্চ্চা করিতে না দেওয়া হয় তবে আর তাহার মনে ভুল ধারণা প্রবেশের অবসর থাকিবে না, মানসিক পরিশ্রম করিবার কোন ধরা বান্ধা অভ্যাস গঠিত হইতে পারিবে না। সুতরাং উক্ত বয়সের অব্যবহিত পরে যখন তাহার মানসিক অনুশীলন আরম্ভ করিবে তখন আর পূর্ব্ব গঠিত ভুল ধারণা বা অভ্যাস বাধা দিয়া তোমার চেষ্টা পণ্ড করিতে পারিবে না। তাই অল্পদিনের চেষ্টায়ই তাহাকে জ্ঞানী করিয়া তুলিতে পারিবে। সুতরাং প্রথমাবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেই বালকের শিক্ষা দান ব্যাপারে তুমি আশাতীত ফল লাভ করিতে পারিবে।

পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ বালকের বালকত্ব দূর করিয়া রাতারাতি প্রাপ্ত বয়স্ক পণ্ডিত করিয়া তুলিতে চান। তাই অতি অল্প বয়সের ছেলের সঙ্গেই ভাল মন্দ বিচার যুড়িয়া দেন, অনুরোধ, তোষামোদ, ভর্ৎসনা, তাড়না প্রভৃতির প্রয়োগ করেন। এইরূপ করিবেনা। বালক দিগকে যুক্তিতর্ক করিয়া কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিবেনা। বিশেষতঃ তাহারা যাহা ভাল বাসেনা যুক্তি তর্কের বলে তাহাদিগের দ্বারাই তাহাই ভাল বাসাইতে চেষ্টা করিবে না। কারণ তাহাদিগের অপ্রিয় বিষয়ের অনুকূলে যদি কেবল যুক্তি তর্কই করিতে থাক তবে তাহারা যুক্তি তর্কের প্রতিই বীতস্পৃহ হইয়া উঠিবে। এবং বিচারশক্তি প্রয়োগ করিতে উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের চক্ষে উহার মর্য্যাদা কমিয়া যাইবে। তাই তাহাদিগের কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শারীরিক বলের অনুশীলন যতদূর সম্ভব করিবে। কিন্তু মানসিক চালনা যতদূর সম্ভব

স্থগিত রাখিবে। বিচার শক্তি বিকাশ পাইবার পূর্ব্বে বস্তুর গুণ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। সাবধান থাকিবে যেন বালকগণ সেই সমুদয় জ্ঞানগুলিকে অভ্রান্ত মনে না করিয়া বসে। অপ্রচলিত ও অভূতপূর্ব্ব ধারণা বালকদিগের যত কম হয় তাহাই করিবে। যুক্তিদ্বারা ভাল বলিয়া না বুঝিলে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা ভাল তাহাও বালকের মঙ্গল বিধান করেনা। সুতরাং ভবিষ্যতের অমঙ্গল নিবারণের উপযোগী হইলেও জোর করিয়া বালকের তেমন ভাল করিতে নাই।

মানসিক চর্চ্চায় বিলম্ব হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইওনা। সেই বিলম্বটাকে বরং মঙ্গলজনকই মনে করিবে। কারণ এই বিলম্ব করিতে করিতে যদি বিচার শক্তি বিকাশের পূর্ব্ববর্ত্তী বয়সটা পার হইয়া যায় তবে আর প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দোষ বশতঃ তাহার ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিবে না সুতরাং উক্ত বিলম্ব পরিণামে লাভজনকই হইবে। বালকের বালকত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে দেও। লেখা পড়া আরম্ভ যথা সম্ভব বিলম্বে করিবে।

বালকের মানসিক অনুশীলন আরম্ভে বিলম্ব করিবার পক্ষে অন্য যুক্তিও আছে। কোন বালকের মনের স্বাভাবিক গতি কোন দিকে তাহা না জানিয়া তাহার মানসিক অনুশীলন আরম্ভ করা যায় না। কারণ মনের প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষা প্রণালীরও ভিন্ন ২ পথ অবলম্বন করিতে হয়। তাই তাহার মানসিক বিশেষত্ব জানিতে হইলে ধীরতা ও সাবধানতার সহিত তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহাকে একটি কথাও বলিতে হইবে না। কোন জীবাণুর প্রকৃতি জানিতে হইলে উহার বিকাশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; উক্ত বিকাশের পথে একটুও বাধা দিতে নাই। তবেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিশেষত্ব গুলি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হইয়া দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে পারে।

সেইরূপ, কোনও বালকের মন ও কালক্রমে কিছু বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিশেষত্ব গুলি বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে আপন মনে স্বাধীন ভাবে চলিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। একটুকুও বাধা দিতে হইবে না।

বালককে যে সময়টা স্বাধীন ভাবে থাকিতে দেওয়ার কথা বলা হইল বালকের শিক্ষা ততটা পেছনে পড়িয়া যাইবে বলিয়া কি মনে কর? তাহা হইবে না। ধীর ভাবে তাহার মানসিক বিশেষত্ব গুলি বেশ করিয়া দেখিয়া লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিলে শিক্ষাপ্রণালীতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা। পক্ষান্তরে না বুঝিয়া শুনিয়া তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিলে কিছু দূর এক প্রণালীতে অগ্রসর হইয়া দেখিবে ভুল করিয়া ফেলিয়াছ। তখন সেই ভুল সংশোধনের জন্য আবার কতপদ পেছনে পড়িতে হইবে। কৃপণ কিছুই হারাইবেনা ইহার ব্যর্থ প্রয়াসে অনেক হারাইয়া বসে। দেখিও তুমিও যেন সেইরূপ করিওনা। ছেলে বেলায় পড়াশুনা করাইবার জন্য ততটা তাড়াতাড়ি না করিলে মোটের উপর শেষে লাভই হইবে। বিবেচক চিকিৎসক রোগী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেননা। ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগীর ভাব বেশ করিয়া দেখিয়া লন। তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিলেও রোগীকে নীরোগ করিয়া তোলেন। কিন্তু অবিবেচক চিকিৎসক তাড়াতাড়ি করিয়া ঔষধ দিয়া রোগীকে মারিয়া ফেলেন।

মনে রাখিও মানুষ গঠন করিবার দায়িত্ব লইতে হইলে তোমাকে খাটি মানুষ হইতে হইবে। তোমার নিজের চরিত্রের আদর্শই বালকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। বালকের বুদ্ধিবৃত্তির আবির্ভাবের পূর্ব্বে এমন বিধান কর যেন তাহার বুদ্ধি বিকাশ পাইলে তাহার পক্ষে যাহা দর্শনীয় কেবল তাহাই তাহার সম্মুখে পড়ে। নিজের ব্যবহার দ্বারা সকলের ভালবাসা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর।

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ তোমাকে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইতেছে এরূপ না দেখিলে বালক তোমাকে তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে দিবেনা। সচ্চরিত্রতার গুণে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে ও পারিবে না।

অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেই লোকের ভালবাসা আকর্ষণ করা যায় না। তাই বলিয়া কৃপণ হইবে না, নিষ্ঠুর হইবে না পরের যে দুঃখ মোচন করিতে তোমার শক্তি আছে তাহা মোচন না করিয়া তজ্জন্য কেবল পরিতাপ করিবে না। তবে কথা এই যে কাহাকেও অর্থদান করার সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয় দান না করিতে পার তবে কিছুতেই তাহার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবে না। প্রত্যুত পরের জন্য নিজের সময় নিজের যত্ন চেষ্টা নিজের ভালবাসা এক কথায় নিজকে বিলাইয়া দিতে হইবে। তোমার অর্থ আর তুমি স্বয়ং এই দুই কখনই এক নহে। তোমার প্রদত্ত দান অপেক্ষা তোমার সহানুভূতি এবং দয়ার কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। এমন দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত জন অনেক আছে যাহারা তোমার দানের ভিখারী নহে কিন্তু তোমার সান্ত্বনার ভিখারী। কত নির্যাতিত জন তোমার অর্থের ভিখারী নহে কিন্তু তোমার আশ্রয়ের ভিখারী। বিবাদ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে পুনর্মেলন সাধন কর। মামলা মোকদ্দমা রহিত কর। সন্তানগণকে পিতৃমাতৃভক্তি শিখাও। পিতামাতাকে সন্তানের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতে শিখাও। বিবাহ-বন্ধন সঙ্ঘটন করিয়া সাংসারিক জীবন সুখ ময় করিয়া তোল। দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার ও অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমার ছাত্রের পিতামাতা ও আত্মীয়গণকে নিযুক্ত কর। নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ্যভাবে নিরাশ্রয় ও নির্য্যাতিত ব্যক্তির রক্ষক হইয়া দাড়াও। ন্যায়-নিষ্ঠ, পরোপকারী ও দয়ালু হও। কেবল ভিক্ষা দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিও না। টাকায় যাহা

করিতে পারেনা দয়া তাহা পারে। পরকে ভালবাস, পরের সেবা কর পরেও তবে তোমাকে ভালবাসিবে এবং তোমার সেবা করিবে। পরের প্রতি ভ্রাতৃবৎসল হও— দেখিবে সে নিজ সন্তানের মত তোমার অধীন হইবে।

তোমরা নিজেরাই ছাত্রগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছ। অন্যের স্কন্ধে আর সেই দোষ অর্পণ করিও না। যে অনিষ্ট হইল বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারে তাহা তত ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষে তাহাদের গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পণ্ডিত সাজিয়া বালকদিগকে অবিরত উপদেশ দেওয়া, তাহাদিগের কাছে নিয়ত বক্তৃতা করা ভাল নয়। তুমি "হয়তো মনে কর এই উপায়ে তাহাদিগকে বেশ ভাল কথা শিখাইলাম"। কিন্তু তদ্দ্বারা তোমার অজ্ঞাতসারে বালক কেবল ভূরি ভূরি অসার কথাই শিখিয়া ফেলিতেছে। তুমি আপনভাবে বিভোর হইয়া থাক তাই বুঝিতে পারনা যে তোমার উপদেশ ও বক্তৃতা অন্যের মনে কি ক্রিয়া করিতেছে।

যে সুদীর্ঘ শব্দলহরী আবৃত্তি করিয়া বালকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেছ তাহারই কত কথা বালক ভুল বুঝিয়া লইতেছে! তুমি যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিতেছ বালক কি তাহা তাহার নিজের ভাবে সমালোচনা করিবে না? নিজ বুদ্ধির দৌড় অনুসারে এক একটা নূতন রকমের ব্যাখ্যা করিবেন'? এবং প্রয়োজন হইলে সেই ব্যাখ্যা দিয়া তোমাকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে না? •

কেবল লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াছে এমন একটি বালকের কথায়ই কর্ণপাত করিয়া দেখ দেখি! তাহাকে আপন মনে কথা বলিতে ও প্রশ্ন করিতে দাও। তোমার যুক্তি তর্ক সে কেমন অদ্ভুত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। দেখিবে সে একে আর বুঝিয়াছে। সব ওলট পালট করিয়া ফেলিয়াছে সে নানা

কথা বলিতে বলিতে তোমাকে শ্রান্ত ও বিরক্ত করিয়া ফেলিবে, অপ্রত্যাশিত আপত্তি উত্থাপন করিবে। অবশেষে বাধ্য হইয়া হয় তোমার নিজের চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। অথবা তাহার মুখই বন্ধ করিতে হইবে। বহুভাষী বালক এইরূপ নীরবতাকে কিভাবে গ্রহণ করিবে? যদি সে একবার জানিতে পারে যে তাহার জয় হইল তবে আর তাহার লেখাপড়ার আশা ছাড়িয়া দাও। ভবিষ্যতে সে আর শিখিতে চেষ্টা করিবেনা কেবল পদে পদে তোমার প্রতিবাদ করিতেই ব্যস্ত থাকিবে।

সুশিক্ষক হইবার বাসনা থাকিলে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যে অগ্রসর হইবে, কথায়-বার্ত্তায় ও আচার-ব্যবহারে অতি সোজাসোজিভাবে চলিবে এবং স্বল্পভাষী হইবে।

পুনঃ পুনঃ বলিতেছি পাছে ভুল শিক্ষা দিয়া ফেলিতে হয় এই ভয়ে ভাল বিষয় শিক্ষা দিতেও বিলম্ব করিবে। সয়তান স্বর্গমণ্ডলে মানব জাতির জনক জননীকে ভাল মন্দের জ্ঞান দিতে যাইয়া তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছিল। সাবধান, তুমিও যেন এই সংসার স্বর্গে বালকগণকে জ্ঞান দিতে যাইয়া তাহাদের নির্ম্মল চরিত্রে কালিমার সঞ্চার না কর! বাহির হইতে নানাভাবে বালক নানা বিষয় শিখিয়া থাকে তাহাতে বাধা দিবার তোমার সামর্থ্য নাই। তবে সেই গুলি যেন যথাবিহিতরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে তাহার বিধান করিয়াই ক্ষান্ত থাক! রিপু মাত্রেরই প্রবল আবেগের কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। সেইগুলি সুস্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান। তাই উহারা বলপূর্ব্বক বালকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ক্রোধের লক্ষণগুলি এত প্রবল যে মনে উহার উদয় হইবা মাত্র অন্যে তাহা বুঝিতে পারে। ছাত্রগণকে নৈতিক উপদেশ দেওয়ার পক্ষে এইরূপ দৃশ্য একটি সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া কি মনে করিতে চাও?

তাহা করিও না। এতদবস্থায় একটুকু উপদেশ ও দিও না, একটি কথাও বলিও না। এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বালক আপনা আপনিই তোমাকে প্রশ্ন করিবে। বিষয়টি পূর্ব্বেই তাহার মনে দৃঢ় নিবদ্ধ হওয়াতে তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইবে। বালক দেখিতে পাইতেছে বদন মণ্ডল স্ফাত ও আরক্তিম, চক্ষু দুইটি যেন ছুটিয়া পড়িতে চায়, কণ্ঠস্বর আবেগপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গীর রকম দেখিয়া মনে হয় যেন কাহাকেও প্রহার করিতে উদ্যত। বালক এই সব দেখিয়া মনে করিবে উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ নহে। তখন স্থির ধীরভাবে বালককে বল ঐ লোকটি প্রকৃতিস্থ নহে। উহার ব্যারাম হইয়াছে। এই উপলক্ষে বালককে বিবিধ ব্যাধি এবং তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে পার কারণ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া প্রকৃতির বিধান। সুতরাং আপনাকে উহাদের আক্রমণের অধীন বলিয়া বুঝিয়া রাখিতেই হইবে।

ক্রোধ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণা হইয়া গেলে পর অতিশয় ক্রোধের বশ হইতে বালকের অনিচ্ছা হইবে কারণ উহা এক প্রকার ব্যাধি বলিয়াই সে স্থির করিয়াছে। সময় বুঝিয়া এইরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে যে কাজ হয় অসংখ্য নৈতিক উপদেশেও তাহা হয় না। পূর্ব্বোক্ত ধারণার ভবিষ্যৎ ফল কতদূর তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখ। ইহার পর প্রয়োজন হইলে তুমি তোমার সন্তানের ক্রুদ্ধাবস্থায় তাহার প্রতি রোগীর ব্যবস্থা খাটাইতে পারিবে, তাহাকে এক কক্ষে এক বিছানায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারিবে। তাহার রাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়া কত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে তাহাও বুঝাইতে পারিবে। ক্রোধ ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত কঠোরতাই অবলম্বন করনা কেন তাহার কাছে উহা শাস্তি বলিয়া মনে হইবে না।

যদি তুমি নিজে কোন সময় তাহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্যের জন্য

ধীরতা হারাইয়া ফেল তবে তাহা গোপন করিও না বরং তোমার সন্তানকে মৃদুভৎর্সনা সূচক বাক্যে বল "দেখ তুমিই তো আজ আমাকে এই আঘাতটা করিলে।"

বালক মানব সমাজের মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে মানুষে মানুষে পরস্পর কি সম্পর্ক তাহা এক বারে জানিতে না দিয়া রাখা একপ্রকার অসম্ভব। তবে কথা এই যতদিন সম্ভব তাহাদের মনে এই সব ধারণা প্রবেশ করিতে না দেওয়াই উচিত, আর দিলেও যে যে সম্পর্ক স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করে, কেবল সেইগুলির জ্ঞান দেওয়া উচিত। ইহার প্রয়োজন এই যে সে পাছে নিজকে সর্ব্বময় কর্ত্তা মনে করিয়া বসে এবং অজ্ঞতা বশতঃ পরের অনিষ্ট করিয়া ফেলে। সকল বালকের প্রকৃতি সমান নহে। অনেকে শান্ত প্রকৃতি। তাহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে মানব সমাজের কোন জ্ঞান না দিয়া রাখা যাইতে পারে। কিন্তু অনেকে আবার দুর্দ্দান্ত। তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রীতিমত লেখাপড়া ও সামাজিক কর্ত্তব্য শিখাইতে হয় নতুবা অবিলম্বেই তাহাদিগের স্বভাব সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিগড়বদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে।

স্বামিত্ব জ্ঞান।

বাল্যকালে মানুষ নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাহার সুখ দুঃখের জ্ঞান নিজের সুখ দুঃখের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। পরের সুখ দুঃখ কি সে তাহা প্রায় বুঝিতে পারেনা। বালকের নৈসর্গিক অঙ্গ সঞ্চালনের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ও আত্ম সুখ সংবিধান। ন্যায় পরতা বলিতে তাহারা কেবল বোঝে তাহাদের প্রতি অপরের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অন্যের প্রতি তাহাদের কিরূপ ব্যবহার

করা উচিত তাহাও যে উক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ তাহা তাহাদের মনে আসেনা। বালক প্রকৃতির এই বিশেষত্বটুকু ভুলিয়া যাইয়া আমরা বালকের শিক্ষা সংবিধানে ত্রুটি করিয়া বসি। বালকদিগের অন্যের প্রতি কি কি কর্ত্তব্য তাহা শিখাইবার জন্যই ব্যস্ত হই কিন্তু অন্যের নিকট হইতে তাহাদের কি কি দাবী আছে তাহা শিখাইতে চাইনা। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক। যাহা প্রথমে বুঝিতেই পারেনা তাহাতে অনুরাগ জন্মিবে কি করিয়া?

শিশুগণ প্রথমেই জড় পদার্থের প্রতি বল প্রয়োগ করে কিন্তু অন্য মানুষের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে যায় না। তারপর তাহারা শীঘ্রই শিখে যে অধিকতর বয়স্ক ও বলবান মানুষদিগের প্রতি যথেচ্ছ বল প্রয়োগ করিতে হয় না, তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু জড় পদার্থের বেলায় সে বাধা নাই। জড়পদার্থতো আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের হস্ত হইতে আপনা আপনি পলাইয়া যাইতে পারেনা। আর জড় পদার্থের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকারই স্বামিত্ব। মানুষের প্রতি ব্যবহারে স্বেচ্ছার প্রসার অর্থাৎ স্বাধীনতার কথা পরে আলোলোচনা করা যাইবে। স্বামিত্ব সম্বন্ধে ধারণা দিতে হইলে শিশুর নিজের বলিতে কিছু থাকা চাই। যদি বল, কেন? জামা, কাপড়, খেলার পুতুল প্রভৃতি কত বস্তুইতো তাহার নিজের। কিন্তু তাহা ঠিক হইল না। কি করিয়া সেইগুলি তাহার নিজের হইল তাহাতো তাহার বুঝা চাই। যদি বল তাহাকে সেইগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই উহা তাহার নিজের হইয়া গিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধেও আপত্তি আছে। দান ক্রিয়া দ্বারা যে বস্তুবিশেষের প্রতি অধিকার হস্তান্তরিত হয় ইহাতো একটা কল্পিত, মনগড়া ব্যাপার। শিশুর মন এইসব কল্পিত ব্যাপার বুঝিতে পারে না। তারপর, স্বামিত্ব আগে না দান আগে? কোন বস্তুর প্রতি

স্বামিত্ব না জন্মিলে তাহা দান করিবে কিরূপে? স্বামিত্ব কথাটা বুঝিতে হইলে কেবল দাতায় যাইয়া থামিলে চলিবে না। যে মূলভিত্তির উপর দাতারও স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত উহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। গ্রাম্য বালক যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতেই কৃষিকর্ম্ম যে কি তাহা কতকটা জানিয়া ফেলে। মানবমাত্রেই কিছু গড়িয়া বা কোন কার্য্যের অনুকরণ করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে চায়। বিশেষতঃ শৈশব কালে এই কর্ম্মলিপ্সা ও অনুকরণপ্রবৃত্তি অতি প্রবল থাকে। কাহাকেও বাগানে চাষ দিতে, বীজ বপন করিতে বা চারা লাগাইতে দুই একবার দেখিলেই হইল। অমনি বালক নিজে তাহা করিতে চায়।

অমল ঐরূপ ইচ্ছা করিলে আমি বাধা দেওয়া দূরে থাকুক বরং উহার প্রশ্রয় দিয়া থাকি। আমিও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে থাকি। তাহাকে বেশ বুঝিতে দেই যে তাহার খাতিরে ঐ কার্য্যে যোগ দিতেছি না স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই উহা করিতেছি। সে নিজে হয় বাগানের মালী, আর আমি হই যোগানদার। শক্তির অল্পতা বশতঃ সে যাহা পারিয়া উঠেনা আমি তাহা করিয়া দেই। সে তাহার এই বাগানে একদিন ছিনের বীজ বপন করিল এবং তদ্দ্বারাই বাগানটি তাহারই অধিকারে আসিল বলিয়া বুঝিল। সুদূরে সমুদ্র বক্ষে একটা নূতন দেশে পৌছিয়া নিশান গাড়িয়াই দেশ অধিকার করার কথা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। তদ্রূপ অধিকার অপেক্ষা পূর্ব্বোক্তরূপে বাগান অধিকারের মূল্য অধিকতর নয় কি?

বালক প্রতিদিনই ছিম গাছে জল দিতে আসে এবং গাছগুলি অঙ্কুরিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হয়। আর আমি এই বলিয়া তাহার আনন্দ বাড়াইয়া দেই "এই বাগান তোমারই হইয়া গিয়াছে"

এই বলিয়া আমি তাহাকে ইহাই বুঝাইতে চাই "তুমি এই জমিখণ্ডের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, ইহাতে অনেক সময় ব্যয় করিয়াছ ইহার জন্য অনেক যত্ন লইয়াছ। অন্যে যদি তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বে তোমার একখানা হাত ধরে তাহা যেমন টানিয়া আনিতে তোমার অধিকার আছে সেইরূপ অন্য কেহ এই জমি অধিকার করিতে আসিলে তাহাতে আপত্তি করিতে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে।"

রোজ রোজ যেমন আসে তেমনই একদিন সকাল বেলায় জলের কলসী হাতে লইয়া সে বাগানে আসিয়াছে। কিন্তু আসিয়া কি দেখিল? ছিমের গাছগুলি সব উৎপাটিত! চসা মাটির সারিগুলি ভাঙ্গা চুরা! জমি খণ্ড কি রকম হইয়া গিয়াছে! আর চিনিবার যো নাই! বালক মনে মনে বলিতে লাগিল "আমার এত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল! এত যত্ন চেষ্টার ফলে যে গাছগুলি উঠাইয়া ছিলাম সে গুলির এই দশা হইল! কে আমার এমন অনিষ্ট করিল?" অন্যায় অবিচার যে কি বস্তু তাহা সর্ব্ব প্রথমে সে এখন বুঝিতে পারিল। দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে চীৎকার করিতে লাগিল।

আমরা সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলাম। অবশেষে আমরা জানিতে পারিলাম মালীই এই কাণ্ড করিয়াছে। অমনি মালীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদেরই ভুল হইয়াছিল। মালী আমাদের কথা বলিতে যাইয়া আমাদিগকেই বেশী করিয়া দোষ দিতে লাগিল। সে বলিল "এখন বুঝিতে পারিলাম আপনারাই আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি এই জমিতে অতি উৎকৃষ্ট ফুটির বীজ লাগাইয়াছিলাম। আহা, তেমন বীজ আর পাইব না। বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়াও ছিল। আপনারাই সে গুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া সামান্য সিমের বীজ পুতিয়াছিলেন। আশা করিতেছিলাম

কেমন সুন্দর ফল হইবে। মনে করিতেছিলাম কালে আপনাদিগকেও একভার ফল উপহার দিব। কিন্তু আপনারা আমার এমন ক্ষতি করিয়াছেন যে তাহা আর পূরণ হইবার নহে, আর নিজেরাও সুমিষ্ট ফুটির আস্বাদে বঞ্চিত হইলেন।”

শিক্ষক — মালী, আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি এই জমির জন্য খাটিয়াছিলে, কত যত্ন লইয়াছিলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি তোমার বোনা ফসল নষ্ট করিয়া ফেলা আমাদিগের পক্ষে বড় অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা তোমাকে কিছু ফুটির বীজ সংগ্রহ করিয়া দিব। এখন হইতে জমি চাষ করিতে হইলে আগে দেখিয়া লইব আর কেহ পূর্ব্বে উহাতে হাত দিয়াছে কিনা।

মালী — না, মহাশয়, আপনারা আর জমি পাইবেন না। আমাদের এখানে পতিত জমি মোটেই নাই। আজ যে জমি আমার চাষে, বহু পূর্ব্ব হইতে আমার পিতার হাতে ইহার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে। সব জমির অবস্থাই ঐরূপ। এখানকার প্রত্যেক জমিই বহুকাল পূর্ব্বেই কেহ না কেহ পত্তন লইয়াছে।

অমল — আচ্ছা মালী, মাঝে মাঝেই কি তোমার এইরূপ লোকসান হয়?

মালী — না, খোকাবাবু। এখনকার বালকেরা সাধারণতঃ আপনাদের মত অসাবধান নয়। কেহই তাহার প্রতিবাসীর বাগানে হাত দেয় না; অন্যের কাজে হাত দিয়া কেহ কাহারও ক্ষতি করে না।

অমল — কিন্তু আমার যে কোন বাগান নাই।

মালী — তাহাতে আমার কি? আপনারা যদি আমার বাগান নষ্ট করেন, তবে আর আপনাদিগকে আমার বাগানে বেড়াইতে দিব না। কারণ আপনাদের বুঝা উচিত যে আমার সমস্ত পরিশ্রম নিরর্থক হউক ইহা কখনও আমার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

শিক্ষক — আচ্ছা, মালী, তোমার সঙ্গে কি আমরা একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারি না? এই বালককে এবং আমাকে তোমার বাগানের এক কোণা ছাড়িয়া দেও। উহাতে আমরা যাহা উৎপন্ন করিতে পারিব তাহার অর্দ্ধেক তুমি পাইবে।

মালী — আমি আপনাদের উৎপন্ন শস্যের কিছুই চাইনা। আপনাদিগকে এই কোণাটা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু মনে রাখিবেন, আপনারা যদি আমার ফুটিতে হাত দেন তাহা হইলে আমি আপনাদের ছিম গাছ উঠাইয়া ফেলিব।

এই দৃষ্টান্ত হইতে ছেলেরা সহজেই বুঝিতে পারে স্বামিত্বের মূল ভিত্তি কোথায়। কেহ কোন কিছু সর্ব্বপ্রথমে অধিকার করিয়া তাহার জন্য খাটিলে তাহার সেই বস্তুতে একটা দাবী জন্মে। এই দাবীই স্বামিত্ব জ্ঞানের মূল ভিত্তি।

এইরূপ দৃষ্টান্ত সরল সংক্ষিপ্ত এবং বালকদিগের পক্ষে সহজে বোধগম্য। তারপর অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পত্তির মালিক থাকার কথা এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কথা বুঝান কঠিন নহে। স্বামিত্ব সম্বন্ধে এতদপেক্ষা জটিলতর কোন ধারণা বালককে দিবার প্রয়োজন নাই।

দুই তিন পৃষ্ঠা লিখিয়াই বিষয়টি বুঝাইলাম বটে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে হাতে কলমে বুঝাইতে হয়তো পূরা এক বৎসর লাগিতে পারে। কারণ বালকদিগের মনে নৈতিক বিষয়ে কোন ধারণা জন্মাইবার বেলায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত; আর যত স্থায়ী যত দৃঢ়ভাবে উহা বালকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারা যায় ততই ভাল। হে নবীন শিক্ষকগণ! এই দৃষ্টান্তের প্রতি আবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বালকদিগকে কোন বিষয়ে পাঠ দিতে হইলে বক্তৃতা না করিয়া হাতে কলমে কাজ করাইয়া শিখানই ভাল। কারণ তন্মে

তাহাদিগের নিকট যাহা বলে বা যাহা করে তাহা তাহারা সহজে ভুলিয়া যায় কিন্তু তাহারা নিজ হাতে যাহা করে তাহা সহজে ভোলে না।

বালকের কত বছর বয়স হইলে এইরূপ বিষয়ে পাঠ দিতে হইবে তাহা একবার বলা হইয়াছে। বালকের প্রকৃতির উপরই তাহা নির্ভর করে। সে শান্ত শিষ্ট হইলে এই সব পাঠ দিতে বিলম্ব করিতে হইবে। আর যদি দুর্দ্দান্ত হয়, তবে আগেই দিতে হইবে। যে দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পাঠ দিবে তাহা যেন বালকেরা বুঝিতে ভুল না করে। অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়ে পাঠ দিবার বেলায় কেবল একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম না হইবারই কথা। স্বমিত্র এই বিষয়টি কঠিন। সুতরাং নিম্নে আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কোন কোন শিশু যাহা হাতে পায় তাহাই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহাতে বিরক্ত হইবে না। যে জিনিষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা শিশু না পাইতে পারে এমন স্থানে রাখিয়া দেও। সে যেন তাহার নিত্য ব্যবহার্য্য একটা জিনিব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে তাড়াতাড়ি আর সেই ধরণের জিনিষ আনিয়া দিও না। উহার অভাবে যে কি কষ্ট হয় তাহা একবার সে বুঝুক। মনে করি সে যেন তাহার কক্ষের জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। জানালা মেরামত করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া সারা দিন রাত বাতাস বহুক। তাহার সর্দ্দি লাগিবে বলিয়া ভীত হইও না। একটুকু সর্দ্দি লাগিয়াও যদি বালকের জ্ঞানোদয় হয় তবে তাহাই ভাল।

তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা যে তোমার অসুবিধা হইয়াছে তাহাতে বিরক্তি বোধ করিও না। তাহাকে স্বয়ং সেই অসুবিধা ভোগ করিতে দেও। অবশেষে, তাহাকে কিছু না বলিয়া জানালায় নূতন কাচ লাগাও। মনে কর, সে আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইবার অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। একটুকু রাগ না করিয়া শান্তভাবে তাহাকে বল

"ঐ জানালাগুলি আমার। আমিই কষ্ট করিয়া উহা তৈয়ার করিয়াছিলাম। এই গুলি যাহাতে আর ভাঙ্গিতে না পার এইবার তাহাই করিব।" এই কথা বলিয়া জানালাবিহীন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিবে। কেহই যেন তাহার কান্নায় কর্ণপাত না করে। কিছুকাল পরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কাঁদিতে থাকিবে। তারপর জনৈক ভৃত্যকে সেই ঘরে পাঠাইয়া দেও। বালক অবশ্য তাহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবে। ভৃত্য কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া কেবল এই বলিয়া চলিয়া যাক্ "আমার ত জানালাগুলি যাহাতে ভাল থাকে তাহাও দেখিতে হইবে।"

এইভাবে কয়েক ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার পর সে অস্থির হইয়া যাইবে। তখন আর কেহ আসিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব করুক "তুমি যদি আর কোন দিন জানালা না ভাঙ্গ তবে তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।" তখন সে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির হইবে। তুমি তাহার নিকট যাও। গেলেই সে বলিবে "আমি আর কখনও জানালা ভাঙ্গিব না আমাকে ছাড়িয়া দিন।" তখন তুমি তৎক্ষণাৎ বলিবে "সে তো বেশ কথা। এই প্রস্তাব আমাদিগের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল জনক। এমন সুন্দর প্রস্তাব আগে কর নাই কেন?" তার পর আর তাহাকে তাহার কথা রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না। তাহাকে তাহার নিজ কক্ষে লইয়া যাও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি আদর যত্ন প্রদর্শন কর। এইবারের প্রতিজ্ঞা সে নিশ্চয় পালন করিবে বলিয়া তোমার বিশ্বাস এই ভাব দেখাও। এই একটা ব্যাপার হইতে সে কত কি শিখিতে পারিবে। পরস্পর বাধ্য বাধকতা বিষয়ে তাহার জ্ঞান হইবে, জিনিষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব কতদূর তাহাও সে বুঝিতে পারিবে। চরিত্র পূর্ব্বেই অধঃপাতিত না হইয়া গিয়া থাকিলে এরূপ শিক্ষায় বালকের উপকার না হইয়াই পারে না। এইরূপ শিক্ষার পরে কোন বালক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবার জানালা ভাঙ্গিবে বলিয়া মনে হয় না।

মিথ্যাচরণ—দৃষ্টান্তের বল।

নীতিবিষয়ক উপদেশপ্রাপ্তি ও মিথ্যাচরণ প্রায় একসূত্রে গাঁথা। নীতি ও কর্ত্তব্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতারণা ও কপটতাচরণ আসিয়া পড়ে। যখনই কতকগুলি কার্য্য কাহারও পক্ষে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তখনই তাহার সেই জাতীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যগুলি গোপন করিবার ইচ্ছা জন্মে। প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লোকে একটা কার্য্য করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে আর অন্য প্রবৃত্তি আসিয়া তাহাকে উক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রণোদিত করে। তখন তাহার প্রধান চেষ্টা হয় কেমন করিয়া প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ করিয়াও অক্ষত-দেহে থাকিতে পারিবে, তাই সে ওজর অজুহত খুজিয়া বেড়ায়, কপটতাচরণ করে এবং মিথ্যা কথা বলে। ঈদৃশ মিথ্যাচরণ নিবারণ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই অথচ ইহার জন্য আমরা শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়ি না। কাজেই মানুষের জীবনের যত দুঃখ ক্লেশ তাহা মানুষের ভুল হইতেই জন্মিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে বালকগণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তবে তাহাদিগের অনুষ্ঠিত অসৎকার্য্যের অপ্রতিবিধেয় ফলরূপে শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতএব মিথ্যাকথার দোষ বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট বক্তৃতা করার প্রয়োজন নাই অথবা মিথ্যা

কথা বলার জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগকে শাস্তি দিতেও নাই; কিন্তু তাহারা একবার মিথ্যাবাদী হইলে তজ্জনিত যাবতীয় অসুবিধা যেন উহাদের স্কন্ধে পূর্ণবিক্রমে চাপিয়া বসে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহারা পূর্ণ মাত্রায় বুঝুক যে একবার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবার পর পরে সত্য বলিলেও লোকের অবিশ্বাস ভাজন হইতে হয়। বিষয় বিশেষে তাহারা মিথ্যা বলে নাই দৃঢ়তা সহকারে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিলেও তাহাদের ভাগ্যে মিথ্যাবাদিতার দুর্নাম আসিয়াই পড়ে। কিন্তু একবার দেখা যাউক বালকদের মিথ্যাবাদিতার প্রকৃতি কি?

মিথ্যার দুইটী শ্রেণী ভাগ করা যাইতে পারে যথা—অতীত ঘটনা বিষয়ক এবং ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বিষয়ক। কোন কাজ করিয়াছি অথচ অন্যের নিকট বলি যে উহা করি নাই। যাহা ঘটে নাই বলিয়া জানি তাহাই ঘটিয়াছে এইরূপ বলিয়া বেড়াই। এইগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর মিথ্যা। আবার কোন কাজ করিবনা বলিয়া মনে মনে ঠিক করা আছে অথচ অন্যের নিকট উহা করিব বলিয়া বলিলাম। মোটের উপর মনে মনে এক সংকল্প রাখিয়ে অন্য সঙ্কল্প প্রকাশ করি। এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর মিথ্যা। সময়ে সময়ে এই দ্বিবিধ মিথ্যার সমন্বয় ঘটিয়াও থাকে। এক্ষণে উহাদের পার্থক্য আলোচনা করা যাইবে।

যাহাদের পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, যাহারা পদে পদে পরের অনুগ্রহ পাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে তাহাদিগের পক্ষে মিথ্যা বলিয়া পরকে প্রতারিত করায় কোন লাভ নাই। বরং বাস্তবিক ঘটনাগুলি সাহায্যকারীর দৃষ্টি পথে পতিত হওয়াই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। নতুবা হয়তো তাহাদের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অতএব প্রথম শ্রেণীর মিথ্যা অর্থাৎ ঘটনাগত মিথ্যা

বলা বালকের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। তবে বাধ্য বাধকতার নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে মিথ্যা বলা অসম্ভব নহে। কারণ পরের কথা মানিয়া চলা এই ব্যাপারটাই স্বতঃ অপ্রীতিকর। তাই গোপনে গোপনে যতদূর উহা এড়াইতে পারি তাই আমরা চাই। বালক দেখিতে পায় আদেশ অমান্য করিয়া উহা গোপন করিলে আপাততঃ ভৎর্সনা বা শাস্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় পক্ষান্তরে ইহা গোপন না করিয়া সত্য বলিলে ভবিষ্যতে লাভ হইতে পারে। এই দুই ফল তুলনা করিয়া প্রথমটি যত বেশী গুরুতর বলিয়া মনে করে বালকের মিথ্যা বলিবার প্রবৃত্তি তত প্রবল হয়।

প্রকৃতির নিয়মে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে বালক মিথ্যা কথা বলিবে কেন? তোমার নিকট কোন্ বিষয় তাহার গোপনীয় থাকিতে পারে? তুমি তো তাহাকে ভৎর্সনা করিতে শাস্তি দিতে অথবা জোর করিয়া তাহার দ্বারা কিছু করাইয়া লইতে যাইতেছ না। খেলার সাথীর কাছে সরলভাবে যেমন সব কথা বলে, তেমনি তোমার কাছে সব কথা বলিবে না কেন? খেলার সাথীকে তো সে ভয় করে না। তেমনই তোমাকেও সে ভয় করিবে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মিথ্যা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধীয় মিথ্যা আচরণ করা বালকের পক্ষে আরও অস্বাভাবিক। কারণ কিছু করিব বা না করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইলেই স্বাধীনতার সঙ্কোচন হয় সুতরাং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রকৃতির নিয়ম নহে — একটা সামাজিক নিয়ম মাত্র। বালকের এই সামাজিকতার জ্ঞান নাই আর বালকের প্রতিজ্ঞা প্রায়ই নিরর্থক — কারণ তাহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভবিষ্যতে প্রায় পৌছেইনা। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য তাহারা যখন কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তখন সেই স্বকৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধেই তাহাদের কোন ধারণা থাকে না। বর্ত্তমান বাধা হইতে নিষ্কৃতিলাভই

বালকের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে — তদুদ্দেশ্যে তাহারা যে বাক্যই উচ্চারণ করুক না কেন উহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইতে পারে তাহা মোটে বুঝিতেই পারে না। তাহার যখন ভবিষ্যৎ বুঝিবার ক্ষমতা নাই তখন তাহার প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে। অতএব তাহার পক্ষে প্রতিজ্ঞাজনিত মিথ্যা বলা অসম্ভব। বর্ত্তমানে মা'র খাওয়া এড়াইবার জন্য বা মিষ্ট দ্রব্য খাইতে পাইবার জন্য আগামী কল্য জানালা হইতে লাফাইয়া পড়িবে বলিয়া স্বীকার করিতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। সেই জন্যই আদালতের চক্ষে বালক চুক্তিভঙ্গের জন্য দায়ী হয় না। সময় সময় জনক জননী এবং শিক্ষক আদালত হইতেও কঠোরতম হইয়া বসেন বা তাহারা বালকদিগের দ্বারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করাইয়া লইতে চান — এইরূপ স্থলে বালকেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও যাহা যাহা করিত তাহাই মাত্র করে।

বালক প্রতিজ্ঞা করিবার কালে বুঝিতে পারে না যে কি করিতেছে সুতরাং তাহার তৎকালিক কার্য্যকে মিথ্যাচরণ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু সে যখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে তখন ব্যাপারটা আর একরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ তখন তাহার বেশ মনে হয় যে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তবে ঐ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার প্রয়োজনটা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নাই বলিয়া তাহার কার্য্যের ভাবী ফলটা সে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা তাহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বালকদিগের মিথ্যাবাদিতার জন্য শিক্ষকগণই দায়ী। বালকদিগকে সত্যবাদী হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দানের চেষ্টার ফলেই তাহারা মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। আমরা বালকদিগকে শাসন করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হই —

অত্যধিক ব্যস্ততার জন্যই আমাদিগের উদ্দেশ্য পণ্ড হয়। অনুপযোগী উপদেশ দান করিয়া এবং অনুপযোগী নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী করিয়া আমরা তাহাদের মনোরাজ্যের নিত্য নূতন অংশ দখল করিয়া বসিতে চাই। আমরা চাই — ছাত্র দুই চারিটা মিথ্যা কথা বলে বলুক — কিন্তু পড়া শিখিতেই হইবে। কিন্তু আমাদিগের চাওয়া উচিত — ছাত্র বরং কিছুকাল লেখাপড়া নাই শিখুক কিন্তু যেন সত্যবাদী হয়।

আমি বালকদিগকে কার্য্যোপলক্ষে শিক্ষা দিবারই পক্ষপাতী — বালকের বিদ্যা তত হউক বা না হউক — কিন্তু তাহার সচ্চরিত্র হওয়া চাই — ইহাই আমার মত। এমতাবস্থায় ছাত্রের নিকট হইতে জোর করিয়া কোন ঘটনা বাহির করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না; কারণ তাহা হইলে সে উক্ত বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে বালকের ভবিষ্যতে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আমরা তাহার দ্বারা তেমন প্রতিজ্ঞা করাইতে চাহি না। আমার অসাক্ষাতে যদি কোন আনির্দ্দিষ্টনামা ব্যক্তি কর্তৃক কোনও অনিষ্ট সাধিত হয় আমি অমলকে এজন্য দোষী মনে করিব না অথবা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব না — "অমল, তুমিই কি উহা করিয়াছিলে?" কারণ তাহা করিলে প্রকারান্তরে তাহাকে মিছা কথা বলিতে শিখানই হইবে। অমলের প্রকৃতি স্বভাবতঃই চঞ্চল — এইজন্য যখন কোন কোন বিষয়ে তাহাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করার প্রয়োজন হয় তখন এমন কৌশল অবলম্বন করি যে অঙ্গীকারের প্রস্তাব সে নিজেই উপস্থিত করে। তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারিবে যে অঙ্গীকার পালন করিলে তাহারই মঙ্গল হইবে আর যদি কখনও সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে তজ্জনিত শাস্তি ভোগ করিবার সময় সে শিক্ষকের দোষ দিতে পারিবে না। সে বুঝিবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে তাহার আত্মকৃত অবহেলার অপ্রতিবিধেয় ফলই তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে। সাধারণতঃ

অমলকে মিথ্যা কথার জন্য কোন শাস্তিভোগ করিতে হইবেই না। বহুদিন পর্য্যন্ত মিথ্যা কাহাকে বলে সে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। আর যখন বুঝিবে তখনও এই মনে করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে "লোকে মিথ্যা বলে কেন? তাহাতে লাভ কি?" অন্যের ইচ্ছা বা মতের উপর তাহার মঙ্গল প্রায়ই নির্ভর করে না এই কথা সে যত বেশী করিয়া বুঝিতে পারিবে তাহার মিথ্যা বলার প্রবৃত্তি ততই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

বালকদিগকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতাই অনর্থের মূল। ঐ ব্যগ্রতা কমাইলে বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়ার প্রবৃত্তিও কমিয়া আসিবে। তাহা হইলেই তাহাদের হিতার্থে যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় কেবল সেইটুক্ করাইয়া লইয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিব। তবেই যথাবিহিতরূপে মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে পারিবে। কিন্তু অবিবেচক শিক্ষকগণ অনেক সময় তাহার বিপরীত করিয়া বসেন। তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া জোর করিয়া বালকদিগকে নানাবিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন, তাহাদের স্বাভিরুচির অবকাশ দেন্ না, ব্যক্তিগত বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, আরোপিত কার্য্য বালকগণের ক্ষমতাসাধ্য কিনা তাহাও দেখেন না। ফলে এই হয় সুকুমারমতি বালক অধীনতার ভারে আক্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে অবহেলা করিতে থাকে, অনেক কথা ভুলিয়া যায় এবং অবশেষে ঐসব প্রতিজ্ঞা অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে এবং প্রতিজ্ঞাগুলিকে কেবল শূন্যগর্ভ বাক্য মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করা ও তাহা ভঙ্গ করাকে হাসি তামাসার বিষয় মনে করে। অতএব বালকদিগকে সত্যপরায়ণ করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবার সময় সবিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে।

বালকদিগের মিথ্যাবাদিতা সংশোধনের জন্য যে যে কথা বলা হইল তাহাদিগের অনেক কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই সেই সেই কথা খাটে।

সদ্‌গুণের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা যে ভাবে তদ্বিপরীত দোষের জ্বলন্ত বর্ণনা করিয়া উহার বর্জ্জনীয়তা বুঝাইতে প্রয়াস পাই তাহাতে অনভিজ্ঞ বালকগণের পক্ষে ঐ দোষগুলিই শিক্ষা দেওয়া হইয়া পড়ে। ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া যাইতে যাইতে বিরক্ত করিয়া ফেলি। জোর করিয়া স্তোত্র পাঠ করাইতে করাইতে তাহারা এত বিরক্ত হয় যে কোন্ দিন স্তোত্র পাঠ একেবারে বন্ধ করিতে পারিবে সেই চিন্তা করে। দান ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আমরা তাহাদিগের দ্বারা ভিক্ষা দেওয়াইয়া থাকি তাহা কি সঙ্গত? ইহাতে মনে হইতে পারে যে আমরা নিজ হাতে ভিক্ষা দিতে যেন ঘৃণাবোধ করিতেছি। বস্তুতঃ ভিক্ষাদান কার্য্যটি শিক্ষকের স্বহস্তেই সম্পাদন করা উচিত। তোমার ছাত্রকে যতই ভালবাস না কেন — তাহাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে উহা একটী সম্মানজনক কার্য্য, এইরূপ মহৎ কার্য্য স্বহস্তে করিবার উপযুক্ত সে এখনও হয় নাই।

যিনি ভিক্ষাদান কার্য্যটির গুরুত্ব নিজে উপলব্ধি করিতে পারেন ভিক্ষা পাইয়া ভিখারীর কত উপকার হয় তাহা বুঝিতে পারেন, এই কার্য্য তাঁহারই সাজে। কিন্তু বালক এতদুভয়ের কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং স্বহস্তে ভিক্ষা দান করিয়া তাহার কিছুই লাভ নাই। পরোপকারেচ্ছা তাহার অনুষ্ঠিত দান ক্রিয়ার অনুগামী হয় না। ভিক্ষা দান করিয়া সে বরং লজ্জিত হইয়াই থাকে কারণ সে দেখিতে পায় যে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ স্বয়ং দান করেন না। তাই নিজে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হইবে তখন আর তাহার দান করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। তারপর দেখ, বালকদিগের দ্বারা আমরা টাকা পয়সা প্রভৃতিই দান করাইয়া থাকি। কিন্তু বালকের চক্ষে ঐ সমুদয় ধাতু খণ্ডের কোন মূল্য নাই বলিলেই হয়। তাহার কাছে তাহার হস্তস্থিত একখানা

সন্দেশ শত রৌপ্যখণ্ড হইতে অধিকতর মূল্যবান্। তোমার এই দাতা বালককে তাহার নিজের হাতের একখানা সন্দেশ, একটা মার্ব্বল বা একটা পুতুল দিতে বল দেখি। তবেই বুঝিতে পারিবে তাহার হাত দিয়া এত টাকা পয়সা দান করিয়াও তাহাকে প্রকৃত দাতা করিতে পার নাই।

বালকদিগকে দান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আর একটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। বালক একটা কিছু অন্যকে দিল এবং তৎক্ষণাৎ সে তাহা বালককে ফিরাইয়া দিল। এইরূপ করিতে করিতে অন্যকে কিছু দিবার সময়ই বুঝিতে পারে যে তৎক্ষণাৎ সে উহা পাইবে। আমি যতদূর জানি বালকের দান সাধারণতঃ এই দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে।

লকের অভিমত এই যে বালকের দত্তবস্তু তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রত্যর্পিত করার উপকারিতা আছে। তিনি বলেন এই প্রণালী দ্বারা বালকেরা বুঝিতে পারে যে যত দিবে সে তত পাইবে। এইরূপে বালকগণ দাতা হইতে শিখিবে। কিন্তু ইহা দ্বারা আপাততঃ বদান্যতা শিক্ষা দেওয়ার ছলে প্রকৃতপক্ষে কার্পণ্যই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। একি বদান্যতা? কম দিয়া বেশী পাইবার লোভ বই আর ইহা কি? দত্ত বস্তু ফিরিয়া না পাইলেই এই বদান্যতা, ঘুচিয়া যায়। কেবল হাতে করিয়া দিলেই দান হইল না। ইহাতে মনের কি পরিবর্ত্তন হইল তাহাই দেখিতে হইবে। কেবল দান বলিয়া নয়, বালকদিগকে অন্যান্য সদ্গুণ শিক্ষা দিবার প্রচলিত প্রণালীরও এই দুর্দ্দশা। এই সব শিক্ষা দিবার নামে বাল্য কালটাকে আমরা বিষাদময় করিয়া তুলি অথচ শিক্ষা কিছুই হয় না।

শিক্ষকগণ, সর্ব্ববিধ কপটতাচরণ পরিহার করুন। নিজেরা সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক হউন যেন আপনাদের দৃষ্টান্ত ছাত্রগণের স্মৃতিপটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকিয়া কালক্রমে তাহাদের হৃদয়ে ক্রিয়া করিতে পারে।

আমি আমার ছাত্রকে নিজ হাতে বাল্যকালে কিছু দান করিতে দিব না, তাহার সমক্ষে আমি স্বয়ংই দান করিব; এই বিষয়ে সে যেন আমার অনুকরণ না করিতে পারে তাহার বিধান করিব। আমি তাহাকে বুঝিতে দিব যে তাহার ন্যায় অল্প বয়স্ক ব্যক্তিকে এইরূপ মহৎকার্য্য করিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারেনা। আমি দরিদ্রকে সাহায্য করিতেছি দেখিয়া সে আমাকে উক্ত বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে; আমি মাঝে মাঝে এই উত্তর দিব "দরিদ্রের ইচ্ছা যে পৃথিবীতে কতক লোক ধনী হউক। সেই জন্য ধনী ব্যক্তিগণ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে তাহারা নির্ধন এবং অশক্ত ব্যক্তিবর্গের ভরণ পোষণের ভার লইবেন।" অমনি সে জিজ্ঞাসা করিবে "আপনিও কি সেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন?" আমি উত্তর করিব — "অবশ্যই, আমার হাতে যে টাকা আসে তাহা কোন না কোন ধনীর টাকা হইতেই আসে। সেই ধনী যখন তাহার অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত সুতরাং টাকা দিয়া আমি তাহাদের প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য না করিলে ঐ টাকাকে আমার বলিতেই আমার অধিকার নাই।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা বিষয়ে, অন্য ছাত্রেরা আমার অনুকরণ করিতে প্রলোভিত হইবে। আমি দেখিব তাহারা যেন লোক দেখান উদ্দেশ্যে এইরূপ দান না করে। অমলও হয়তো শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে গোপনে দান করিবে। আমি তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত হইবনা। কারণ তাহার বয়সে এইরূপ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুতরাং আমি তাহাকে ক্ষমাই করিব।

কাহারও অনিষ্ট করিবে না ইহাই বাল্যকালের উপযোগী ও বালকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় একমাত্র নৈতিক শিক্ষা। এমন কি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইলে পরোপকার ও অন্যায় ও অমঙ্গলপ্রসূ ও বিষময় হইয়া দাড়াইতে পারে। এই সংসারে পরের উপকার কে না করে

অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোকও কোন না কোন লোকের উপকার করে কিন্তু সেই উপকার করিতে যাইয়া শত শত লোককে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। উহাই যত অনিষ্টের মূল। সমুদয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই নিবৃত্তিমূলক। এইগুলি অর্জ্জন করা অতি কষ্টকর, ইহাতে একটুকুও বাহ্যাড়ম্বর নাই এমন কি অন্যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউক মনে মনে এই সুখটুকু লাভ করিবার অবসর পর্য্যন্ত নাই। যদি কেহ প্রকৃত পক্ষে জীবনে কোন মানুষের অনিষ্ট না করিয়া থাকেন তবে তিনি কত বড়! তাঁহাদ্বারা মানুষের কত মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার নির্ভীকতা ও মনের বল কত উচ্চ দরের। কেবল যুক্তি তর্ক করিলে হইবে না— জীবনে এই নিয়মটি পালন করিবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিব ইহা কতদূর গুরুতর ও কঠিন বিষয়।

সময় সময় বালকদিগকেও নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নতুবা তাহারা আপনাদের বা অন্যের অনিষ্ট করিতে পারে এবং এমন কু-অভ্যাস গঠন করিয়া ফেলিতে পারে যে তাহার দূরীকরণ ভবিষ্যতে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইরূপস্থলে কিরূপ সাবধানতা লওয়া আবশ্যক তাহা প্রদর্শনার্থে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। কিন্তু বালকগণের শিক্ষাদানকার্য্য যথাযথরূপে নির্ব্বাহিত হইলে, উক্ত প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শিক্ষকের ত্রুটিবশতঃ তাহাদিগের হৃদয়ে অবাধ্যতা, পাপ প্রবৃত্তি লোভ প্রভৃতির বীজ উপ্ত না হইলে তাহাদিগের চরিত্রে ঐ সব দোষ প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং সম্প্রতি যাহা যাহা লিখিত হইল তাহা বিশেষ বিশেষ স্থলের জন্যই অভিপ্রেত। উহা সাধারণ বিধি নহে। বালকগণ প্রকৃতির প্রদর্শিত নিয়ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের দোষ গ্রহণ করিলেই ঐ সমুদয় বিশেষ স্থলের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যে সমুদয় বালক সমাজ মধ্যে বাস করিয়াই শিক্ষালাভ করে তাহাদের বেলাই পূর্ব্বোক্ত বিশেষ

বিধির প্রয়োজন হয়। সুতরাং সঙ্ঘ শিক্ষা অপেক্ষা গৃহ শিক্ষাই প্রশস্ততর। কারণ গৃহ শিক্ষায় অন্য কিছু না হইলেও অন্ততঃ নিম্নলিখিত উপকারটি হইয়া থাকে — উহাতে সংঘ শিক্ষার মত মানসিক বিকাশের ত্রস্ততা থাকে না তাই বালকের অবস্থাটার ধীরে ধীরে পূর্ণ পরিপুষ্টি প্রাপ্তির অবসর ঘটে।

বর্জ্জনাত্মক শিক্ষা।

কেহ কেহ বাল্যকালে স্বভাবতঃই বুদ্ধিমত্তায় সাধারণ বালকগণ হইতে অধিকতর উন্নত থাকে। তাহারা জন্মধারণের অব্যবহিত পরেই যেন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণের পদবীতে আরোহণ করে। বাল্যকাল সুলভ অপরিণত বুদ্ধির অবস্থাটা যেন তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেই পারে না। আবার এমন লোকও অনেক আছে যাহারা আজীবন বালকই থাকিয়া যায় — কখনও প্রাপ্তবয়স্কোচিত পরিণত বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। তবে অসুবিধা এই যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর দৃষ্টান্ত অতি বিরল এবং তাহাদিগকে বাছিয়া বাহির করাও কষ্টকর। আর এক অসুবিধা এই যে কোন কোন বালক অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকে এই কথাটা যে জননী একবার শুনিয়াছেন তিনিই নিজের সন্তানটিকে উক্ত শ্রেণীর বলিয়া ধ্রুব ধারণা করিয়া বসেন। বালকগণ সাধারণতঃই প্রফুল্ল। তাহাদের সরল হাবভাব এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে বেশ একটি চিত্ত-চমৎকারিণী মোহিনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি বাল্যকাল সুলভ ধর্ম্ম বই আর কিছুই নহে। অথচ অনেক জননী নিজের সন্তানে এই সকল গুণ দেখিতে পাইয়াই তাহাকে অসাধারণ প্রতিভাশালী মনে করিয়া বসেন। আমরা বালকগণকে অবাধে নানা কথা বলিতে দেই — সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহারা অজস্র কথা বলিয়া থাকে। এত কথার মধ্যে মাঝে মাঝে দুই চারিটি কথা বুদ্ধিমানের মত হইয়া পড়াটা মোটেই আশ্চর্য্যজনক

নহে। ঐরূপ না হইলেই বরং আশ্চর্য্যের কথা হইত। যে জ্যোতিষী কাহারও জীবনের অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে শত শত কথা বলেন তাহার দুই একটি কথা সত্য হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বরং তাহাও না হওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয়। নির্বোধের মত অনেক কথা বলিতে বলিতেই দুই চারিটি কথা রসাত্মক হইয়া পড়ে। এই রকম দুই চারিটি কথা বলিবার ক্ষমতার উপরই যাহাদের সুনাম নির্ভর করে তাহাদের জীবনে ধিক্।

বালকের মনে সহসা একটা উচ্চ শ্রেণীর ভাব প্রবেশ করিতে পারে না, কথাটা ঠিক বলা হইল না — একটা উচ্চদরের কথা বালকের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে তাই বলিয়াই সে ভাবটা যে তাহার নিজস্ব তাহা ঠিক নয়। কয়লা ঘাটিতে ঘাটিতে একখণ্ড হীরকও আমার হাতে পড়িতে পারে — তাই বলিয়া সেই হীরকখণ্ড যে আমার সম্পত্তি হইল তাহা নয়। ঐ বয়সে তাহাদের নিজের বলিয়া কিছু থাকে না। বালকের ভাষা আমাদের কাছে যাহা তাহার নিজের কাছে তাহা নয়। সে ভাষা আমাদের নিকট যে ভাব দ্যোতক বলিয়া মনে হয় তাহার নিজের কাছে তাহা হয় না। তাহার মনে যদিও কতকগুলি ভাব আসে সেগুলি শ্রেণীবদ্ধ এবং পরস্পর সম্বদ্ধ নহে। তাহার মন বড় চঞ্চল — তাহার চিন্তা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। তুমি যে সন্তানকে অসাধারণ প্রতিভাশালী মনে করিতেছ মনোযোগ সহকারে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিলে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পারিবে। একবার মনে হইবে বালকটি যেন স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ও অতি সূক্ষ্মদর্শী, আবার অধিকাংশ সময়ে মনে হইবে তাহার মানসিক শক্তি অতি সাধারণ রকমের, উহার বুদ্ধি যেন কুয়াসাচ্ছন্ন। সময় সময় মনে হইবে তাহার বুদ্ধির দৌড় তোমার হইতে অনেক বেশী — আবার সময় সময় মনে হইবে সে যেন নিরেট মূর্খ — কিছুতেই তাহার বুদ্ধি প্রবেশ

করিতে পারে না। উভয় স্থলেই তোমার ভুল হইতেছে। তোমার মনে রাখিতে হইবে সে প্রাপ্তবয়স্ক মানব নহে সে বালক মাত্র। ঈগলশাবকও একবার পাখা ভর করিয়া আকাশে উড়িতে চায় বটে কিন্তু আবার পরমুহূর্ত্তেই শূন্যমার্গ হইতে কুলায়ে পতিত হয়। কারণ সে যে শাবকমাত্র, উড্ডয়নক্ষম পূর্ণাঙ্গ পক্ষী নহে।

আপাত দৃষ্টিতে কোন বালক যত প্রতিভাশালীই হউক না কেন, তাহার প্রতি বালকোচিত ব্যবস্থাই প্রয়োগ করিবে। তাহার মানসিক শক্তি সমূহকে অতিমাত্রায় খাটাইয়া নিঃশেষিত করিয়া ফেলিও না। তাহার মস্তিষ্কের খুব চালনা আরম্ভ হইয়াছে দেখিলে তাহাকে আপন মনে থাকিতে দেও — আপনা আপনিই উহা স্থির হইয়া আসিবে — তুমি কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করিয়া উহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া ফেলিও না — কি জানি পাছে উহা নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মানসিক শক্তির প্রখরতাকে উদ্দীপন তুমি বাধা দিয়া রাখিতে না পারিতে পার কিন্তু তৎপরিবর্তে যথাসম্ভব উহাদিগের রক্ষা বিধান কর, যেন কালক্রমে উহারা জীবন সংগ্রামে সম্ভাবনা সম্পন্ন হইয়া কার্য্যে, উত্তম কাজে লাগিতে পারে। তাহা না করিলে ভবিষ্যতে উক্ত বালকের জন্য তোমার পরিশ্রম ও যত্ন বৃথা ব্যয়িত হইবে। ছেলেটি বুদ্ধির দোষে নিজের হাতের জিনিস নিজেই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। অত্যল্প বয়সে বালকের মানসিক শক্তির অতিরিক্ত চর্চ্চা করিতে দিয়া শেষে কাজের সময় দেখিবে প্রকৃত শক্তিগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে কতকগুলি অসার গাদ পড়িয়া আছে মাত্র।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা ছেলে বেলায় বোকা বোকা থাকে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহারাই রীতিমত বুদ্ধিমান্ হইয়া উঠে। কতকগুলি বালক প্রকৃত প্রস্তাবেই নির্ব্বোধ থাকে, আবার কেহ কেহ আপাততঃ নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু কালক্রমে কাজের

লোক হইয়া দাঁড়ায়। বাল্যকালের এই উভয়বিধ নির্ব্বুদ্ধিতার পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা কষ্টকর ব্যাপার। যে দ্বিবিধ চরিত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহাদের বাহ্য নিদর্শনে এত সাম্য কেন? প্রথমতঃ ইহা অতি বিস্ময় জনক বলিয়াই বোধ হয়। বাল্যাবস্থায় মানবের মনে প্রকৃতপক্ষে সত্য সত্য কোন ভাব বা চিন্তা থাকে না বলিলেই হয়। যাহারা প্রকৃতই নির্ব্বোধ তাহাদের মনে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা প্রবেশ লাভ করে, আর যাহারা ভবিষ্যতে প্রতিভাশালী হইবে তাহাদের মন, ঐ ধারণাগুলি ভ্রান্ত বলিয়া, উহাদের কোনটিকেই প্রবেশ করিতে দেয় না। এই উভয়বিধ মনই নিষ্কর্ম্মা বটে। তবে কথা এই যে প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বোধ বালক নিষ্কর্ম্মা হয় তাহার ক্ষমতার অভাব বশতঃ, আর ভাবী প্রতিভাবান্ বালক নিষ্কর্ম্মা হয় কোন কার্য্যই তাহার উপযুক্ত নয় বলিয়া। সময়ে সময়ে এক একটা আকস্মিক ঘটনায় শেষোক্ত শ্রেণীর নির্ব্বোধের বুদ্ধি হঠাৎ খুলিয়া যায়। আর প্রথমোক্ত শ্রেণীর নির্ব্বোধের অবস্থা বরাবর একরূপই থাকে। ঐরূপ ঘটনা না ঘটা পর্য্যন্ত উভয় জাতীয় নির্ব্বোধের মধ্যে পার্থক্য বাহির করা অসম্ভব হয়। প্রত্যুত বালক চরিত্র সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রমে পতিত হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনেক সময় বালকদিগের সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও অপরিপক্ক হইয়া থাকে।

স্মৃতি-শক্তি।

বালকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখ—তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অতি তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না। সাধারণ বালকগণ হইতে যাহাদিগের বিশেষত্ব আছে বলিয়া তোমার মনে হয় কতকটা সময় তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিবে না। প্রকৃতির হস্তে

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া রাখ — প্রকৃতিই তাহাদিগকে গড়িয়া তুলুক — তুমি তাড়াতাড়ি হস্তার্পণ করিতে যাইয়া প্রকৃতির কার্য্যে বাধা দিও না। তুমি হয়তো বলিবে, সময় অতি মূল্যবান্ — বালকের শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিলে যে অনেক সময় নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি কি জাননা যে সময়ের অপব্যবহার বৃথা সময়াতিপাত করা অপেক্ষাও অনিষ্টজনক — কুনিয়মে শিক্ষাদান করা অপেক্ষা একেবারে শিক্ষা না দিয়া রাখাও ভাল। বালককে কিছু না করিয়া বৃথা সময় কাটাইতে দেখিলে তুমি বিরক্ত হইয়া উঠ। প্রীতি প্রফুল্লতাটা কি তবে কিছু নয়? সারাদিন খেলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটিটা কি তবে কিছু নয়? বাল্যকালে খেলাধূলাতে বালকের যেমন তৎপরতা দেখিতে পাওয়া যায় জীবনে আর কোনও সময়ে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্লেটার রিপব্লিক, একখানা নীরস গ্রন্থ বলিয়াই লোকের ধারণা। উক্ত গ্রন্থে তিনি বালকদের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখ তিনি বলিয়াছেন — "উহাদিগকে খেলাধুলা, নাচগানও পূজাপার্ব্বণে যোগদান করিতে অভ্যস্ত কর। বালকেরা আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতে শিক্ষা করিতে পারিলে যথেষ্ট হইল।" আবার সেনেকা বলিয়াছেন "রোমে বালকগণ সর্ব্বদা দাড়ানের উপরই থাকিত বসিয়া শিখিতে হয় এমন কিছু তাহাদিগকে শিখান হইত না।" প্রাপ্ত-বয়স্ক হইলে ইহারা কি কোন অংশে কম উপযুক্ত হইত? অতএব বাল্যকালের এই আপাত প্রতীয়মান অলসতার জন্য শঙ্কিত হইও না। মনে কর কোন লোক নিদ্রায় বৃথা সময়াতিপাত হয় বলিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ করিল তাহাকে দেখিয়া তুমি খুব সম্ভবতঃ বলিয়া উঠিবে "লোকটা কি নির্ব্বোধ! জীবনে সুখ সম্ভোগ তো করিলই না। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে।" এই বিনিদ্র ব্যক্তির সহিত বাল্যকালের বেশ তুলনা চলে। জীবন রক্ষার জন্য

যেমন নিদ্রা প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তির হিতকল্পে বাল্যকালে মানসিক বিশ্রামের তেমন প্রয়োজন।

আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় বালকেরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক বিষয় শিখিয়া ফেলে। কিন্তু এই আপাত প্রতীয়মান ক্ষিপ্রকারিতাটাই বহু অনর্থের মূল। সত্বর কোন বিষয় অভ্যাস করিয়া ফেলে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে বিষয়টি সম্বন্ধে বালকের প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় নাই। মসৃণ সমতল দর্পণে আলোক রশ্মি-গুচ্ছ পতিত হইয়া একটা প্রতিবিম্ব গঠিত হয় বটে কিন্তু রশ্মিগুলির একটিও দর্পণাভ্যন্তরে থাকে না— সবগুলিই প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে চলিয়া আইসে। বালকের মস্তিষ্কও দর্পণ সদৃশ। কোনও বিষয় উহার নিকট উপস্থাপিত করিলে যে শব্দাবলী দ্বারা বিষয়টি প্রকাশিত হয় উহা কেবল সেই অসার শব্দাবলীই গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু উহাদের প্রতিপাদ্য ভাবগুলির একটিও তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করে না। সবগুলিই যেন প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে চলিয়া আইসে। বালকের মুখে সেই শব্দাবলী শুনিয়া অন্যে উহার অর্থ বুঝিতে পারে বটে কিন্তু বালক নিজে কিছুই বোঝে না।

স্মৃতি-শক্তি ও বিচার শক্তিতে মূলতঃ পার্থক্য আছে বটে কিন্তু বিচার শক্তির সাহায্য ব্যতীত স্মৃতি-শক্তির প্রকৃত বিকাশ হইতে পারে না। বিচার শক্তির আবির্ভাবের পূর্ব্বে বালক স্মৃতি-শক্তি বলে কোন ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। কেবল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে মাত্র। এইস্থলে জ্ঞানেন্দ্রিয়-গম্য বস্তুর শুধু আকারকেই আমরা প্রতিবিম্ব, বলিতেছি, আর বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে যে ধারণা তাহাকেই ভাব আখ্যা দিতেছি। স্মৃতিপটে শুধু একটী প্রতিবিম্বও থাকিতে পারে। কিন্তু ভাব কখনও একাকী অবস্থান করিতে পারে না। কল্পনা করিবার কালে কোন বস্তু আমাদিগের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় মাত্র। কিন্তু মনে কোন ভাবের স্থান দিতে হইলে একাধিক বস্তুর

সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। বস্তু-বোধের বেলায় মন কেবল জড়-আধারের ন্যায় থাকে। আর ভাবাববোধের বেলায় মনের তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে চলে না — ইতস্ততঃ যাতায়াত, পর্য্যবেক্ষণ ও তুলনা করিয়া বিচারকের মতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়।

সুতরাং মোটের উপর কথা এই যে বালকগণ যখন বিচার করিতে পারে না তখন তাহাদিগের যথার্থ স্মৃতি-শক্তি নাই বলিতে হইবে। তাহারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ মনে রাখিতে পারে বটে কিন্তু প্রায়ই ভাব মনে রাখিতে পারে না। আমার এই কথার বিরুদ্ধে হয়তো কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন — কেন? পারিবে না কেন? বালকেরা জ্যামিতি শিখিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের জ্যামিতি শিক্ষার রকমটা একবার আলোচনা করিলেই আমার কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। তাহাতে বুঝা যাইবে যে বালকেরা কেবল নিজেরা বিচার করিতে পারে না, তাহা নহে — অন্যের গঠিত যুক্তির শৃঙ্খলা ও বুঝিতে পারে না। তাহারা কেবল জ্যামিতিতে ক্ষেত্রের চিত্র ও প্রমাণের ভাষাই মনে রাখে। নূতন ধরণের সামান্য একটুকু আপত্তি উপস্থিত করিলেই তাহাদের মাথা ঘোলাইয়া যায়। ইন্দ্রিয়-বোধ বা বস্তু-বোধেই তাহাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞান পর্য্যবসিত হয়। বিচার-শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক বুঝিয়া কিছুই তাহারা নিজের করিয়া লইতে পারে না। তাহাদের যাহা মনে রাখিবার ক্ষমতাই থাকুক না কেন তাহাই যে সবিশেষ প্রবল তাহাও বলা যায় না। কারণ দেখা যায় বাল্যকালে যে সমুদয় বিষয়ের ভাষা মাত্র শিখে পরে সেই বিষয়গুলির তত্ত্ব শিখিবার কালে প্রায়ই নূতন করিয়া সবটাই শিখিতে হয়।

বালকেরা মোটেই যুক্তিতর্ক করিতে পারে না এইরূপ কিন্তু আমার মত নয়। যে যে বিষয় তাহারা বুঝিতে পারে, এবং যে যে বিষয়ের সহিত তাহাদের আসন্ন সুখ দুঃখের নিকট সম্পর্ক সেই সমুদয় বিষয়

অবলম্বনে তাহারা বেশ যুক্তি তর্ক করিতে পারে। আমাদের ভুল হয় কোন কোন বিষয় তাহাদের বোধগম্য তাহার নির্দ্ধারণ লইয়া। যে জ্ঞান তাহাদের নাই তাহাও আছে বলিয়া ধরিয়া লই — যাহা তাহারা বোঝে না সে বিষয় লইয়াও তাহারা যুক্তিতর্ক করিতে পারে বলিয়া মনে করি। ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল কি হইবে — বাল্যকালে কি ভাবে চলিলে বড় হইলে তাহারা সুখী হইতে পারিবে, তাহারা বড় হইলে লোকে তাহাদিগকে কেমন মনে করিবে — এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে বালকের মোটেই প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের আর এক গুরুতর ভুল যে আমরা বালকদিগকে ঐসব বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে বলি। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন বালকগণের নিকট এইরূপ বক্তৃতা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়া পড়ে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বালকদিগকে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বোক্তরূপ। বালকের মনের সঙ্গে তাহাদিগের মোটেই মিল নাই। এতদবস্থায় তাহারা এই সমুদয় বিষয়ে যে মোটেই মনোযোগ দিবে না তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শব্দ-শিক্ষা।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে কত কি শিখাইতেছেন বলিয়া গর্ব্ব করেন। আমার মতের বিরুদ্ধে তাহারা তর্ক করেন। কিন্তু তাহাদের কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, যে তাহাদের মত ও আমারই মতন। কারণ তাহারা ছাত্রগণকে কেবল কতকগুলি শব্দ ছাড়া আর কি শিক্ষা দেন? যে সমুদয় বিষয় প্রয়োজনীয় তাহার কয়টী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে? তত্ত্বজ্ঞাপক শিক্ষাই প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ শিক্ষকগণের নিজেদেরই সেই জ্ঞান অতি সামান্য। সুতরাং তাহারা তদ্বিষয়ে শিক্ষাও দেন না। শুধু কতকগুলি শব্দ জানিলেই যে সব বিষয়ের তত্ত্ব

অধিগত হইল বলিয়া মনে হয় কেবল তেমন কতকগুলি বিষয়ই শিখান হইয়া থাকে যথা ভূগোল, ইতিহাস ও কতিপয় ভাষা। মানুষের মঙ্গলের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক অতি কম। বিশেষতঃ এই বালককালেতো সব বিষয় মোটেই চিত্তাকর্ষক হয় না।

ভাষা শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য করিলাম মনে করিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন — কিন্তু মনে রাখিতে হইবে — বাল্যকালের পক্ষে কোন বিষয় প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় আমি কেবল তাহাই বলিতেছি। লোকে যাহাই বলুক না কেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস এই যে অসাধারণ প্রতিভাশালী না হইলে দ্বাদশ বা পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক একাধিক ভাষা শিখিতে পারে না।

শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দ এবং দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য আকার কেবল এই দুইটী শিখিলেই যদি ভাষা শিক্ষা হইয়া যাইত তবে বালকের পক্ষে একাধিক ভাষা শিক্ষা অসম্ভব হইত না। কিন্তু ভাষায় উহার বাহ্য চিহ্ন শব্দও আকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ভাষাবলম্বনেই মনের বিকাশ ঘটে। বিশেষ বিশেষ বাক্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। ভাষা মাত্রেই মনকে বিশেষ একটা আকার প্রদান করে এবং ইহাই সম্ভবতঃ আংশিকরূপে জাতীয় চরিত্র-গত বিশেষত্বের কার্য্য বা কারণ। দেখা যায় প্রত্যেক জাতির ভাষাই সেই জাতির নৈতিক নিয়মাবলীর অনুগমন করে এবং উক্ত নিয়মাবলী দ্বারাই ভাষা সংরক্ষিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে — এই ঘটনা হইতে পূর্ব্বোক্ত মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

বিভিন্ন ভাষা মনোভাব প্রকাশের বিবিধ বাহ্য চিহ্নমাত্র। ইহাদিগের মধ্যে বালক শুধু একটীতেই অভ্যস্ত হয় এবং বিচার-শক্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল সেই একটীই মনে রাখে। একাধিক ভাষা

শিখিতে হইলে তাহার ভাবে ভাবে তুলনা করিতে হয়। ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতাই যখন তাহার হয়না তখন সে কেমন করিয়া ঐ তুলনা করিয়া উঠিবে? প্রত্যেক বস্তু বুঝাইবার জন্য বালকের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য বাহ্য চিহ্ন থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাহার মাত্র এক একটী চিহ্নই সম্বল সুতরাং তাহার কেবল একটী ভাষা বলিতে পারিবারই কথা। তথাপি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলা হয় বালক বহু ভাষা শিখে কিন্তু আমি তাহা অস্বীকার করি। ৬।৭টী ভাষা জানে এমন ধুরন্ধর বালক৭ আমি দেখিয়াছি। তাহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে লাটিন, ফরাসী, ইটালিয়ান ভাষার বিশেষ বিশেষ বুলি বলিতে শুনিয়াছি। তাহারা ৫।৬ টা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা ব্যবহার করে বটে কিন্তু একমাত্র জার্ম্মান্ ভাষাই বলে। কথা এই—বালকগণকে যত ইচ্ছা তত প্রতি শব্দ শিখাইতে পার তাহাতে তুমি তাহাদের শব্দ-সম্ভারের পরিবর্ত্তন ঘটাও বটে কিন্তু তাহার ভাষাব পরিবর্ত্তন ঘটেনা তাহারা একাধিক ভাষা শিখে না।

বালকেব যে একাধিক ভাষা শিখিবার ক্ষমতা নাই সেইটা গোপন কবিবাব জন্যই যেন তাহাদিগকে লাটিন ও গ্রীক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ লাটিন বা গ্রীক প্রচলিত কথা ভাষা নহে। ঐ ভাষার ভুল ধরিতে পারে এমন লোক এখন অতি কম। ঐ ভাষায়তো আর এখন লোকে কথা বলেনা কাজেই জীবন্ত ভাষাটি যে কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠই এখন উক্ত ভাষা শিখিবার এক মাত্র উপায়। এখন পুস্তকের ভাষা শিখিয়াই আমরা মনে করি ভাষাটি শিখিয়াছি—পুস্তকের ভাষা মুখে বলিয়াই আমরা মনে করি ঐ ভাষাতেই কথা বার্ত্তা বলিতেছি। পুস্তকের ভাষা সামান্য কিছু শিখিয়াই জীবন্ত ভাষার অনেক বিষয় সেই ভাষায় অনুবাদ করি। আর অমনি আমরা মনে করি বেশ তো শিখিয়া

ফেলিয়াছি। ভুল ধরিবার যখন লোক নাই তখন যাহা বলি তাহাই ঠিক্। যে বিষয়েই হউক না কেন বস্তু বোধক শব্দগুলি যদি ছাত্রের মনে সেই সেই বস্তুর ধারণা জাগাইয়া দিতে না পারে তবে তাহাদের কোন মূল্য নাই। কতকগুলি চিহ্ন বিশেষ বিশেষ বস্তুর দ্যোতক; সেই সব বস্তু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেই না। মানচিত্রগুলি ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্যোতক চিহ্ন মাত্র। আমরা যে ভাবে শিক্ষা দেই তাহাতে বালকেরা মানচিত্রই শিখে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূপৃষ্ঠের জ্ঞান লাভ করে না। আমরা তাহাদিগকে কত নগর, দেশ ও নদীর নাম শিখাই। মানচিত্রেই তাহারা সেগুলি দেখে এবং বাহির করিতে পারে কিন্তু সেইগুলি যে প্রকৃত পক্ষে ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিত তাহা তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করে না। ভূগোলের কোন পাঠ্য পুস্তকের প্রথম পাতায় এই দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে "পৃথিবী কি? পেষ্ট বোর্ডের তৈয়ারি গোলক।" ইহাই বালকদিগের ভূগোল শিক্ষার রকম। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে দুই বৎসর গোলক লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া ভূগোল শিক্ষার পর, দশ বৎসর বয়স্ক কোনও বালকই প্যারি হইতে ভেনিসে যাইবার পথ বলিতে পারিবে না। কোন বালকই তাহার পিতার বাগানের নক্সা দেখিবার পর উক্ত বাগানের কোন ঘুরান সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নির্ভুল ভাবে যাইতে আসিতে পারিবে না। অথচ ইহারা পৃথিবীর কোথায় কোন দেশ আছে, কোন্ কোন্ বড় বড় নগর কোথায় অবস্থিত তাহা বলিতে পারিবে।

সময় সময় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে যে বিষয়ের শিক্ষাতে দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বালকদিগকে কেবল সেই সকল বিষয় শিখান উচিত। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এমন বিষয়তো খুঁজিয়া পাই না।

কতকগুলি ঘটনা একত্র করিলেই ইতিহাস হয়। সুতরাং ইতিহাস বিষয়টি বালকের দুর্ব্বোধ্য নহে — এই মনে করিয়া ছাত্রগণকে ইতিহাস পড়ানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ন্যায় হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তো অন্য নিরপেক্ষ নহে। কোন ঘটনাকেই উহার কার্য্য ও কারণাত্মক ঘটনা নিচয় হইতে বিচ্যুত করা যাইতে পারে না। আর কোন দেশের নৈতিক অবস্থা গুলি হইতেও সেই দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা গুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে এইরূপে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনাবলী বুঝিতে পারা কি বালকের পক্ষে সহজ? মানুষের কার্য্যাবলীর মধ্যে যদি কেবল বাহ্য এবং স্থূল স্থূল সাংসারিক ঘটনা গুলিই দেখা যায় তবে আর কি হইল? কেবল ঐরূপ ঘটনার সমাবেশকেই যদি ইতিহাস বলা যায় তবে আর ইতিহাসে শিখিবার কি থাকে? ইতিহাস তবে অন্তঃসার শূন্য ও নীরস হইয়া দাড়ায়। যদি নৈতিক ঘটনাবলীর সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানুষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় হয় তবে ইতিহাস বালকের পক্ষে কতদূর উপযোগী তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শব্দ শিখিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আর যে বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞাপক নহে তাহা বিদ্যাই নয়। সুতরাং বিদ্যার কোন বিভাগই বালকের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী নহে।

তাহাদের চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই সুতরাং প্রকৃত স্মরণ-শক্তিও নাই। কারণ যে মানসিক শক্তি চিন্তা শৃঙ্খলা ধারণে অক্ষম, কেবল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবাবলীই রাখিয়া দিতে পারে তাহাকে স্মরণশক্তিই বলা যাইতে পারে না। যাহা কোনও বস্তু বা বিষয়ের অববোধক হয় না এমন কতকগুলি চিহ্ন বালকের মনে অঙ্কিত করিয়া লাভ কি? ভবিষ্যতে যখন তাহারা বস্তু বা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবে

তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে কি উহার চিহ্ন বা নাম শিখিতে পারিবে না? তাহা হইলে তাহাদিগকে একই বিষয় দুইবার শিখিবার ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ প্রথম বারে শুধু শব্দ বা চিহ্ন শিক্ষাদানের একটি প্রধান দোষ আছে। উহাতে তাহাদের এই কুসংস্কার জন্মে যে যাহার অর্থ বুঝিতে পারে না এমন শব্দ শিখিলেও তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা হইল। যে মুহূর্ত্তে বালক শুধু একটি শব্দ জানিয়া তাহার অর্থ বোধ ব্যতিরেকেই তদ্বিষয়ের তত্ত্ব অধিগত হইল বলিয়া মনে করিল, যে মুহূর্ত্তে কোন ব্যক্তির আদেশানুসারে একটা কথার সত্যতা মানিয়া লইল কিন্তু ইহার যুক্তি কিছুই বুঝিল না তন্মুহূর্ত্তেই তাহার বিচার শক্তি ধ্বংস পাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে তাহারা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়াই সম্মান করিবে এবং তাহার নিজেরও বহুদিন পর্য্যন্ত ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকিবে।

কেহ কেহ হয়তো এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন—গুরুভাবে বালকের মস্তিষ্ক নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ উহা নানা জাতীয় ভাব গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ইতিহাসের সন তারিখ, রাজগণের নাম, বংশ-পত্রিকার নানাবিধ বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং ভূগোল ও গণিতের নানাবিধ কথা মনে রাখা বালকের পক্ষে কষ্টকর নহে। যে সমুদয় চিন্তা তাহার দুর্ব্বোধ্য নহে অথচ প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতে সুখজনক হইবে এবং কালে স্পষ্ট করিয়া তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারিবে সেই সমুদয় বিষয় বাল্যকালে মানস পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখাই তো ভাল। তাহা হইলে সারাজীবন ঠিক পথে চলিবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে।

সত্য বটে—এক হিসাবে বালকের স্মৃতিশক্তি প্রখর ও কর্ম্মক্ষম। কিন্তু পুস্তকের কথা ছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে যদ্দ্বারা সেই

স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা হইতে পারে। সে যাহা কিছু দেখে ও শোনে তাহাই মনে রাখে। লোকের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ তাহার মনে লিপিবদ্ধ করা থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকে যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে উহাই এক বিরাট গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ হইতেই অবিরত ও অজ্ঞাতসারে কত কি শিখিয়া তাহার মানস ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে -- যখন তাহার বিচার-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে তখন এইসব কাজে লাগিবে। তাহার স্মৃতি শক্তির যথাবিহিত চর্চ্চা করিতে হইলে বিষয় নির্ব্বাচনে আমাদিগের সাবধান হইতে হইবে। যে যে বিষয় তাহার জানা উচিত সেই সেই বিষয়েই সর্ব্বদা তাহার স্মৃতিশক্তি নিযুক্ত রাখিতে হইবে, আর যাহা জানা উচিত নহে সেইগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করিলেই তাহার মন এরূপ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হইবে যে তাহা ভবিষ্যতে বিদ্যোপার্জ্জনের পক্ষে এবং সারাজীবন ঠিক পথে চলিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। এই প্রণালীতে শিক্ষা পাইলে বালকগণ বিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিবে না সত্য তাহাদের শিক্ষকগণকে প্রশংসা করিতে পারিবে না সত্য কিন্তু তাহাদের দেহ ও মন সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং বাল্যকালে প্রশংসা লাভ না করিতে পারিলেও প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া লোকের সম্মানভাজন হইতে পারিবে।

অমলকে কিছুই মুখস্থ করিতে দিব না — সরল চিত্তাকর্ষক উপকথাও নয়। কারণ প্রকৃত ইতিহাস যেমন কেবল কতকগুলি শব্দ নহে, প্রকৃত উপকথাও কেবল কতকগুলি শব্দের সংগ্রহ মাত্র নহে আমরা বলি উপকথা হইতে বালকেরা উপদেশ লাভ করিয়া থাকে এটা একটা বড় ভুল। উপকথাগুলি যেমন ছেলেদের আমোদ উৎপন্ন করে তেমনি তাহাদের বুদ্ধিকে বিপথেও চালিত করে — এই কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই। তাহারা উপকথার আখ্যান ভাগ দ্বারা চালিত হইয়া অন্তর্নিহিত সত্যটুকু দেখিতে পায় না। সুতরাং যাহা থাকাতে উপকথা প্রীতিকর

হয় তাহাই উহার ফল-প্রসূতা খর্ব্ব করে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা উপকথা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু বালকদিগকে উপদেশ দিতে হইলে অবিকৃত অরঞ্জিত সত্যই বলিতে হইবে। সত্য গল্পের আবরণে ঢাকা থাকিলে তাহারা ঐ সত্য লাভের জন্য উহা উদ্ঘাটন করিতে যাইবে না।

যে কার্য্য করিলে প্রকৃতপক্ষে কোন সুবিধা হইবে বলিয়া বালক বুঝিতে পারে না এবং কার্য্যটি করিবার অব্যবহিত পরেই তাহার ফলভোগের সম্ভাবনা দেখে না সে কার্য্য বালক করিতে চায় না। তেমন কার্য্য করিবার জন্য বালককে বাধ্য করাও উচিত নয় কারণ তাহাতে তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। অল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে লেখাপড়া শিক্ষা করাটা সেই শ্রেণীর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই এইরূপ হইয়া থাকে। কারণ অনুপস্থিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বলা এবং অন্যের সাহায্য ব্যতীত দূরবর্ত্তী ব্যক্তির নিকট নিজের মনোভাব, উদ্দেশ্য ও অভিলাষ জ্ঞাপন করা যে প্রয়োজনীয় ও আমোদজনক তাহা সকল বয়সের বালকেরাই বুঝিতে পারে। এবং লেখাপড়া জানিলেই উহা সাধন করা যাইতে পারে। সুতরাং লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বালক মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইবার কথা। অথচ শিক্ষা প্রণালীর দোষে এমন প্রীতিকর বিষয়ও বালকের পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে! তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে জোর করিয়া লেখাপড়া শিখান হয়। তাই লেখাপড়াতে ভবিষ্যতেও তাহার অনুরাগ জন্মে না। যাহা যাহা শিখাইবার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে তাহার উন্নতি বিধানে বালকের মতি হইবে কেন? তাহাদের আশু উপকারিতা দেখাইয়া বিষয়টি তাহাদের নিকট প্রীতিকর কর দেখি। দেখিবে তখন তাহাদিগকে লেখাপড়া না শিখাইয়া রাখিতেই পারিবে না।

বালকগণকে পড়িতে শিখাইবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবনে নানা লোক ব্যস্ত। এতদুদ্দেশ্যে কত ফলক ও ছাপাখানা উদ্ভাবিত হইয়াছে। লক্ উহার জন্য এক প্রকার পাশার উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল — বালকের হৃদয়ে পড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। একবার সেই আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিতে পারিলে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর প্রয়োজন হইবে না — যে কোন প্রণালীতেই চলিবে। বর্ত্তমানকালে আদৃত বিবিধ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আমার পদ্ধতিতে চল, দেখিবে বালককে আর সাতসমুদ্র তের নদী পার হইতে হইবে না — বালক নিজের সহিত নিকট সম্পর্কিত বিষয় নিচয় অবলম্বন করিয়া নানা বিষয় শিখিয়া উঠিবে। দেখিবে ইহাতে বালকের ইন্দ্রিয়-বোধ, বস্তুজ্ঞান, স্মৃতিশক্তি এবং এমনকি বিচারশক্তিরও চর্চ্চা হইবে। ইহাই প্রকৃতির অনুমোদিত প্রণালী। জীবগণ যতই কর্ম্মশীল হয় ততই তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও উন্নত হয়। এবং কর্ম্ম করিতে করিতে শারীরিক বলের যে বৃদ্ধি হয় উপচীয়মান বুদ্ধিবৃত্তি তদবলম্বনে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে উক্ত বলের প্রয়োগ করে। সুতরাং ছাত্রের বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি করিতে চাহিলে তাহার শারীরিক বলের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। তাহাকে সর্ব্বদা ব্যায়াম করাও, তাহার দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়া তোল — এতদ্দ্বারাই তাহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক করিয়া তুলিতে পারিবে। সে সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকুক, দৌড়ান, লাফান এবং চীৎকারের উপর থাকুক — সর্ব্বদাই শারীরিক বলজনক কার্য্য করুক — তাহা হইলেই তাহার বুদ্ধি বৃত্তি ও বলশালী হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বোক্ত কথার উপর কেহ কেহ এই আপত্তি করিতে পারেন "ছাত্রকে সর্ব্বদা পদে পদে চলিতে বা দৌড়াইতে বলা, ইহা করিতে বলা, উহা করিতে নিষেধ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ সেইরূপে চলিলে

সে ইতর-জন্তু-বৎ হইয়া পড়িবে — তাহার বুদ্ধি-বৃত্তির মোটেই চালনা হইবে না।” কিন্তু তাহার বুদ্ধি-বৃত্তির একেবারে চালনা হইতে না দেওয়া আমার মোটেই উদ্দেশ্য নহে। তবে আমি এই কথাটিই বুঝাইতে চাই যে শারীরিক ব্যায়াম করিলে মানসিক বিকাশের অনিষ্ট হয় এই ধারণাটি ভ্রমাত্মক। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম এক সঙ্গেই চালান উচিত এবং উহারা পরস্পর পরস্পরকে সংযত করে ইহাই প্রার্থনীয়।

আমার ছাত্র (স্বয়ং প্রকৃতির হস্তে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র বলিলেই বরং ভাল হয়) প্রথম হইতেই যথাসম্ভব নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলে, উপদেশের জন্য সর্ব্বদা অন্যের নিকট দৌড়ায় না। নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা তাহার আদৌ নাই। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে যে নিজেই পর্য্যবেক্ষণ, চিন্তা ও যুক্তি করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং তদনুসারে কার্য্য করে কিন্তু সে বেশী কথা বলে না। বাহিরের সংসারের খবর সে বেশী কিছু রাখে না বটে কিন্তু তাহার নিজের কি কি কর্ত্তব্য এবং কিরূপে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে তাহা সে বেশ জানে। সর্ব্বদা চলা ফেরার উপর থাকে বলিয়া সে নানা বিষয় এবং নানা কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারে। সুতরাং অল্প বয়সেই তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং সে মানব দত্ত শিক্ষার পরিবর্ত্তে প্রকৃতির হস্ত হইতেই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। বাহির হইতে জোর করিয়া কেহ তাহাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করিতেছেনা দেখিয়া যে নিজকে মুক্তবোধ করে এবং আপনা আপনি যে শিক্ষালাভ করে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং যুগপৎ তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হইতে থাকে। একদিকে যেমন তাহার দেহ পুষ্ট ও বলবান হইতে থাকে অপর দিকে তেমনই সে বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইয়া উঠে।

শারীরিক বল এবং মানসিক বলের সমবায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু সংসারে যাহারা মহৎ আখ্যা লাভ করেন তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে উক্ত সমবায় দৃষ্ট হয়। একাধারেই পণ্ডিতের মত প্রগাঢ় জ্ঞান এবং মল্লের মত প্রচুর বল। আমার ছাত্রও কালক্রমে এই উভয়বিধ বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে।

হে নব্য শিক্ষক, আমি তোমাকে যে শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে বলিতেছি তাহা কঠিন বটে। আমার প্রণালী অনুসরণ করিলে ছাত্রকে শাসন করিতে হইবে অথচ কোন নিয়মের অধীন করিতে হইবে না — সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার জন্য কিছুই করিতে হইবে না অথচ প্রকারান্তরে সবই করিতে হইবে। তোমার বয়স অল্প সুতরাং তুমি ইহা অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা করিতে পার না। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে তুমি প্রথমেই, তোমার প্রতিভা প্রদর্শনের এবং ছাত্রের জনকজননীর চক্ষে উচ্চস্থান লাভের সুবিধা পাইবে না বটে। কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন পদ্ধতিই পরিণামে সুফল-প্রসূ হইবে না। তোমার ছাত্র বড় হইয়া জ্ঞানী ও বিবেচক হইয়া উঠুক এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে ছেলেবেলায় তাহাকে একটুকু চঞ্চল ও একটুকু উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিতেই হইবে। স্পার্টাবাসিগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে এই প্রণালীতেই শিক্ষা দিত। ছেলেবেলা হইতে তাহাদিগের ঘাড়ে পুস্তকের বোঝা চাপান হইত না, তাহাদিগকে বরং চুরি করিয়া আপন আপন আহার সংগ্রহ করিতে বাধ্য করা হইত। ইহাতে কি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম প্রখর হইত? তাহাদের কথাবার্ত্তা কেমন ভাবপূর্ণ, ওজস্বী অথচ সংক্ষিপ্ত ছিল। তাহারা যে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু জয় করিতে পারিত তাহা নহে — অন্যান্য বিষয়েও বিজিত জাতির উপর জয়লাভ করিত। বহুভাষী আথিনিয়ানগণ তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের ভয়ে যেমন কম্পিত হইত তাহাদিগের ক্ষুরধার বাগিন্দ্রিয়কে সেইরূপ ভয় করিত।

কঠোর-শাসন-পন্থী শিক্ষক ছাত্রকে সর্ব্বদা আদেশ করেন। তিনি মনে করেন — আদেশ পালন করাইয়া ছাত্রকে সুশাসনে রাখিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঘটে না। শিক্ষকের আদেশ পালনের আবরণের অন্তরালে ছাত্র আপনার অনেক গুপ্ত অভিলাষ চরিতার্থ করিয়া লয়। শিক্ষকের কঠোর আদেশানুসারে একঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া পরবর্ত্তী এক সপ্তাহকাল আপন মনে আমোদ প্রমোদ কাটাইবার সুবিধা করিয়া লয়। পদে পদে শিক্ষককে তাহার সহিত নূতন নূতন চুক্তি করিতে হয়। কঠোর শাসক এই চুক্তি করিবার বেলায় সময় সময় এত অসাবধান হন যে চুক্তির সর্ত্ত গুলি রক্ষাই করুক আর ভঙ্গই করুক তাহাতে ছাত্রের বেশী কিছু আসে যায় না। যেস্থলে ছাত্র চুক্তি পালন করে সেই স্থলেও উহা ঠিক শিক্ষকের অভিপ্রায়ানুরূপে পালিত হয় না। সাধারণতঃ, ছাত্র যতটা শিক্ষকের মনের ভাব বুঝিতে পারে শিক্ষক ছাত্রের মনোভাব ততটা বুঝিতে পারেন না। আর ইহা স্বাভাবিকই বটে। স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলে ছাত্র আত্ম-রক্ষার জন্য যে বুদ্ধি প্রয়োগ করিত এইস্থলে শিক্ষকের কঠোর শাসন এড়াইবার জন্য তাহারই ব্যবহার করে। আর শিক্ষক ও ছাত্রের মনের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য চেষ্টা করেন না সুতরাং তাহার আত্মম্ভরিতা ও অলসতার একটুকুও প্রশমন ঘটে না।

একঘেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা বলিতেছি ছাত্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর; তাহাকে মনে করিতে দেও সে যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। অথচ তাহার অলক্ষ্যে তুমিই তাহার উপর প্রভুত্ব কর। আপাততঃ স্বাধীনতার আবরণ দিয়া কাহারও উপর তাহার অজ্ঞাতসারে যে ক্ষমতা চালনা করা যায় তদ্দ্বারাই সে পূর্ণমাত্রায় অধীন হইয়া পড়ে। কারণ এতদ্দ্বারা কেবল তাহার কার্য্য কেন কার্য্যের মূল ইচ্ছা পর্য্যন্ত অন্যের বশ্যতাপন্ন

হইয়া পড়ে। অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বালক সর্ব্বথা তোমার উপর নির্ভরশীল নহে কি? তাহার সুখ দুঃখ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিয়ন্ত্রিত করিতে তোমার ক্ষমতা নাই কি? তবে জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক তাহার কার্য্য, তাহার খেলা, তাহার সুখ, তাহার দুঃখ সকলই তোমার করায়ত্ত নহে কি?

তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তাহাকে করিতে দিতে হইবে বটে; কিন্তু তোমার ইচ্ছা তাহার ইচ্ছাকে কাটিয়া ছাটিয়া গড়িয়া তুলিবে।

তুমি তাহার অলক্ষ্যে তাহাকে যে দিকে নিতে চাও সে যেন তাহা ছাড়া একপদও অগ্রসর হইতে না পারে। তুমি যেন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পার সে কোন কথাটি বলিতে যাইতেছে।

এই নিয়মে চলিলে সে শারীরিক ব্যায়ামে রত থাকিতে পারিবে অথচ তাহাতে অণুমাত্রও মানসিক অবনতির আশঙ্কা থাকিবে না। এক্ষণ অসহনীয় অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য উপায় উদ্ভাবনার্থে বুদ্ধিবৃত্তির অবিরত চালনা করিয়া উহা প্রখর করিয়া তোলে। কিন্তু আমার প্রণালী অনুসারে চলিলে ছাত্রের সেদিকে মতি যাইবে না, সে তখন তাহার পারিবারিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার পক্ষে যাহা হিতকর তাহাই বাহির করিতে সচেষ্ট থাকিবে। তাহার আত্মজ্ঞানের গণ্ডির ভিতর যাহা যাহা পড়ে সবগুলি নিজস্ব করিয়া লইয়া তৎসাহায্যে যে প্রত্যেক বিষয় উপভোগ করিবে, তাহাতে অন্যের মত জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেরূপ দক্ষতার সহিত সে এই কার্য্য করিবে তাহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

তাহাকে এইরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে দিলে তাহার একগুঁয়েমী —প্রশ্রয় পাইবার অবসর থাকিবে না। যাহা তাহার উপযোগী নহে এমন কাজ সে কখনও করেনা। কাজেই অচিরে তাহার এমন অভ্যাস গঠিত হইবে যে যাহা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য সে কেবল তাহাই করিবে। সে

সর্ব্বদা অঙ্গ চালনায় ব্যাপৃত থাকিবে সত্য কিন্তু তাহার পক্ষে সেই বয়সে যে যে বিষয় প্রীতিকর বলিয়া সে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে সেই সেই বিষয়ের দিকে তাহার মতি যাইবে। সুতরাং উহা নির্দ্ধারণের জন্য বিচার শক্তির যতটুকু উন্মেষ হইয়া থাকুক না কেন ঐ সমুদয়ের আলোচনায় তাহার পূর্ণমাত্রায় চর্চ্চা হইবার সুবিধা হইবে। শুধু গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিচার শক্তির যে বিকাশ হইতে পারিত এতদ্দ্বারা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রূপে ও অধিকতর স্বাভাবিক ভাবে সেই বিকাশ হইতে পারিবে।

সে দেখিবে তুমি তাহাকে বাধা দেও না অথবা অবিশ্বাস কর না সুতরাং সে তোমার নিকট গোপন কিছুই করিতে চাহিবে না। সে তোমাকে প্রতারিত করিবে না অথবা তোমার নিকট মিথ্যা কথা বলিবে না। সে নির্ভীকভাবে তাহার আপন মনে চলিবে এবং তাহা হইতে তুমি অনায়াসে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। অতএব তুমি তাহার চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া উপযুক্ত পাঠাবলী উদ্ভাবন করিতে পারিলে আর সে অজ্ঞাতসারে সেই সেই পাঠ গ্রহণ করিবে।

সন্দিগ্ধতাপূর্ণ কৌতূহলের সহিত সে তোমার গোপনীয় খবর জানিবার প্রয়াস পাইবে না এবং তোমার দোষ দেখিলে আনন্দিত হইবে না। ছাত্র ছিদ্রান্বেষী হইলে শিক্ষকের পক্ষে বড় অসুবিধার কথা। শাসকের দোষ বা ত্রুটি আবিষ্কার করা ছাত্রের এক প্রধান কার্য্য। এই অসদিচ্ছা হইতে ছাত্রের দুশ্চরিত্রতা জন্মিতে পারে। কিন্তু দুশ্চরিত্রতা এই ইচ্ছার কারণ নহে — দুঃসহ অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। অধীনতার যে বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে উহা ঝাঁকিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য বালকগণের সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং শিক্ষকের দোষ দেখিলে উক্ত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার বেশ সুবিধা হয়। কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে অন্যের দোষ বাহির করিবার অভ্যাস হয় এবং তাহাতে অনুরাগ জন্মে।

অমলের চরিত্রের এই দোষ মোটেই নাই। আমার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাহার লাভ নাই। সুতরাং সে আমার ছিদ্রান্বেষণ করেনা কাজেই অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিতেও তাহার লোভ হয় না।

আমি যে প্রণালীর কথা বলিলাম তাহা আপাততঃ কঠিন বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে তেমন বোধ হইবে না। হে শিক্ষকগণ, আপনারা শিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, অতএব শিক্ষকতা কার্য্যটার প্রকৃতি মোটামোটি জানেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। আরও ধরিয়া লইতে চাই যে প্রকৃতির নিয়মে মানব মনের যে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহা আপনারা জানেন — সাধারণ ভাবে মানব জাতির চরিত্র এবং ব্যক্তিগত চরিত্র অধ্যয়ন করা ব্যাপারটা কি আপনারা কতকটা জানেন। আর আপনাদের ছাত্রের নিকট প্রীতিকর বিষয় সমূহের মধ্যে যে যে বিষয় তাহাদিগের নিকট উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাদিগের কোন কোনটি ছাত্রের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহাও আপনারা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন।

প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ যদি আপনাদের থাকে এবং উহাদের ব্যবহারও যদি জানেন তবে আর কার্য্য করিতে ভয় কি?

আপনারা আপত্তি করিয়া থাকেন যে বালকগণ বড় একগুঁয়ে। কিন্তু উহা আপনাদের ভুল। এই গুঁয়েমী স্বভাবজাত নহে — উহা শিক্ষার দোষেই উৎপন্ন হয়। ছেলেরা অভ্যস্ত হয় — প্রভুত্ব না হয় দাসত্ব করিতে। আমি অনেকবার বলিয়াছি এতদুভয়ের কোনটিরই প্রয়োজন নাই। সুতরাং আপনাদের ছাত্রগণের যদি এক-গুঁয়েমী থাকিয়া থাকে তবে তাহা আপনারাই দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আপনারাই দায়ী। কিরূপে উহা দূর করিতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করেন কি? ধৈর্য্য ও সুপ্রণালীর সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইলে এখনও তাহা করা না যাইতে পারে তাহা নহে।

শারীরিক শিক্ষা।

মানব শৈশবকালে আপনা আপনিই নানাপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া থাকে — তাহার উদ্দেশ্য কি? চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুনিচয়ের সহিত নিজের তুলনা করা উহার এক উদ্দেশ্য এবং সেই সেই বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন্ কোন্ গুণ তাহার নিজের উপর ক্রিয়া করিতে পারে তাহা বাহির করা অন্য উদ্দেশ্য। অতএব তাহার আত্ম-রক্ষার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত জড়বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কতিপয় নিয়ম পরীক্ষার সাহায্যে তাহাকে শিক্ষা দেওয়াই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা তাহা করি কোথায়? এই জড়জগতের সহিত তাহার স্থূল স্থূল সম্পর্ক কি তাহা একটুকু বুঝিতে না পারিতেই আমরা তাহাকে পুস্তকগত শিক্ষার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাই। বাল্যকালে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নমনীয় ও সজাগ থাকে। বিবিধ জড়পদার্থ নাড়াচাড়া করাই হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্য। বাল্যকালে উহারা নমনীয় ও লঘু থাকে। সুতরাং উহারা ব্যবহার্য্য বিবিধ বস্তুর সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারে। ইন্দ্রিয় বোধগুলিও বাল্যকালে অবিমিশ্র থাকে এবং ভ্রান্তজ্ঞানের সহিত মিশিয়া বিকৃত হইয়া যায় না। সুতরাং শৈশবই হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের চর্চ্চার কাল এবং বাহ্যবস্তু নিচয়ের সহিত নিজেদের যে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবিধ সম্পর্ক আছে তাহা শিখিবার কাল। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। সুতরাং মানুষের জীবনে সর্ব্বপ্রথমে বিচারশক্তির ক্রিয়া হয় — ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান লইয়া। অনুমান উপমান প্রভৃতি বুদ্ধির বিবিধ ব্যাপার ঘটিত বিচার আসে তাহার পরে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত বিচারই বুদ্ধিগত বিচারের ভিত্তিভূমি। হস্ত, পদ ও চক্ষুই আমাদিগের যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদিম অধ্যাপক। অতএব গ্রন্থকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আসনে বসাইয়া দিলে বালকের কোনও জ্ঞান জন্মিবে না,

বালক নিজে বিচার করিতে শিখিতে পারিবে না — শিখিবে কেবল পরের অর্জ্জিত জ্ঞান মানিয়া লইতে এবং পরের বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিতে।

কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্য করিতে হইলে প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রের সংগ্রহ করিতে হয়। আর দেখিতে হয় যন্ত্রগুলি যেন নিরেট ও দৃঢ় হয়, তাহা হইলে আর ব্যবহার করিতে করিতে উহাদের ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষুঃকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্র — ইহারাও বুদ্ধির হাতের যন্ত্রস্বরূপ। চিন্তা, বিচার প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির কোন কার্য্য করিতে হইলে ইহাদিগের ব্যবহার করিতে হয়। ইহারা দেহেরই ভিন্ন ভিন্ন অংশ। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে দেহ-যন্ত্রটি সুস্থ, সবল ও পুষ্ট হওয়া আবশ্যক। অতএব আমাদের বিচারশক্তি শরীর-নিরপেক্ষ তো নহেই। বরং দেহ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ হইলে, মানসিক ক্রিয়া সমূহ সহজে ও যথাযথরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। লেখাপড়ার চাপ ঘাড়ে না চাপাইয়া কতদিন পর্য্যন্ত বালকগণকে আমোদ, প্রমোদ ও বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে দেওয়া যাইতে পারে — ইহাই আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু আমি ইহার মধ্যে তাহাদিগের মানসিক শিক্ষার কথা পাড়িয়া হাস্যাস্পদ হইলাম। কেহ কেহ হয়তো বলিবেন "বেশ্‌তো ; আপনি নিজেই, যাহা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই তাহা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। তবে এক্ষণে আপনি যে যে শিক্ষার কথা বলিতেছেন এইগুলিতো বালকেরা যত্ন চেষ্টা ব্যতীত কালক্রমে আপনিই শিখিতে পারিবে। আপনি আপনার ছাত্রকে যাহা শিখাইতে চা'ন্ বার বছর বয়সের কোন্ ছেলে তাহা না জানে? তাহাদের শিক্ষকগণ তাহাদিগকে আরও অনেক বিষয় শিখাইয়া দেন।"

ভদ্র মহোদয়গণ, ভুল আপনাদেরই। আমি আমার ছাত্রকে শিখাইতেছি যে অবস্থাবিশেষে কোন কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে তাহাতে অপমান নাই — বরং অজ্ঞ থাকাই ভাল। আপনার ছাত্রগণের এই শিক্ষালাভ হয় নাই। স্থলবিশেষে এইরূপ অজ্ঞ থাকাটা সহজ ব্যাপার নহে। ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে — যে ব্যক্তি নিজে যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জানে না তাহাও জানিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করে তাহার জ্ঞান-লাভ অত্যল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। আপনারা বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন — তাহা বেশ। আর আমি যে উপাদান ও উপকরণের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হইতে পারে — তাহাই শিক্ষা দিতেছি। প্রাচীনকালের লোকদিগের শারীরিক বল ও মানসিক ওজস্বিতা বর্ত্তমান যুগের মানবগণ হইতে অনেক বেশী ছিল। যাহারা প্রাচীন কালের জীবনযাপন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা বলেন — শারীরিক ব্যায়ামই এই পার্থক্যের কারণ। মণ্টেইন এই মত সমর্থন করিয়াছেন— তাহাতেই বুঝা যায় যে তিনি সম্পূর্ণরূপে এই মতটি গ্রহণ করিয়াছিলেন — তিনি নানা স্থানে নানা ভাবে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। বালকের শিক্ষাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "তাহার মাংসপেশীর দৃঢ়ীকরণ দ্বারাই মনের দৃঢ়ীকরণ সম্পাদিত হইবে। পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করাইয়া তাহাকে কষ্টসহিষ্ণু কর। হাত পা ভাঙ্গিলে, শূলবেদনা এবং আর আর অনেক ব্যারাম হইলে নিদারুণ যন্ত্রণা হয়। ভবিষ্যতে এই সব যন্ত্রণায় দমিয়া না পড়ে এতদভিপ্রায়ে কঠিন কঠিন ব্যায়াম করাইয়া তাহাকে সেইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে অভ্যস্ত কর। লক্ প্রভৃতি মনীষিগণের অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট মত-দ্বৈধ আছে বটে কিন্তু বালকদিগকে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক ব্যায়াম করিতে দিতে হইবে — এই বিষয়ে সকলেরই একমত। তাহারা যত কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাই শীর্ষস্থানীয় অথচ অন্যান্য উপদেশ অপেক্ষা ইহারই অবহেলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইতেছে।

পরিধান।

বালকদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিন দিন বাড়িয়া উঠে। যেন তাহারা অবাধে সেই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে। তাহাদিগের পরিচ্ছদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে। কিছুই যেন উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির বা সঞ্চালনের অন্তরায় হইতে না পাবে। কোন পরিচ্ছদই যেন তাহাদিগের গায়ে আটা সাটা না হয়। কোন পরিচ্ছদই আটিয়া সাটিয়া রাখিবার জন্য যেন বন্ধন-রজ্জু ব্যবহৃত না হয়। বর্ত্তমান যুগের ফরাসী পোষাক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহকেই অত্যধিকরূপে আটিয়া সাটিয়া রাখে — আর বালকগণের পক্ষে উক্ত দেশীয় পোষাকতো আরও অনিষ্টকর। ইহাতে রক্ত সঞ্চালন এবং দেহাভ্যন্তরে অন্যান তরল পদার্থের যাতায়াতের বাধা হয়। আটা পোষাক পড়িয়া নড়িতে চড়িতে অসুবিধা হয় বলিয়া বালকবালিকারা কেবল বসিয়া থাকে। তাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতা হেতু দেহে একটা অস্বস্তি বোধ হয়। রক্ত ও রস সঞ্চালনে বাধা পড়াতে নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও জন্মিয়া থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপ আটা পোষাকের প্রচলন ছিল না। জীবন যাপন প্রণালীও অন্য রকমের ছিল। তাই সেইকালে এইসব ব্যারাম কদাচিৎ হইত। যতদিন সম্ভব বালক বালিকাদিগকে ঢোলা পোষাক পরাইয়া রাখিবে। তারপর তাহাদিগকে যে পোষাক পরিতে দিবে — তাহাও যেন আটা না হয়। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে আটা পোষাক পরাইবে না। উহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুগঠন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইয়া থাকে। বালক বালিকাগণের প্রায় সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক ত্রুটির একই কারণ — বড় না হইতেই আমরা তাহাদিগকে জোর করিয়া বড় করিতে চাই।

অনুজ্জ্বল অপেক্ষা উজ্জ্বল বর্ণই শিশুগণের অধিকতর প্রীতিকর। আর উজ্জ্বল রঙ্গের পোষাকই তাহাদের গায়ে মানায় ভাল। সুতরাং

এই বিষয়ে তাহাদের রুচির অনুবর্ত্তন করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যখনই দেখা যায় কোনও পোষাক খুব মূল্যবান্ বলিয়াই বালক তাহা পছন্দ করিতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা প্রভৃতি দোষ তাহার চরিত্র কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বালকগণের মনে আপনা আপনি এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। বালক পোষাক বিশেষ পছন্দ করিয়া থাকে। কোন না কোন অভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ পছন্দ করে। উহাদের সহিত বালকের শিক্ষার সম্পর্ক সামান্য নহে। বুদ্ধিহীনা জননীগণই কেবল সন্তানদিগকে পুরস্কার স্বরূপ সুন্দর পোষাক দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এমন নহে। অদূরদর্শী শিক্ষকগণও শাস্তিস্বরূপ ছাত্রকে সাদাসিদে ও মোটা কাপড়ের পোষাক দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখান। তাহারা ছাত্রকে বলেন "যদি পড়াশোনা না কর, যদি পোষাকের জন্য যত্ন না নেও, তবে তোমাকে চাষার মত পোষাক দেওয়া হইবে।" তবেই ছাত্রকে প্রকারান্তরে বলা হইল "নিশ্চিত জানিও, পোষাকই মানুষকে বড়, ছোট করিয়া থাকে। তুমি কিরূপ পোষাক পর তাহা দ্বারা তোমার যোগ্যতা নির্ণীত হইবে!" বাল্যকালে যাহাদের ভাগ্যে এমন জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ লাভ ঘটে তাহারা যৌবনাবস্থায় যে চাকচিক্য ছাড়া আর কিছুই গ্রাহ্য করিবে না, বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই অন্যলোকের বা বস্তুর সারবত্তা সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসিবে — তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শিশুদিগকে গরম কাপড়ের পোষাক দেওয়ার দিকে অত্যধিক ঝোঁক দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের উষ্ণতা অপেক্ষা শৈত্যেই অধিকতর অভ্যস্ত হওয়া উচিত। শিশুকালে খুব শীত সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইলে বড় হইলে শীতে তাহাদের বেশী কষ্ট লাগিবে না। কিন্তু শিশুকালে চর্ম্ম অতি কোমল থাকে বলিয়া অবাধে অত্যধিক ঘর্ম্মোদগম

হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং বেশী গরমে থাকিলে শিশুগণ খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই দেখা যায়, অন্যান্য মাস অপেক্ষা আগষ্ট মাসেই শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বোচ্চ সীমায় উঠে। তারপর, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী জাতিগণের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় উষ্ণতাধিক্য অপেক্ষা শৈত্যাধিক্যই মানবগণের বলিষ্ঠতা সম্পাদনে অধিকতর কার্য্যকরী। শিশুর বয়স যতই বাড়িতে থাকে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দৃঢ়তর হইতে থাকে ততই তাহাকে ক্রমশঃ অধিকতর উষ্ণতা সহিতে অভ্যস্ত করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাকে গ্রীষ্ম-মণ্ডল-সুলভ উষ্ণতা সহ্য করিতে অভ্যস্ত করিতেও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

নিদ্রা।

শিশুগণ প্রচুর পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদিগের অধিক পরিমাণে নিদ্রা যাওয়ার দরকার। নিদ্রা ও ব্যায়াম পরস্পরের দোষ দূর করে বলিয়া উভয়েই প্রয়োজনীয়। রাত্রিই বিশ্রাম লাভের উপযুক্ত সময় — আর প্রকৃতি ও আমাদিগকে তাহাই বলিয়া দেন। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে দিনের বেলা অপেক্ষা সূর্য্যাস্তের পরই অধিকতর প্রগাঢ় ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রা হইয়া থাকে। দিবাভাগের বায়ু উত্তপ্ত বলিয়া ক্লান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে শান্তি দিতে পারে না। সেইজন্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শয়ন স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মমণ্ডলান্তর্গত দেশের জলবায়ুতে মানুষের এবং জন্তু মাত্রেরই গ্রীষ্মকালেই অধিকতর নিদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের জীবন যাপন প্রণালী এত সরল, স্বাভাবিক এবং বৈষম্য বিহীন নহে যে আমাদের উক্ত প্রয়োজনানুযায়ী স্থির নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস গঠন করা চলে। আমাদিগের অবশ্য কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া চলা উচিত কিন্তু ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় যে আবশ্যক

হইলে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিলে যেন কোন অনিষ্ট না হয়। অতএব তোমার ছাত্রের শান্তিময় সুষুপ্তির কখনও একটুকুও বাধা দিবেনা। এইরূপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। উহাতে ছাত্রের শরীর কোমল প্রকৃতি হইয়া পড়ে। প্রথমাবস্থায় তাহাকে অবাধে প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে দেও। কিন্তু মনে রাখিও যে প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে আমাদিগকে অনেক সময় উক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। আমাদিগের এইরূপ হওয়া চাই যে আমরা মধ্যে মধ্যে অনেক রাত্রি জাগরণ করিতে পারি, অতি প্রত্যূষে উঠিতে পারি সহসা জাগরিত হইতে পারি এমন কি সারারাত্রিও বসিয়া থাকিতে পারি অথচ তাহাতে কোনও অসুখ না করে। ধরা বান্ধা নিয়ম গঠন করিয়া ফেলিবার পর তাহার কিছু কিছু ব্যভিচারেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ ব্যভিচার শৈশব কালেই আরম্ভ করিলে এবং ধীরে ধীরে করিতে থাকিলে পরে উহা সহিয়া যায়।

প্রথম হইতেই তোমার ছাত্রকে কঠিন শয্যায় শুইতে অভ্যস্ত করিবে যেন পরে উহা অসুবিধাজনক বোধ না করে। সাধারণতঃ সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত হওয়া অপেক্ষা দুঃখ ক্লেশের সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিয়া উঠাই পরিণামে অধিকতর সুখজনক। জীবনের প্রথম ভাগ দুঃখ ক্লেশের মধ্যে কাটাইলে শেষে সহস্র সহস্র অনুভূতি আনন্দ জনক হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে বাল্যকালে বিলাসের ক্রোড়ে পালিত হইলে ভবিষ্যতের অপ্রতিবিধেয় অসংখ্য অনুভূতি দুঃখজনক হইয়া দাড়ায়। সুখের ক্রোড়ে লালিত শিশুর সুকোমল পালকময় শয্যা না হইলে ঘুম হয়না, আর শুধু তক্তার উপর শুইয়া যাহার অভ্যাস সে যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে। বালিশে মাথা রাখিবা মাত্র যাহার ঘুম আসে তাহার পক্ষে কোন বিছানাই শক্ত নয়। যে বিছানায় শুইলে খুব ভাল ঘুম হয় তাহাকেই উৎকৃষ্ট বিছানা বলা

যাইতে পারে। অমল এবং আমি সারাদিন ভরিয়া খাটি। তাহাতেই আমাদের রাত্রির শয্যা প্রস্তুত হয়। শয্যা রচনাকুশল ভৃত্য বিশেষের হাতে আমাদের শয্যা রচনার ভার ন্যস্ত নহে। ভূমি চাষ করিতে করিতেই আমরা বিছানার নিদ্রাকর্ষণোপযোগিনী কোমলতা বিধান করি।

ইন্দ্রিয় চালনা।

শিশুর উচ্চতা, বল ও বিচার শক্তি বয়স্ক মানবের সমান নয় বটে। কিন্তু তাহার দেখিবার ও শুনিবার ক্ষমতা প্রায় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরই অনুরূপ। তাহার আস্বাদ জ্ঞানও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায়ই তীক্ষ্ণ। তবে স্বাদের পার্থক্য অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন বস্তু যেমন হেয় বা উপাদেয় হইয়া থাকে শিশুর বেলায় তেমন হয় না।

মানব জীবনে ইন্দ্রিয় বোধের ক্ষমতাই সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত থাকে। সুতরাং উক্ত ক্ষমতার চর্চ্চাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য অথচ উহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহেলা করা হয়।

কেবল দর্শনাদি ক্রিয়াতে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত রাখিলেই ইন্দ্রিয় চর্চ্চা হইল বলা যাইতে পারে না। উহাদের সাহায্যে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে শিক্ষা করা চাই। কেবল জ্ঞান হইলে হইবেনা অনুভব করিতে শিখা চাই। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্যগুলি নৈসর্গিক হইলেও শিক্ষার উপর উহারা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে— আমরা যেমন দেখিতে শুনিতে শিক্ষা পাইয়া থাকি আজীবন সেই ভাবেই দেখি শুনি। কতকগুলি ব্যায়াম স্বভাব সিদ্ধ। উহারা অলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উহাদের দ্বারা শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, অথচ মনের কোন অনিষ্ঠ হয় না। সাঁতার কাটা দৌড়ান লাফান, লাটিম ঘুরান ঢিল ছোড়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সবই ভাল বটে কিন্তু উহাদের

দ্বারা কেবল হাত পায়ের চালনাই হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু, কর্ণ নাই কি? তাহাদের ব্যবহারেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কেবল শারীরিক বল প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলে চলিবেনা। ইন্দ্রিয়গণেরও চালনা করিতে হইবে। উহারাই শারীরিক বলকে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রেরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যথা সম্ভব চর্চ্চা কর এবং এক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের সত্যতার পরীক্ষা কর। বস্তু মাপ, গণ, ওজন কর এবং উহাদের তুলনা কর। কোন বাধা নিবারণার্থে বল প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে উক্ত বাধার পরিমাণ কি হইবে আগে অনুমান করিয়া লও। কোনও উপকরণ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহার ফল কি পরিমাণ হইতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া লও। অনেক সময় লোকে নিষ্প্রয়োজনীয় কার্য্যে বল প্রয়োগ করিয়া নিরর্থক শক্তির অপচয় করিয়া থাকে। অনেক সময় নিজের বল অপেক্ষা অধিকতর বল সাপেক্ষ কার্য্যে ও অনর্থক শক্তির অপব্যয় করে। তোমার ছাত্র যেন এবম্বিধ কার্য্যে বল প্রয়োগ করিতে প্রলুব্ধ না হয়।

প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালন বা গতির ফল কি হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া লইতে সে অভ্যস্ত হউক। এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিজের দোষ সংশোধন করিয়া লইতেও অভ্যাস করুক। তাহা হইলেই সে যতই কার্য্য করিবে তাহার বিচার শক্তি ততই বাড়িয়া যাইবে।

মনে কর একটা বাঁশ বা কাঠ দিয়া ঠেলিয়া একটা ভারী বস্তু সরাইতে হইবে। বাঁশ বা কাঠটি যদি খুব বেশী লম্বা হয় তবে বস্তুটি বেশী দূর সরিয়া যাইতে পারে। আবার যদি খুব খাট হয় তবে খুব বেশী বল না থাকিলে সরানই যাইবেনা। কতটা লম্বা হইলে কাজ বেশ চলিতে পারে তাহা বালক অভিজ্ঞতা হইতে শিখিতে

পাবে। সুতরাং হাতে কলমে এইরূপ জ্ঞান লাভ করা অাহার বয়সে অসম্ভব নয়। মনে কর একটি বালকের একটা ভার বহন করিতে হইবে। উক্ত ভার বহন করা বলে কুলাইবে কিনা তাহা সাধারণতঃ হাত দিয়া বোঝাটা উঠাইয়া লোকে বুঝিয়া লয়। তাহা করিবার আগে সুধু চক্ষে দেখিয়া উহার ভার অনুমান করিতে শিক্ষা করা উচিত নয় কি? ভিন্ন ভিন্ন আয়তন বিশিষ্ট একই জাতীয় বস্তুর ওজনের তুলনা করিতে বালক যদি শিখিয়া থাকে তবে সে একই আয়তন বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের ওজনের তুলনা করিতে শিখুক। তাহা করিতে হইলেই তাহাকে বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের তুলনা করিতে হইবে। এই সব সাধারণ বিষয়ে শিক্ষার অভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একজন সুশিক্ষিত যুবককে এক বালতি জল এবং এক বালতি কাঠের গুড়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইল কোনটার ওজন বেশী হইবে। যুবক হাত দিয়া উঠাইয়া না লইয়া শুধু চোখে দেখিয়া উহা বলিতে পারিলনা।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের সমান কর্ত্তৃত্ব নাই। আমরা যতক্ষণ জাগ্রতবাস্থায় থাকি ততক্ষণ অবিরতই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ত্বক্ সমস্ত অবয়ব যুড়িয়া অবস্থিত। তাই কোন্ বস্তু হইতে আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা থাড়া পাহাড়া ওয়ালার মত ত্বক্ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। স্বেচ্ছাকৃতই হউক আর হউক নাই অবিরত উক্ত ইন্দ্রিয়ের চালনা হইতেছে। সুতরাং আমাদের সর্ব্ব প্রথমকার অভিজ্ঞতা ত্বগিন্দ্রিয় হইতেই হইয়া থাকে।

অতএব এই ইন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চ্চার প্রয়োজন হয় না। আমরা দেখিতে পাই অন্ধের স্পর্শ জ্ঞান খুব প্রবল। তাহার কারণ এই

...য আমরা দর্শন জ্ঞানের সাহায্যে যে সমুদয় সিদ্ধান্তে উপনীত হই, অন্ধেরা সেই সেই সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য ত্বগিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে; তাহারা দৃষ্টিশক্তির অভাব বশতঃ ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দিনের বেলায় যাহা যাহা করে আমরাও রাত্রিকালে সেই সব করিনা কেন? আমরা অন্ধকারে হাটিতে অভ্যাস করিতে পারি। হাটিতে হাটিতে যে সমুদয় দ্রব্য আমাদের হাতে পড়ে তাহা চিনিতে তাহাদিগের আকার আয়তন দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। যতক্ষণ সূর্য্যের আলোক থাকে ততক্ষণ অন্ধদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর সুবিধা বটে। কিন্তু অন্ধকারে তাহারাই আমাদিগের চালক হইতে পারে। জীবনের অর্দ্ধেককাল আমরাও অন্ধবৎ; তবে পার্থক্য এই যে আমরা নিশীথকালে এক পা ফেলিতেই ভয় পাই আর যাহারা সত্য সত্যই অন্ধ তাহারা সেই সময়ে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া চলাফেরা করিতে পারে। তোমরা হয়তো বলিতে পার, — কেন আমাদের জন্যতো রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোক আছে। কি! আমাদিগকে কি সকল সময়েই যন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইবে? আমাদের যখন প্রয়োজন হইবে তখনই যে আমরা কৃত্রিম আলোক পাইব তাহার নিশ্চয়তা কি? অমলের চক্ষু বাতিওয়ালার দোকানে না থাকিয়া তাহা অঙ্গুলির অগ্রভাগেই থাকে ইহাই আমার ইচ্ছা।

যতদূর সম্ভব সে রাত্রিকালে ইতস্ততঃ খেলিতে অভ্যাস করুক আপাততঃ তেমন মনে না হইলেও এই উপদেশের প্রয়োজনীয়তা বেশ আছে। মানবগণ এবং সময় সময় ইতর জন্তুগণ স্বভাবতঃ রাত্রিকে ভয় করে। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং সাহসী ব্যক্তিগণ প্রায়ই এই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। আমি এমন অনেক তার্কিক ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনচেতা, মানোবিজ্ঞানবিৎ যোদ্ধা দেখিয়াছি যাঁহারা ...নের

বেলায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক বটেন কিন্তু রাত্রিকালে পাতাটি নড়িলেই, স্ত্রীলোকের মত ভয়ে কাঁপিতে থাকেন। শৈশবকালে শিশুগণের নিকট যে ভূতের গল্প করা হয় তাহা হইতেই এই ভয়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া লোকে অনুমান করে। যে কারণে বধিরেরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না, সমাজের অধস্তন স্তরের লোকেরা কুসংস্কারাপন্ন হয় ইহারও প্রকৃত কারণ তাহাই। আমাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু ও ঘটনা নিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞতাই উক্ত কারণ।

কোনও দোষের কারণ একবার আবিষ্কৃত হইলে উহার প্রতিবিধানের উপায় আপনা আপনি মনে আসে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় অভ্যাস কল্পনাশক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং নূতন নূতন বস্তুর দর্শন স্পর্শন দ্বারা কল্পনা পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে যে বস্তু দেখিতে পাই তাহাতে কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয় না। স্মৃতিশক্তিরই চর্চ্চা হইয়া থাকে। তাই একটা কথা প্রচলিত আছে যে অতি পরিচিত বস্তু নিচয়ের জ্ঞান কোন প্রবল মনোভাব জন্মাইতে পারে না। কারণ কল্পনাই প্রবল মনোভাব উদ্দীপিত করিয়া থাকে। যাহা কল্পনা জাগাইতে পারে না তাহা প্রবল মনোভাব জাগাইবে কি করিয়া? অতএব অন্ধকারের ভয়রূপ প্রবল মনোভাবকে যদি বিদূরিত করিতে চাও তবে যুক্তিতর্ক করিবে না। ভীত ব্যক্তিকে বারে বারে অন্ধকারে লইয়া যাও—নিশ্চয় জানিও বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি-শৃঙ্খলা দ্বারা যাহা না হইবে ইহাতে তদপেক্ষা বেশী উপকার হইবে। অত্যুচ্চ প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া যাহারা কাজ করিতে অভ্যস্ত হয় তাহাদের মাথা ঘোরে না; তেমনি যাহারা অন্ধকারে থাকিতে অভ্যস্ত হয় অন্ধকারে তাহাদের কোনই ভয় হয় না।

বালক বালিকাদিগকে অন্ধকারে খেলিতে অভ্যস্ত করার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেইরূপ খেলা ফল-প্রসূ করিতে চাহিলে শিশুগণকে

সর্বদা স্ফূর্তিযুক্ত রাখিতে হইবে। অন্ধকারের মত বিষাদজনক আর কিছুই নাই। সুতরাং ছাত্রকে কখনও বদ্ধ ঘরে আটকাইয়া রাখিও না। যখন সে অন্ধকারে যায় তখন তাহাকে হাসাইবে আর যখন অন্ধকার ছাড়িয়া আসে তখনও হাসাইবে — যতক্ষণ সে অন্ধকারে থাকে ততক্ষণও যেন সুখজনক চিন্তায়ই তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ থাকে; নতুবা একপ্রকার ছায়ময়ী বিভীষিকা আসিয়া তাহার মন যুড়িয়া বসিতে পারে। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে অন্ধকারে অকস্মাৎ কোন বালকের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার ভয় ভাঙ্গিতে পারে। এই প্রণালী মোটেই ভাল নহে। ইহার ফল বরং বিপরীত হইবারই কথা। এইরূপ করিলে তাহার ভয় আরও বাড়িয়া যাইবে। যে বিপদ আসিয়া সহসা আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যাহার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত থাকি না, যুক্তিতর্ক বলে আমরা তাদৃশ বিপদাগমনজনিত ভয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি না এবং অভ্যাস ও তাদৃশ বিপজ্জনিত ভয় দূর করিতে পারে না। অতর্কিত ভাবে কোনও ঘটনা ঘটিলে উহা যতবারই ঘটুক না কেন যুক্তি, বিচার বা অভ্যাস তজ্জনিত ভয়ের লাঘব সাধন করিতে পারে না। তবে অতর্কিত বিপদপাত দমন করে আমাদিগের কি উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য? নিম্নলিখিত প্রণালীই আমার মতে ভাল মনে হয়। আমি অমলকে বলিব "যদি কেহ তোমাকে রাত্রিকালে আক্রমণ করে তবে আত্মরক্ষার্থে তুমিও তাহাকে আক্রমণ করিতে পার। কারণ আক্রমণকারীতো তোমাকে জানায় নাই যে তোমাকে শুধু ভয় দেখানই তাহার উদ্দেশ্য, না তোমাকে আঘাত করাই তাহার উদ্দেশ্য। সে যে বলিয়াই তোমার মনে হউক না কেন, সে যখন তোমাকে অসুবিধায় পাইয়া আক্রমণ করিয়াছে, তুমি তাহাকে সজোরে ধরিবে। তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে। সে বাধা দিলে পুনঃ পুনঃ জোরে আঘাত

করিবে। সে যাহাই বলুক বা করুক না কেন, সে কে তাহা ঠিক করিয়া না জানা পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িবে না। পরিচয় পাইলে সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবে যে ভয়ের কোন কারণ নাই। কতকগুলি লোক আছে যাহারা তামাসা করিবার জন্য লোকের অনিষ্ট করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তোমার আক্রমণকারী সেই শ্রেণীর লোক হইলে তোমার হস্তে ঐরূপ ব্যবহার পাইয়া সে আর ঐরূপ তামাসা করিতে আসিবে না।" জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে শিশুগণের ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হয় বটে তথাপি আমাদিগের স্পর্শ-জ্ঞান বড় স্থূল ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই :— ত্বগিন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বরাবরই একসঙ্গে হইয়া থাকে — কোনও বস্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইবার পূর্ব্বেই দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হইয়া পড়ে এবং মনও প্রায় সর্ব্বদাই স্পর্শেন্দ্রিয় প্রদত্ত জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে স্পর্শেন্দ্রিয়ের গণ্ডী সংকীর্ণ বলিয়া তল্লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। স্পর্শজ্ঞান জ্ঞাতার চতুর্দ্দিকে বেশী দূরত্বের বাহিরে যায় না — এই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে যে জ্ঞান-লাভ করে তাহা ভাল করিয়াই করে। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় বহু দূরস্থিত বস্তু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় বলিয়া কোনও বস্তুই তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সঙ্গে পেশী সঙ্কলন ক্রিয়া একত্র হইলে একই সময়ে আমাদিগের উভয়বিধ অনুভূতি হইতে পারে এবং তাহা হইলে আমরা বস্তুর উষ্ণতা, আকার ও আয়তনের ধারণা করার সঙ্গে সঙ্গে ওজন এবং কাঠিন্যের ধারণাও করিতে পারি। অতএব দেখা গেল যে অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়ই আমাদিগকে বাহ্য-বস্তু সম্বন্ধীয় অনুভূতি সমধিক পরিমাণে দিয়া থাকে — এই ইন্দ্রিয়ের

ক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় হইয়া থাকে এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মরক্ষণোপযোগী জ্ঞান দান করে।

দর্শন-জ্ঞান।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অল্পদূর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই জন্য দর্শনজ্ঞানে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দর্শকের চক্রবাল সীমাবদ্ধ গণ্ডীর পূর্ণার্দ্ধ অংশ তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়। ইহার ফলে দর্শকের মুহূর্ত্তমধ্যে অসংখ্য অনুভূতি হয় এবং তদ্দ্বারা তিনি কত শত শত সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন— এতগুলি অনুভূতি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি ভুল হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা দৃষ্টি অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া এত অধিক ক্ষিপ্রতার সহিত নিষ্পন্ন হয় এবং এত অধিক বিস্তৃত যে ভুলসংশোধন সম্ভব হইয়া উঠে না। সেই হিসাবে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়কে সর্ব্বাপেক্ষা অপটু বলা যাইতে পারে। স্থানাবরোধকতা জড় পদার্থের একটি সাধারণ ধর্ম্ম। দৃষ্টিগত ভ্রান্তি না হইলে উক্ত ধর্ম্ম ও তাহার অংশ দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং উক্ত ভ্রান্তির প্রয়োজনও আছে। আকারে ভুল না হইলে আমরা দূরের বস্তু দেখিতে পাইতাম না। যদি একই দৃশ্যমান আকৃতি অবস্থাভেদে এক নিয়মে ছোট বড় না হইত তবে আমরা বস্তুর দূরত্ব অনুমান করিতে পারিতাম না অথবা আমাদের দূরত্বের জ্ঞানই হইত না। সমান দুইটি গাছের মধ্যে মনে করি একটি দর্শক হইতে একশত পদ দূরে এবং অপরটি মাত্র দশপদ দূরে। যদি দুইটাই সমান বড় দেখাইত তবে গাছ দুইটিকে দর্শক সমান দূরে পাশাপাশি অবস্থিত

দেখিতে পাইত। বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বোধ ঠিক যাহা দর্শনেন্দ্রিয় অবস্থাভেদে ঠিক তাহা দেখায় না। যদি সর্ব্বদা ঠিক তাহাই দেখাইত তবে আমাদের স্থানের জ্ঞান হইত না — সব বস্তুই একেবারে চক্ষু-সংলগ্ন বলিয়া মনে হইত।

কোনও বস্তুর প্রান্তবিন্দু সমূহ হইতে দর্শকের চক্ষু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে ঐ সীমান্ত রেখাগুলি চক্ষুতে একটা কোণ উৎপন্ন করে। ঐ কোণকেই দৃষ্টিকোণ বলে। চক্ষু দ্বারা বস্তুর দূরত্ব এবং আয়তন অনুমান করিবার জন্য ঐ দৃষ্টিকোণই একমাত্র সম্বল। কারণ দৃষ্টি কোণের পরিমাণ বস্তুবিশেষের কেবল আয়তন বা কেবল দূরত্বের উপর নির্ভর করে না — উহাদের সমবায়ের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং কেবল এই কোণের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় যে জ্ঞানপ্রদান করিয়া থাকে তাহা অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত হইবারই কথা। মনে করি একটি বস্তু দ্বারা গঠিত দৃষ্টি-কোণ অন্যটির অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইল। এই কোণ ক্ষুদ্রতর দেখিতে পাইলাম বলিয়া আমরা নিঃসন্দেহ রূপে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে এই বস্তুটি ক্ষুদ্রতর। কারণ বস্তুটি ক্ষুদ্রতর হইলে দৃষ্টি-কোণ ক্ষুদ্রতর হইতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব বস্তুটি বৃহত্তর হইলে দূরত্বের আধিক্য হেতুও উহা ছোট বলিয়া মনে হইতে পারে।

অতএব এইস্থলে অন্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল একজাতীয় ইন্দ্রিয়-বোধের উপর নির্ভর না করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধের সাহায্যে উহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে। দর্শনেন্দ্রিয় বড়ই চঞ্চল এবং সহসা এক একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। তাহার তুলনায় স্পর্শেন্দ্রিয় অনেকটা ধীর ও স্থির। তাই দর্শন-জ্ঞানকে স্পর্শ-জ্ঞানের অধীন করিতে হইবে — এই সাবধানতার অভাব বশতঃ কেবল চক্ষুর সাহায্যে উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, গভীরতা ও দূরত্বের পরিমাণ করিতে আমাদিগের অনেক ভুল হয়। এঞ্জিনিয়ার, জরিপওয়ালা,

গৃহ-নির্ম্মাতা, রাজমিস্ত্রী এবং চিত্রকরগণ শুধু দেখিয়া বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রভৃতি যেমন ঠিক করিয়া বলিতে পারে আমরা সাধারণ লোক তেমন পারি না। ইহাতে বুঝা যায় এই বিষয়ে আমাদিগের অক্ষমতা চক্ষুর দোষের জন্য ঘটে না, আমাদিগের অনবধানতার জন্যই ঘটে। এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের স্ব স্ব ব্যবসায়ানুরোধে যে কার্য্য করিতে হয় তাহাতে উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। আর আমরা উহার মোটেই চর্চ্চা করি না। তাহারা আপাত প্রতীয়মান দৃষ্টি-কোণ জাত ভুল সংশোধন করিয়া লয় এবং যে যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ উৎপন্ন করে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে পারে।

যাহাতে অবাধে অঙ্গ-চালনা হয় এমন বিষয়ে বালকদিগকে সহজেই নিযুক্ত করা যাইতে পারে। দূরত্ব নির্দ্ধারণ, পরিমাপ ও অনুমান করিতে তাহাদের অনুরাগ বিবিধ উপায়ে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। নিম্নে প্রশ্নচ্ছলে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ঐ যে বড় আম গাছটি দেখা যাইতেছে। কেমন করিয়া উহার ফল পাইবে? এই সিড়খানি দিয়া কি ঐ গাছে উঠা যাইবে? ঐ খালটি তো খুব বিস্তৃত। উঠানে যে তক্তা দেখিতেছ—উহাতে কি খালের এপার ওপার পাইবে? এই জানালা হইতে বড়শী ফেলিয়া ঐ পরিখার মাছ ধরিতে চাই। বল দেখি কত গজ সূতা লাগিবে? এই দুইটা গাছের মধ্যে একটা দোলনা টানাইতে চাই। চারি গজ রজ্জুতে চলিবে কি? আমাদের নূতন বাড়ীতে আমাদের জন্য একটা কক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। উহার আয়তন ২৫ বর্গ ফিট, উহাতে আমাদের চলিবে কি? আমাদিগের বর্ত্তমান কক্ষ হইতে কি ঐ কক্ষ বড় হইবে? আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ঐ যে দুইটা গ্রাম দেখা যাইতেছে উহাদের কোনটিতে না পৌছিলে খাবার মিলিবে না। বল দেখি কোন গ্রামটির দিকে চলিলে শীঘ্র শীঘ্র খাবার পাইবে?

কোন বস্তু দেখিবামাত্রই আমরা সেই বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া ফেলি। অন্যান্য ইন্দ্রিয়োপলব্ধির বেলায় আমরা তত তাড়াতাড়ি ধারণা করিন। তাই নির্ভুল ভাবে দেখিতে শিখিতে অনেক সময় লাগে। বস্তুর আকার ও দূরত্ব সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করিতে হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্পর্শজ্ঞানের সহিত দর্শন-জ্ঞানের তুলনা করিতে হয়।

স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য না লইলে এবং চলা ফেরা না করিলে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণতম হইলেও কেবল উহা দ্বারা বিস্তৃতির জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব হইত। শম্বুকের নিকট সমগ্র বিশ্বমণ্ডল একটী বিন্দুমাত্র। ভ্রমণ, স্পর্শ, গণনা ও পরিমাপ দ্বারাই আমরা দূরত্ব অনুমান করিয়া থাকি।

সত্য বটে সর্ব্বদাই পরিমাপ করিয়া দূরত্ব নির্ণয় করিলে চক্ষুর শিক্ষা হয় না। তথাপি বালকের পক্ষে মাপ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি অনুমানের আশ্রয় লওয়া উচিত নয়। খুব বড় দূরত্বের পরিমাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাকে মনে মনে কয়েকটি সমান সমান অংশে ভাগ করিয়া লইতে পারে। তারপর উহার একটি অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে মাপিয়া লইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ দূরত্বের পরিমাণ করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা হাতে দিয়া না মাপিয়া এই ভাবে মাপিতে ছাত্রের অভ্যাস করা উচিত। এই ভাবে পরিমাণ করিবার পর, প্রথম প্রথম সম্পূর্ণ বস্তুটিই মাপিয়া দেখা উচিত যে অনুমানে কি ভুল হইল। এই উপায়ে দর্শনেন্দ্রিয় জাত অনুকরণের ভুল সংশোধন করিতে শিখিতে পারিবে। মাপিবার কতকগুলি স্বাভাবিক একক প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যথা পদক্ষেপ, বাহুর দৈর্ঘ্য ও নিজের উচ্চতা। বালক যখন কোন বাড়ীর একতালা বা দোতালার উচ্চতা নির্ণয় করিতে যায় তখন সে তাহার শিক্ষকের উচ্চতাকে একক ধরিয়া লইতে পারে। গীর্জ্জার উচ্চতা অনুমান করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী বাড়ীর উচ্চতাকে এককরূপে লওয়া যাইতে পারে। দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া কত মাইল

হাঁটিলাম ঠিক করিতে হইলে কত ঘণ্টা হাঁটা হইল তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়, তারপর এক ঘণ্টায় কত পথ হাঁটা যায় তাহা ঠিক করিতে হয়। যাহা যাহা বলা হইল তাহার কিছুই ছাত্রকে করিয়া দিবেনা। সে নিজেই সব করুক।

বস্তুর আকার চিনিতে শিখিবার পূর্ব্বে এমন কি ইহা দেখিয়া নিজে ঐরূপ বস্তু তৈয়ার করিতে না পারা পর্যন্ত উহাদের আয়তন ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করা যাইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা দৈর্ঘ্যাদির অনুমান করা আলোক বিজ্ঞানের নিয়মের উপর নির্ভর করে। ঐ সমুদয় নিয়ম কতকটা জানা না থাকিলে সুধু দেখিয়া বস্তুর আয়তন অনুমান করিতে পারা যায় না।

অঙ্কন।

শিশুগণ স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয় সুতরাং অঙ্কন করিবার প্রবৃত্তিটী তাহাদের স্বাভাবিক। আমার ছাত্রকে অঙ্কন করিতে নিযুক্ত করি বটে কিন্তু তাহাকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাহার দর্শন জ্ঞানকে নির্ভুল করা এবং হস্তের পেশীগুলিকে কার্য্যক্ষম ও নমনীয় করাই আমার উদ্দেশ্য। কোন কর্ম্ম করিতে যাইয়া তাহাতে সফলতা লাভ হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। সেই কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার ফলে যদি একটা অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং হাত আসে তবেই যথেষ্ট হইল। আমি আমার ছাত্রকে অঙ্কন শিখাইবার জন্য কোন শিক্ষক নিযুক্ত করিব না কারণ শিক্ষকগণ ছাত্রকে কোন আদর্শ দেখিয়াই আঁকাইয়া থাকেন। প্রকৃতিই তাহার শিক্ষক হইবে — তাহাকে আদর্শ দেওয়া হইবেনা প্রকৃত পদার্থই দিতে হইবে। সে আসল বস্তু আঁকিবে শুধু কাগজ দেখিয়া আঁকিবেনা। সে প্রকৃত গৃহ দেখিয়াই গৃহ, প্রকৃত বৃক্ষ দেখিয়াই বৃক্ষ এবং প্রকৃত

মানুষ দেখিয়াই মানুষ আঁকিবে। এইরূপে সে স্বয়ংই বিবিধ বস্তু ও তাহাদের আকার দেখিতে অভ্যস্ত হইবে এবং মিথ্যা ও মনগড়ান নমুনাকে খাঁটি বলিয়া ভুল করিবে না। পুনঃ পুনঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন না করিলে বিবিধ বস্তুর প্রকৃত আকার মানুষের স্মৃতি-পটে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। তাহা না হইবার পূর্ব্বে আমি আমার ছাত্রকে বস্তু না দেখিয়া কেবল স্মৃতির সাহায্যে কিছু আঁকিতে দিব না। কারণ তাহা হইলে প্রকৃত বস্তুর স্থলে অদ্ভুত ও বিসদৃশ আকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে সামঞ্জস্যের জ্ঞান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ হারাইয়া ফেলিতে পারে। আমি বেশ বুঝিতে পারি যে আমার এই প্রণালীর ফলে সে কয়দিন পর্য্যন্ত দর্শন যোগ্য কিছুই আঁকিতে না পারিয়া কেবল চাপ্‌রা চাপরা রঙ্গ বসাইবে, সুন্দর ভাবে সীমারেখা আঁকিতে শিক্ষা করিতে তাহার অনেক বিলম্ব হইবে এবং নিপুণ চিত্রকরের মত দুই একটা দাগ দেওয়া শিখিতেই অনেক সময় লাগিবে। হয়তো সে চিত্রের মোহিনী শক্তিটুকু কোথায় তাহা কোন দিনই বুঝিতে পারিবে না, কোন দিনই অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না। এই সব না হইলেও অন্য দিক্ দিয়া তাহার অনেক উপকার হইবে। তাহার চক্ষু আগের মতন ভুল করিবে না, হস্তের পেশীগুলির ক্রিয়া পূর্ব্বে ইচ্ছার যতটা ব্যতিক্রম করিত এখন আর তেমন করিবে না, জীব, উদ্ভিদ ও আরও নানাবিধ প্রাকৃতিক পদার্থের আকার ও আয়তনের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ যাহা আছে তাহা পূর্ব্ব হইতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে এবং দর্শন জ্ঞানের সিদ্ধান্তে যে সত্য সত্যই ভুল হয় তাহা হাতে কলমে বুঝিতে পারিবে। আমার অভিপ্রায়ও ঠিক ইহাই। আমি চাই যে বস্তুর যতটা অনুকরণ করিতে পারুক বা না পারুক কিন্তু বস্তু চিনুক, তাহার গুণাবলী নির্ভুল জানুক। স্তম্ভগাত্রে বিনির্ম্মিত কৃত্রিম পত্রপুষ্পাবলীর একটি

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র আঁকুক — আমি তেমন চাইনা কিন্তু চাই যে স্বভাব জাত একটা গাছের পাতাটি বা ফলটি যেমন ঠিক তেমন করিয়া আঁকুক।

ছাত্র নিজে নিজে কার্য্য করুক ইহা আমার অভিপ্রায় বটে কিন্তু সে যে একাকী শুধু নিজের মনে কার্য্য করিবে আর নিজে নিজেই তজ্জনিত প্রমোদ উপভোগ করিবে এইরূপ আমার ইচ্ছা নয় — আমি নিজে তাহার কাজের ভাগী হইতে চাই। তাহা হইলে তাহার আনন্দ বরং বাড়িয়া যাইবে। আমি ছাড়া তাহার অন্য কোন প্রতিদ্বন্দী থাকিতে দিব না — কিন্তু আমি অবিরত সর্ব্ব কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দী থাকিব অথচ এই প্রতিদ্বন্দিতা হইতে ঈর্ষ্যার উদ্ভব হইবে না। ইহা শুধু তাহার জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত করিবে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পেন্সিল হাতে লইব — এবং প্রথমে তাহারই মত কুৎসিত করিয়া চিত্র আঁকিব। আমার যদি চিত্র বিদ্যায় দক্ষতাও থাকে তথাপি আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের মতন খারাপ করিয়াই আঁকিব।

বালক যেমন দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি টান দিয়া মানুষ আঁকে আমিও প্রথমে তেমন করিয়া আঁকিব — এক এক বাহুর জন্য এক এক টান দিব — অঙ্গুলিগুলি বাহু হইতে দীর্ঘতর হইবে। অল্পকাল মধ্যেই আমরা অঙ্কনের এই বৈসাদৃশ্য জনিত ত্রুটি বাহির করিয়া ফেলিব। আমরা লক্ষ্য করিব হাত পা কেবল এক একটা সরল রেখা নয়, উহাদের স্থূলত্ব আছে, আর এই স্থূলত্ব সব অংশে সমান নয়, সমস্ত দেহের দৈর্ঘ্যের সহিত হাতের দৈর্ঘ্যের এক নির্দ্দিষ্ট অনুপাত আছে এবং সেই অনুপাত রক্ষা করিয়া অঙ্কন করিতে হয়। অঙ্কন কার্য্যে আমি সর্ব্বদা তাহার সমান সমান থাকিতে চেষ্টা করিব আর যদিও বা দুই একবার একটু অগ্রসর হইয়া পড়ি তাহার পরিমাণ এত সামান্য হইবে যে সে আমাকে সহজেই ধরিতে পারিবে।

আমরা রঙ ও তুলির ব্যবহার করিব। কেবল বস্তুর সীমারেখার অনুকরণ করিবনা—উহার বর্ণ এবং অপরাপর বিশেষত্বেরও অনুকরণ করিব। আমরা চিত্রে রঙ দিব—রঙ কোথাও পাতলা কোথাও ঘন হইয়া পড়িবে। চিত্র সম্পর্কে যখন যাহাই করিনা কেন আমাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বদাই প্রকৃতির দিকে থাকিবে, বস্তুটীর স্বাভাবিক বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষত্ব কি তাহাই সর্ব্বদা ভাল করিয়া দেখিয়া লইব। যাহা করি প্রকৃতির নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়াই করিব।

এখন হইতে আর আমাদের কক্ষ সাজাইবার জন্য ছবির অভাব থাকিবেনা। আমরা যে সমুদয় ছবি আঁকি তার সবগুলিতে ফ্রেম লাগাইব। উহার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ ফ্রেমে আটিয়া ফেলিলে আর ভবিষ্যতে ছবির ভুল সংশোধনের চেষ্টা চলিবে না—যখন যাহা পারিয়াছি ঠিক তাহাই দেখা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব হইতে ইহা জানা থাকাতে ছবি আঁকিবার সময়ই খুব সাবধান হইব, —অবহেলা করা হইবে না। এক একটি ছবি ক্রমাগত ২০।৩০ বার আঁকা হইবে। [illegible] এমন করিয়া সাজাইয়া রাখিব যে অঙ্কনের দক্ষতা যে ক্রমে বাড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। ঘরের প্রথমকার ছবিটা শুধু [illegible] বর্ণ ক্ষেত্রের মতন হইবে—উহার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে হইতে শেষকার ছবিটিতে সম্মুখ ভাগের দৃশ্য, পার্শ্বের দৃশ্য, আলোক ও ছায়ার সামঞ্জস্য প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। চিত্রগুলি এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত করিয়া রাখিলে উহা আমাদিগের প্রীতিকর হইবে, অন্যান্যের কৌতূহল উৎপন্ন করিবে এবং আমাদিগকে ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টা করিতে প্রোৎসাহিত করিবে। নিকৃষ্টতম ছবিগুলি খুব সুন্দর চাকচিক্যময় ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিব। ক্রমে ছবি যত ভাল হইবে ফ্রেমের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। অবশেষে যে ছবিটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে তাহাতে অতি সাধারণ, কাল রঙ্গের

একটা ফ্রেম দিব। চিত্র সুন্দর হইলে তাহার সুন্দরতা বর্দ্ধনের জন্য আবার কিসের প্রয়োজন? মূল চিত্রটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জিনিস। যদি অবান্তর সীমারেখাই অর্দ্ধেক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। তবে তাহা বড় দুঃখের কথা।

আমার ছবির ফ্রেম যেন খুব সামান্য হয় আমরা উভয়েই এই আকাঙ্ক্ষা করিব। কাহারও চিত্রের নিন্দা করিতে হইলে বলিব "তোমার ছবির একটা সোণালী ফ্রেমের দরকার হইবে।" সম্ভবতঃ কালক্রমে "সোনালী ফ্রেম" এই কথাটাই আমাদের কাছে একটা প্রবাদ বাক্য হইয়া দাড়াইবে। আমরা আগ্রহের সহিত বলিব" এই সংসারে কতলোক সোনালী ফ্রেম দিয়া আপনার কার্য্য আটিয়া লইয়া লোক চক্ষে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া থাকে"।

জ্যামিতি।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি জ্যামিতি বালকদিগের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু তাহার জন্যও আমরাই দায়ী। আমরা লক্ষ্য করিনা যে জ্যামিতি শিক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রণালী এবং আমাদের প্রণালী এক হইতে পারে না। আমাদের প্রণালী হইল যুক্তি দিয়া শিখা, আর তাহাদের প্রণালী চক্ষের দেখা দেখিয়া শিখা। জ্যামিতি শিখিবার বেলায় আমরা যতটা যুক্তির আশ্রয় লইয়া থাকি ততটাই কল্পনার আশ্রয় ও লইয়া থাকি। কোনও প্রতিজ্ঞার সামান্য কথনের উল্লেখ হইলেই আমরা উহার প্রমাণ কল্পনা করিতে চেষ্টা করি। পূর্ব্বে পঠিত কোন প্রতিজ্ঞার উপর নূতন প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নির্ভর করিতেছে তাহা বাহির করি, তারপর উক্ত অধীতপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার প্রতিপাদ্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বহু সিদ্ধান্তের মধ্যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঠিক্ কোনটীর প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাই নির্দ্ধারণ করি। এই প্রণালী অনুসারে, নৈসর্গিক

উদ্ভাবনী শক্তি না থাকিলে সুদক্ষ তার্কিকেরও ভুল হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং বালকদিগকে জ্যামিতি শিক্ষা দিতে যাইয়া শিক্ষক গুরুতর ভুল করেন ছাত্রগণের দ্বারা প্রমাণ উদ্ভাবন করাইতে পারেন না— তাহার পরিবর্ত্তে প্রমাণ বলিয়া দেন। ছাত্রদিগকে নিজে নিজে বিচার করিতে শিক্ষা দিতে পারেন না। তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের হইয়া নিজেই বিচার করেন— ইহাতে ছাত্রগণের কেবল স্মৃতি শক্তিরই চর্চ্চা হইয়া থাকে।

বালকদিগের পক্ষে উক্ত প্রণালী খাটে না। তাহাদিগকে দেখার ভিতর দিয়াই শিখাইতে হইবে। অতএব জ্যামিতিক চিত্র যতদূর সম্ভব নির্ভুল করিয়া আঁক। এক চিত্রের সহিত অপর চিত্রের সংযোজনা কর, উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়া উহাদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তাহা ভাল করিয়া দেখ। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করাইয়াই প্রাথমিক জ্যামিতির প্রধান প্রধান সব বিষয়ই বালকগণকে শিখাইতে পারি। উহাতে সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না কেবল, সোজাসোজি উপস্থাপন ব্যতীত অন্য কোনরূপ প্রমাণেরও প্রয়োজন হইবে না। আমি অমলকে জ্যামিতি শিখাইতে যাইবার কোন উদ্যোগ করিনা, ঘটনার এইরূপ সমাবেশ করি যে সেই আমাকে উহা শিখাইতে আসিবে। আমি কেবল দুই বা ততোধিক আকারের মধ্যে কি কি সম্পর্ক তাহার অনুসন্ধান করিব সেই তৎসমুদয় বাহির করিবে। আমি এমন ভাবে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিব যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা উদ্ভাবন করিবে। আমি বৃত্ত আঁকিবার জন্য কম্পাসের ব্যবহার করিব না একগাছি সূতার এক প্রান্ত আটিয়া রাখিয়া অপর প্রান্তে একটী সূক্ষাগ্র বস্তু বাঁধিয়া লইয়া উহাকে টান্ টান্ করিয়া ঘুরাইয়া আনিব। অতঃপর আমি যখন একটা অর্দ্ধবৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ গুলি মাপিয়া তুলনা করিতে যাইব তখন অমল আমার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাসিয়া বলিবে কেন,

একই গাছ সুতা ঠিক একই পরিমাণ জোরে ধরিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে তবে আর দূরত্ব অসমান হইবে কেন?

৬০° ডিগ্রি কোণ মাপিবার প্রয়োজন হইলে, আমি কোণের শিরোদেশ হইতে শুধু একটা চাপ আঁকিব না, সম্পূর্ণ বৃত্তটিই আঁকিয়া লইব — কারণ বালকদিগকে যাহা শিখাইবার সবটাই দেখাইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে না দেখাইয়া কিছুই মানিয়া লইতে বলা উচিত নয়। বালকেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইবে যে নির্দ্দিষ্ট কোণের বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত অংশ সমস্ত পরিধির এক ষষ্ঠাংশ। তারপর প্রথমাঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্রকেই কেন্দ্র করিয়া আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি। দেখিতে পাই পূর্ব্বোক্ত কোণের বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত এই বৃত্তের পরিধির অংশও সম্পূর্ণ পরিধিটির এক ষষ্ঠ। তারপর আরও একটী ঐককেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকি এবং পূর্ব্বের ন্যায় সত্যতা পরীক্ষা করি। এইরূপ আরও ঐককেন্দ্রিক বৃত্ত আঁকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরীক্ষা করিতে থাকিলে অমল আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য বিরক্ত হইয়া বলিবে এই কোণের বাহুদ্বয়ের অন্তগত প্রত্যেক চাপ ছোটই হউক আর বড়ই হউক স্ব স্ব পরিধির এক ষষ্ঠাংশ হইবে।" দেখ, এইভাবে চলিলে ছাত্র শীঘ্র শীঘ্র জ্যামিতিক-যন্ত্রগুলি প্রায় বুঝিয়া সুঝিয়া প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত হইবে।

ত্রিভুজের তিন কোণ একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান ইহা একটী বৃত্ত আঁকিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। আমি অঙ্কিত বৃত্তের ভিতরই এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব এবং তারপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব এখন যদি বৃত্তটি মুছিয়া ফেলিয়া কেবল সরল রেখাগুলি রাখা যায়, তবে কি কোণগুলির পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে?"

সাধারণতঃ জ্যামিতিতেক চিত্র যথাযথ ও নির্ভুল করিয়া আঁকিবার দিকে তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। চিত্র যেন ঠিকঠাকই অঙ্কিত

হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয় প্রমাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু আমি এবং অমল প্রমাণের দিকে মোটেই মনোযোগ দিব না। পক্ষান্তরে চিত্র যথাসম্ভব ঠিক করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিব। অঙ্কনীয় সমচতুর্ভুজকে প্রকৃত সমচতুর্ভুজ এবং বৃত্তকে সম্পূর্ণ গোল করিতেই চেষ্টা করিব।

চিত্র যথাযথ অঙ্কিত হইল কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষেত্রের কি কি গুণ আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব এবং তাহা করিতে যাইয়া নিত্য নূতন নূতন সত্য বাহির করিয়া ফেলিব। ব্যাস বরাবর একটি বৃত্তকে ভাঁজ করিয়া ফেলিব— কোনও একটি কর্ণ রেখাক্রমে সম চতুর্ভুজকে ভাঁজ করিয়া ফেলিব। তারপর দেখিব কোন ক্ষেত্রের সীমারেখাগুলি ভাল করিয়া মিলিয়া গিয়াছে। যাহার সীমা রেখাগুলি অধিকতররূপে মিলিয়া গিয়াছে তাহাই অধিকতর নির্ভুলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে এই যে সমতা তাহা সকল প্রকারের সমান্তরিকের, বিষম চতুর্ভুজের এবং আরও নানাবিধ ক্ষেত্রের বেলায় খাটে কিনা এই লইয়া আমরা তর্ক করিব। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আগে আমরা মাঝে মাঝে অনুমান করিব— পরীক্ষায় কি ফল দাড়াইবে। পরীক্ষা করিয়া কোন ফল পাইয়া সময় সময় বিচার করিব— কেন এমন ফল পাইলাম।

রুল ও কম্পাসের ভাল ব্যবহার করিয়া শিক্ষা করা আমার ছাত্রের পক্ষে জ্যামিতির পাঠ উপলক্ষেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে অঙ্কন আর একটা বিভিন্ন বিষয়। উহাতে উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। এই দুইটী যন্ত্র তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইবে। প্রয়োজন মত— কেবল মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে নতুবা উহাদের সাহায্যে বিশৃঙ্খল ভাবে যেমন ইচ্ছা

মতন দাগ দিবে। কিন্তু ভ্রমণে বাহির হইবার সময় মাঝে মাঝে আমাদের অঙ্কিত জ্যামিতিক ক্ষেত্র আমরা সঙ্গে লইয়া যাইব এবং কি কি আঁকিয়াছি ও কি কি আঁকিব সেই সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলিব।

শ্রবণ জ্ঞান।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই দুই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা বক্তব্য তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। স্থিতিশীল ও চলিষ্ণু এই উভয়বিধ অবস্থাপন্ন বস্তুই দর্শন ও স্পর্শন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল চলিষ্ণু দ্রব্যই শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। বায়ুমণ্ডলের কম্পনই শ্রবণ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে সুতরাং কোনও বস্তু গতিশীল না হইলে উক্ত কম্পন জন্মিতে পারে না; অতএব কি শ্রুতিমধুর ধ্বনি কি কর্কশ রব কিছুই শুনা যাইতে পারে না। যদি প্রত্যেক বস্তু স্থির হইয়া থাকিত তবে আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। রাত্রিকালে আমরা নিজেরা প্রায়ই চলি না, কেবল অন্যান্য বস্তুর গতি হইতেই আমাদিগের শ্রবণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি না থাকিলে আমরা রাত্রিকালে বুঝিতে পারি না যে শ্রবণ জ্ঞানের আধারভূত বস্তুটী ছোট কি বড়, দূরস্থ কি নিকটস্থ, গতি সজোরে হইয়াছে কি মন্দ মন্দ হইয়াছে। বায়ুতে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে তজ্জনিত বায়ু-তরঙ্গ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কঠিন পদার্থে প্রতিহত হইয়া আবার এক নূতন শ্রেণীর তরঙ্গ উৎপন্ন করে। উহাতেই প্রতিধ্বনির জ্ঞান জন্মে। শব্দোৎপাদনকারী বস্তুটি যে স্থানে অবস্থিত উক্ত প্রতিধ্বনি তৎসম্বন্ধে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয়, মনে হয় বস্তুটী যেন অন্য এক স্থানে রহিয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরেরা

উপত্যকায় দাঁড়াইলে যতদূর হইতে নরকণ্ঠধ্বনি ও অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা যায়, ভূপৃষ্ঠে কাণ পাতিলে তদপেক্ষা অধিক দূর হইতে উহা শুনা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয়ের তুলনা করিয়াছি, এইক্ষণেও দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তুলনা করা যাউক। একই সময়ে একই বস্তু হইতে আলোক ও শব্দ আমাদিগের দিকে আসিতে থাকিলে কোনটি আসিয়া প্রথমে উহার উপযোগী ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিতে পারিবে? কামানে অগ্নি সংযোগ দেখিবার পরও গোলার আঘাত এড়াইবার সময় থাকে। কিন্তু কামানের আওয়াজ শুনিবার পর আর সময় থাকে না। বিদ্যুদ্দর্শন ও বজ্রপাত শ্রবণ এতদুভয়ে। ব...ের ব্যবধান দেখিয়া কতদূর হইতে পড়িল তাহার ধারণা করিতে পারি। বালকদিগকে এই সব পরীক্ষা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও। ইহাদিগের যে যে পরীক্ষা নিজে করা সম্ভব সেইগুলি নিজে করুক আর বাকীগুলি বুদ্ধিবলে বাহির করুক। কিন্তু যদি তোমাকেই সব বলিয়া দিতে হয় তবে বালক কিছুই না জানুক তাহাই বরং ভাল।

বাগিন্দ্রিয়কে শ্রবণেন্দ্রিয়সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে। দর্শনেন্দ্রিয়কে অন্য কোন ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে না। কারণ আমরা বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ উৎপন্ন করিতে পারি বটে কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্য বিশেষ উৎপন্ন করিতে পারি না। সুতরাং শব্দোৎপাদনকারী বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে পারি বলিয়া আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয় চর্চ্চার অধিকতর সুবিধা আছে।

বাগিন্দ্রিয়।

মানুষের স্বর ত্রিবিধ—১ম বাক্যোচ্চারণ স্বর, ২য় গানের স্বর, ৩য় জোর দেওয়ার স্বর। ইহাদের প্রথমটির সাহায্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া

শব্দ উচ্চারণ করিতে অর্থাৎ কথা বলিতে পারি। দ্বিতীয়ের সাহায্যে আমরা গান গাহিতে পারি। তৃতীয়ের সাহায্যে আমরা উচ্চার্যমান বাক্য বা গানের অংশ বিশেষে বেশী জোর দিয়া থাকি। ইহার দ্বারাই প্রবল মনোভাবগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাই আমাদের গান ও কথাকে জীবন্ত করিয়া তোলে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় বালকেরও এই তিন প্রকার স্বরই আছে বটে কিন্তু তাহারা আমাদিগের মত এই তিন প্রকার স্বরকে মিশাইয়া লইতে পারে না। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় বালকও হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে, চীৎকার করিতে জানে, নাকে কাঁদিতে পারে ও ফোঁপাইতে পারে। কিন্তু সে এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্বরকে অপর দুই জাতীয় স্বরের সঙ্গে কেমন করিয়া মিশাইয়া লইতে হইবে তাহা জানে না। শ্রুতিমধুর গানেই এই ত্রিবিধ স্বরের মিলন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুগণ তেমন গান গাইতে পারে না এবং তাহাদের গান বেশী ভাবোদ্দীপক হয় না। তাহাদের কথা বলিবার স্বর প্রায়ই দুর্ব্বল এবং কথার অংশ বিশেষে তাহারা প্রায়ই জোর দেয় না।

আমাদের ছাত্রের কথা বলার স্বর অন্যান্য বালক হইতেও সরল ও একঘেয়ে রকমের হইবে। কারণ তাহার প্রবল মনোবৃত্তিগুলি জাগ্রত হয় নাই সুতরাং উক্ত মনোবৃত্তির প্রকাশক ভাষা সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষার সঙ্গে মিশিয়া উহাকে তেজস্বী করিয়া তোলিতে পারে না। অতএব তাহাকে কখনও অভিনয় করিতে বা বক্তৃতা দিতে শিখাইও না। যে কথার অর্থ বুঝিতে পারে না তাহাতে জোর দেওয়া, যে সকল মনোবৃত্তির অভিজ্ঞতা নাই, স্বরভঙ্গী দ্বারা সেই সকল প্রকাশ করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য বই আর কিছুই নহে। আমাদের ছাত্র কখনও এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে যাইবে না।

তাহাকে সমোচ্চ স্বরে মুক্ত কণ্ঠে ও স্পষ্টরূপে কথা বলিতে শিখাইবে। স্বেচ্ছাকৃত কোনও বিকৃতি না করিয়া শুদ্ধরূপে শব্দোচ্চারণ

করিতে, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের নিয়মানুসারে বাক্যাংশ বিশেষের যেখানে জোর পড়া উচিত সেইখানে জোর দিতে শিখাও। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ সাধারণতঃ অত্যধিক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে এই দোষ বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেও। যতটুকু উচ্চকণ্ঠে বলিলে অন্যে স্পষ্ট বুঝিতে পারে কেবল ততটুকু উচ্চ করিয়া বলিতে শিখুক। কোনও বিষয়েই মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতে নাই।

দেখিবে, গান গাইবার সময় তাহার স্বর যেন সমোচ্চ, নমনীয় ও শ্রুতমধুর হয়। বিভিন্ন সুরের মিশনে গান শ্রুতিমধুর হয় কিনা, তাল ভাঙ্গে কি না, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন সেটা ধরিতে পারে তাহা হইলেই হইল। এত অল্প বয়সে নাটক বা যাত্রার গান গাইবে বা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির গান অনুকরণ করিয়া ঠিক তদনুরূপ গাইবে এই আশা করিও না। তাহার পক্ষে কোনও বাক্য গান না করাই ভাল। যদি বাক্যই গান করিতে হয় তবে তাহার জন্য তাহার উপযোগী করিয়া সহজ কথায় নিবদ্ধ এবং সরল ভাবপূর্ণ গান রচনা করিয়া দিতে হইবে।

আস্বাদ জ্ঞান।

বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয় বোধের মধ্যে আস্বাদ জ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আস্বাদ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ সাধারণতঃ আমাদের খাদ্য ও পানীয়। উহা আমাদের দেহের অংশ স্বরূপ হইয়া পড়ে। আর দর্শন শ্রবণাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গোচর পদার্থের অধিকাংশ আমাদিগের দেহের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত থাকে। সুতরাং আস্বাদ জ্ঞানকে নির্ভুল করার উপর আমাদিগের ইষ্ট সমধিকতর রূপে নির্ভর করে। দর্শন শ্রবণ বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর সহস্র সহস্র বিষয়ের সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি কিন্তু আস্বাদ জ্ঞান গোচর কোন কিছুর উপর আমাদের ঔদাসীন্য নাই। কল্পনা ও অনুকরণ প্রবৃত্তি

দর্শণ, শ্রবণ ও স্পর্শ জনিত অনুভূতিকে একটা নৈতিক ভাব প্রদান করে বটে কিন্তু আস্বাদ জ্ঞান লব্ধ অনুভূতির উপর উহাদের কোনও ক্রিয়া নাই বলিলেই হয়। সুতরাং আস্বাদ জ্ঞানকে সর্ব্বথা দৈহিক ও জড়ভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায় যাহারা দয়া, ভালবাসা, কাম ও ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল মনোবৃত্তিগণের অত্যন্ত অধীন এবং যৎসামান্য কিছুই যাহাদের মনোরাজ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ জ্ঞান তীক্ষ্ণ থাকে বটে কিন্তু আস্বাদ জ্ঞান তীক্ষ্ণ থাকে না। ইহা হইতেই আপাততঃ মনে হয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় রসনেন্দ্রিয়ের স্থান অনেক নীচে আর ইহার প্রশ্রয় দেওয়াটা বড় হীন কার্য্য। কিন্তু আস্বাদ জ্ঞানের প্রাগুক্ত বিশেষত্ব হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে শিশুগণকে যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে তাহাদিগের আস্বাদ জ্ঞানের সাহায্য লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। শিশু দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে হইলে তাহার আত্মশ্লাঘা বৃত্তির উদ্রেক করা অপেক্ষা লোভ প্রবৃত্তির উদ্রেক করিলেই অধিকতর ফল হইবে। কারণ, লোভ প্রবৃত্তিটা স্বাভাবিক এবং উহা এক জাতীয় ইন্দ্রিয় বোধের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নির্ভর করে। আর আত্মশ্লাঘা অভিমত হইতেই উৎপন্ন হয়। মানুষের কতকগুলি খেয়াল আছে উহা যুক্তির ধার ধারে না এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়। আত্মশ্লাঘা উক্ত খেয়ালের উপর নির্ভর করে। সুতরাং পদে পদে উহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। লোভ বাল্যকালোচিত প্রবৃত্তিই বটে। অন্য কোন প্রবৃত্তি উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারে না। মনে একটা সামান্য কিছুর উদয় হইলেই ইহা অন্তর্হিত হয়।

স্থির জানিও বালকের লোভ অতি শীঘ্রই লোপ পাইবে। অন্তঃকরণে একবার বিবিধ মনোবৃত্তি জাগরিত হইলে রসনা তৃপ্তির জন্য

আর সে ব্যস্ত থাকিবে না। প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার মনকে নানাবিধ প্রবৃত্তি আসিয়া লোভের গণ্ডী হইতে অহঙ্কারের দিকে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে। কারণ অহঙ্কার অন্যান্য সকল প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া আপনার কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। যাহারা অত্যন্ত লোভ পরবশ তাহাদের আচার ব্যবহার আমি সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। তাহরা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবামাত্র সারাদিন কোন সময়ে কি খাইবে তাহাই চিন্তা করে — তাহারা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আহারের বর্ণনা করে যে দক্ষ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কোনও প্রসিদ্ধ যুদ্ধের বর্ণনা তেমন করিয়া করিতে পারিবে না। আমি সর্ব্বদাই দেখিয়াছি তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হইলেও তাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের শ্রেণীতে কখনও উঠিতে পারে না — ৪০ বৎসর বয়স্ক বয়সেও বালকই থাকে কখনও চরিত্রগত দার্ঢ্য বা তেজস্বিতা লাভ করিতে পারে না। যাহাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড নাই তাহারাই এই পাপ প্রবৃত্তির পরবশ থাকে। ভোজন-বিলাস ব্যক্তিগণের আত্মা যেন তাহাদের রসনাতেই অবস্থিত। তাহারা নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য; শুধু খাইবার জন্যই যেন তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভোজনালয়ই তাহাদিগের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। বিভিন্ন ভোজ্য দ্রব্যের আস্বাদের তারতম্য ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের মতের কোন মূল্য নাই।

যে বালকের ভিতরে কোনও কার্য্য করিবার উপযোগী ক্ষমতা নিহিত আছে তাহার চরিত্রে লোভ বদ্ধমূল হইবার আশঙ্কা নাই। বাল্যকালে আমরা শুধু খাওয়ার কথাই ভাবি বটে কিন্তু যৌবনাগমে আর উক্ত বিষয় মোটেই ভাবি না। তখন সর্ব্বপ্রকার খাদ্যই আমাদের মুখে ভাল লাগে। তখন রসনা তৃপ্তি ব্যতীত অন্য বহু বিষয় আমাদের মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসে। বাল্য বয়সে লোভ প্রবৃত্তির দোষক্ষালন কল্পে আমি এই পর্য্যন্ত অনেক কথা বলিয়াছি। কিন্তু আমার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে নির্ব্বিচারে এমন হীন প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া

হউক। বালক কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল তজ্জন্য পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে মুখ-রোচক একটা খাদ্য দিতে হইবে ইহাও আমার মত নয়। তবে আমার কথা এই — বাল্যকাল খেলা ধূলা ও লম্ফ ঝম্পেরই কাল — এই বয়সে সর্ব্বথা শারীরিক ব্যায়ামসাধ্য কোন কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড় পদার্থ বিশেষ অর্থাৎ রসনার তৃপ্তিকর কোন২ ভোজ্য দ্রব্য দিলে ক্ষতি কি? মের্জকাদ্বীপের অধিবাসী একজন বালক দেখিতে পাইল একটা বৃক্ষের অগ্রভাগে একটি ঝুঁড়ি রহিয়াছে। সে দক্ষতার সহিত একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ঝুড়িটাকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। এই শ্রমসাধ্য কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একদিন সকাল বেলায় বেশ চর্ব্ব্য, চোষ্য ভোজন করিতে দিলে ক্ষতি কি? স্পার্টার একটি বালক, ধরা পড়িলে শত বেত্রাঘাত ভোগের ঝুকিটা আপন স্কন্ধে লইয়া চুপে চুপে রন্ধনাগারে প্রবেশ করিল এবং তথা হইতে একটি জীবিত শৃগাল শাবক চুরি করিয়া লইয়া পলাইল। শাবকটি নিজের কোটের নীচে রাখিয়া দিয়াছে তাই উহা বালকের গায়ে কত আঁচড় কাটিল তাহাতে বালকের উদরে রক্তপাতও হইল। কিন্তু পাছে ধরা পড়ে বা লজ্জা পায় এই ভয়ে বালক উক্ত আঁচড়ের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিল। সে একটুকু কাঁদিল না, তাহার ভ্রূটি পর্য্যন্ত কুঞ্চিত হইল না। এতদবস্থায় যে শাবকটি তাহাকে খাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বালককে সেই শাবকটি খাইতে দেওয়া উচিত নয় কি?

কোন সৎকার্য্যের পুরস্কাররূপে বালককে সুখাদ্য দিতে হইবে না সত্য কিন্তু সে যদি উক্ত খাদ্য লাভ করিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে তবে মধ্যে মধ্যে তাহাকে উহা দিব না কেন?

সময় সময় খাদ্য দিয়া বালককে সুখী করিতে হইবে তাই বলিয়া খাদ্য যে সাদাসিধে না হইয়া অতিশয় সুরস হইবে তাহা বলিতেছি না।

বালকের ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করাই কর্ত্তব্য, তাহার ক্ষুধা নাই অথচ বিবিধ মুখরোচক খাদ্যের প্রলোভনে উহাকে জাগ্রত করিতে হইবে ইহা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া বালকের ভোজন বিলাসিতা বাড়াইয়া লইয়া থাকি। নতুবা অতি সামান্য খাদ্য দ্বারাই তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। বালক উত্তরোত্তর ক্ষিপ্রবেগে বাড়িয়া উঠে এই জন্য তাহার ক্ষুধা সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। প্রবল ক্ষুধা থাকে বলিয়াই সমুদয় খাদ্যই তাহার নিকট উপাদেয় বোধ হয়— মুখরোচক কোন আহার্য্যের প্রয়োজন হয় না। কিছু মিষ্ট দ্রব্য দিয়া একদল বালককে কত জায়গা ঘুরাইয়া আনিতে পারা যায়। তাহাতে বিবিধ মসলা সংযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয় না এবং তাহাদের রসনার অত্যধিক প্রশ্রয়ও দেওয়া হয় না।

বালকগণ যদি সাদাসিধে খাদ্য খাইতেই অভ্যস্ত হইয়া থাকে তবে ভয়ের কথা নাই। তাহাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে দৌড়াইতে, লাফাইতে এবং খাইতে দেও। যে প্রকার খাদ্যই দেওনা কেন তাহারা কখনই অতিরিক্ত ভোজন করিবে না অথবা তাহাদের অজীর্ণতা রোগে ভুগিতে হইবে না। পক্ষান্তরে যদি তুমি তাহাদিগকে বহুক্ষণ না খাওয়াইয়া রাখ তবে যেই তোমার দৃষ্টি একটুকু সরিয়া সরিয়া যাইবে অমনি তাহারা একেবারে ভরপূর ভোজন করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য যতদূর পারে নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যদি কেবল প্রকৃতির নিয়ম মানিয়াই চলি তবে কখনও অতিরিক্ত ভোজনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আমরা করি কি? খাদ্য বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা লইয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি। আজ এক ব্যবস্থা করিতেছি কাল আবার উহাতে আর একটা যোগ করিতেছি, আবার উহাকে কাটিতেছি, ছাটিতেছি— মাপ কাঠি দিয়া সব মাপি, নিক্তি দিয়া সব ওজন করি। ইহা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে

আমাদিগের পরিপাক ক্ষমতার পরিমাপ করা হয় না। কেবল আমাদের অযৌক্তিক বাসনারই পরিমাপ হইয়া থাকে। গ্রাম্য গৃহস্থগণের ভাণ্ডার ঘর ও ফলের বাগান সর্ব্বদাই খোলা থাকে। অথচ কি বালক কি বৃদ্ধ কেহই অজীর্ণতা কি তাহা জানে না। ইহা আমার যুক্তির অনুকূল দৃষ্টান্ত নয় কি?

প্রকৃতির হাতে ১০।১২ বৎসরের বালক।

আমি যে প্রণালীর কথা বলিতেছি উহাই প্রকৃতির অনুমোদিত প্রণালী আর উহার প্রয়োগেও আমি কোন ভুল করি নাই — এই কথা মানিয়া লইলে দেখা যাইবে আমার ছাত্র ইন্দ্রিয় বোধ ও বাহ্য জ্ঞানের রাজ্য ছাড়াইয়া বালোকচিত বিচারের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার পরেই বয়স্ক মানবের সোপান। কিন্তু জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। বাল্য যৌবন প্রভৃতি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। উহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অনুরূপ একটা পূর্ণতা ও পক্কতা আছে। পূর্ণবয়স্ক মানব বলিয়া একটা কথা আমরা অনেক সময় শুনিয়া থাকি, তাহার বিশেষত্ব কি তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকি কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত বাল্যাবস্থার কথা ও আলোচনার উপযুক্ত বিষয়। তাহা আলোচনা করিলে আমরা অনেক অভিনব বিষয় জানিতে পারিব এবং তাহাতে অনেক আনন্দও পাইব।

সান্তজীবের জীবন এত নীরস ও সীমাবদ্ধ যে কেবল বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ মোটেই উঠে না। কল্পনা নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াই বাস্তব জগতের প্রত্যেক বস্তুকে মধুর করিয়া তোলে। তাহা না হইলে শুধু বস্তু হইতে আমরা যে সুখ পাইতে পারিতাম তাহা অতি সামান্যই হইত। তদ্দ্বারা কেবল

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হইত, হৃদয়ের একটুকুও প্রফুল্লতা বিধান ঘটিত না। ধরিত্রী দেবী হেমন্তকালে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সম্পদে ভূষিতা হন্ তাহা নয়নানন্দকর হয় বটে কিন্তু কোনও কোমল হৃদবৃত্তি জাগাইতে পারে না। এই আনন্দোৎপাদনে চিন্তার কার্য্যকারিতা যতটা আছে ভাবের খেলা ততটা নাই। আবার বসন্তকালের কথা ভাবিয়া দেখ — তখন প্রকৃতির প্রায় নগ্নাবস্থা — অরণ্যে প্রবেশ কর একটুকু ছায়া পর্য্যন্ত পাইবে না – শ্যামল পত্র পুষ্পাদি কেবল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি এই দৃশ্যে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পর্য্যন্ত একটা সাড়া পড়ে। প্রকৃতি আবার জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইয়া আমরাও ভিতরে ভিতরে একটা নবজীবন প্রবাহ অনুভব করি। কল্পনা সম্ভূত কত শত প্রীতিপ্রদ চিত্র আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আসিয়া দেখা দেয়। আমোদ প্রমোদের সাথীদের কথা চিত্তে ভাসিয়া উঠে; সুকুমার হৃদবৃত্তি নিচয় সঞ্জাত আনন্দাশ্রুতে নয়ন-যুগল ভরিয়া উঠে। অথচ বসন্তকালে প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্য্যায়ক্রমে যে যে দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হয় সেইগুলি জীবন্ত এবং প্রীতিকর হইলেও হর্ষাশ্রু উদ্রেকক্ষম নহে। হেমন্তে ও বসন্তে তবে এই পার্থক্য কেন? তাহার কারণ এই যে বসন্তকাল সুলভ প্রকৃত দৃশ্যের সঙ্গে কল্পনা তৎপরবর্ত্তী ঋতুগণ সুলভ অনেক দৃশ্য যুড়িয়া দেয়। বসন্তকালে গাছে গাছে দেখা যায় শুধু কোমল কোরক। কিন্তু কল্পনার বলে উহারই সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই ফুল, ফল, নিবিড় পত্রবিজড়িতছায়া, এবং মাঝে মাঝে, উহাদেরই মধ্যে লুক্কায়িত আরও কত কি রহস্য। একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের মধ্যে কল্পনা সারা বৎসরের ঋতুরাজি আনিয়া ফেলে। ভবিষ্যতে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা যাহা ঘটিবে কল্পনা তাহা ততটা দেখে না। কিন্তু যাহা যাহা দেখিতে তাহার সাধ যায় তাহাই বেশী করিয়া দেখে। পক্ষান্তরে হেমন্তকালে শুধু বাস্তব অবস্থা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তখন

বসন্তকালের কথা চিন্তা করিতে গেলে দুরন্ত শীতের চিন্তা আসিয়া পরিপন্থী হইয়া দাড়ায় আর বরফ ও হিমানীর চাপে পড়িয়া আড়ষ্ট হইয়া কল্পন ইহধাম পরিত্যাগ করে। সুকুমার বালকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা একপ্রকার নিরতিশয় নির্ম্মল আনন্দলাভ করি। কিন্তু পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া সেই আনন্দ পাই না। ইহার কারণ এবং পূর্ব্বোক্ত হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুর পার্থক্যের কারণ উভয়ই এক। যদি পূর্ণবয়স্ক কোনও ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া কখনও ঐরূপ সুবিমল আনন্দ অনুভব করি তাহারও বিশেষ কারণ থাকে — উক্ত ব্যক্তির গত জীবনের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য আমাদিগের মনে জাগাইয়া দিয়া স্মৃতি তাহার বাল্যকালেরই একটি চিত্র আমাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করে। আমরা যদি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, অথবা তাহার ভাবী বৃদ্ধাবস্থার কথা চিন্তা করি তবে বার্দ্ধক্য সুলভ ক্রমাবনতির চিন্তা আমাদের আনন্দকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কাহাকেও ক্ষিপ্রবেগে মৃত্যুর সন্নিহিত হইতে দেখিলে আনন্দ আসিতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহা পড়ে তাহাই বিকট, নীরস ও অবসাদজনক হইয়া উঠে।

কিন্তু আমি যখন দশম কি দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক সুস্থ, সবল ও হৃষ্টপুষ্ট বালকের কথা কল্পনা করি তখন আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার জীবনের কি বর্ত্তমান কি ভাবী অবস্থা এই উভয়বিধ চিন্তাই আনন্দপ্রদ। দেখিতে পাই সে প্রফুল্ল ও জীবন্ত, তাহার চলাফেরা ও কথাবার্ত্তা তেজস্বিতা ব্যঞ্জক, সে দেহক্ষয়কর দুর্ভাবনা হইতে বিমুক্ত, বর্ত্তমানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেই আত্মহারা জীবন তাহার কাছে এত মধুময় যে সম্ভোগ করিয়া যেন ফুরাইতে পারিতেছে না। তাহার ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধিবৃত্তি, শারীরিক তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে তাহাকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবে তাহাও আমি যেন আমার

চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই। তাহার বাল্যাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমোদ পাই, আবার অদূর ভবিষ্যতে তাহার পূর্ণ বয়স্কতার কথা কল্পনা করিয়া আমোদের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। তাহার দেহের জ্বলন্ত শোণিত প্রবাহ যেন আমার শীতল শোণিতকেও উষ্ণ করিয়া তোলে — তাহার জীবন্ত ভাবে আমিও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠি। তাহার যুবজনোচিত স্ফূর্ত্তির কথা চিন্তা করিয়া আমি যেন যৌবন ফিরিয়া পাই। তাহার আকার, আচার ব্যবহার ও বদনমণ্ডল সবই আভ্যন্তরীণ আত্ম-প্রত্যয় ও সন্তোষের পরিচায়ক। স্বাস্থ্য তাহার মুখমণ্ডলেই দেদীপ্যমান। তাহার দৃঢ় পদবিক্ষেপই সবলতার পরিচায়ক। তাহার বর্ণ এখনও সুকুমার বটে কিন্তু স্ত্রীজন-সুলভ কোমল নহে। সে অবাধে খোলা বাতাসে ও সূর্য্যাতপে থাকে বলিয়া তাহার গাত্রবর্ণে একটা পুরুষোচিত ভাব আসিয়াছে। তাহার নয়ন এখনও মনোবৃত্তি নিচয়ের উত্তেজনায় দীপ্তিশালী হইয়া উঠে নাই; তাই উহা এখনও নৈসর্গিক স্থৈর্য্য ও শান্তি পরিপূর্ণ। শোক দুঃখের ভারে এখনও উহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে নাই। অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে এখনও তাহার গণ্ডদেশে রেখা পাত হয় নাই। তাহার গতি ক্ষিপ্র ও নিঃসন্দিগ্ধ। ইহা দ্বারা তাহার স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা প্রিয়তাই সূচিত হয়। সে যে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক ব্যায়াম করিয়াছে ইহা তাহারও সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহার বাহ্য আচার ব্যবহারে নির্ভীক সবলতার ভাব আছে কিন্তু ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কারের চিহ্ন নাই। তাহার চক্ষু পুস্তকের পাতায় লাগিয়া থাকে না আর সে হেঁটমুখও নহে। তাহাকে মাথা তোলিতে বলিতে হয় না কারণ ভয় বা লজ্জা তাহাকে এখনও স্পর্শ করে নাই।

হে ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা এই বালককে আপনাদের কাছে লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। তাহাকে অবাধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। সে বৃথা কথা বা অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত

তাহার স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা বিচার ক্ষমতা অধিকতর। সে কেবল এক ভাষাতেই কথা বলিতে জানে কিন্তু সে না বুঝিয়া কোন কথা বলে না। হয়ত অন্যান্য বালকের মত তত ভাল করিয়া সে কথা বলিতে পারে না কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা তাহার কার্য্যকুশলতা অনেক বেশী।

সে চিরাচরিত প্রথা বা ধরাবাঁধা নিয়মের ধার ধারে না। কল্য একটা কাজ করিয়াছে বলিয়া আজও যে সেই কাজ করিতে হইবে এ নিয়ম সে মানে না। অমুক বড় লোক ইহা বলেন বা করেন, সুতরাং নির্ব্বিচারে ইহা করিতেই হইবে এই যুক্তি সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। তাহার বয়সে যাহা যাহা বলা বা করা স্বভাবসিদ্ধ সে কেবল তাহাই করে বা বলে। অতএব তাহার নিকট ধরাবাঁধা বুলি বা কৃত্রিম সৌজন্য সূচক ব্যবহারের আশা করিও না। কিন্তু নিশ্চিত জানিও সে যাহা চিন্তা করে তাহাই সোজাসোজি সরল ভাষায় প্রকাশ করিবে এবং তাহার বাহ্য আচরণ স্বীয় প্রবৃত্তিনিচয়ের অনুগামী হইবে।

যে সকল বিষয়ের উপর তাহার নিজের সুখ দুঃখ নির্ভর করে সেই সব বিষয়ে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ধারণা সামান্য রকমের আছে; কিন্তু অন্যান্যের সহিত ব্যবহারে কি ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহার সে ধারণা নাই। সে যখন সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও নামিবার উপযুক্ত হয় নাই তখন সে উক্ত ধারণা দিয়া করিবে কি? তাহার নিকট স্বাধীনতার কথা বল, কে কোন্ দ্রব্যের মালিক বা কেন তাহা বল, এমন কি সর্ব্বসাধারণের সম্মতি অনুসারে যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহাদের কথা বল সে তাহা বুঝিতে পারিবে। কতকগুলি জিনিষের মালিক সে কেন হইল এবং অন্যান্য জিনিষের মালিক সে কেন নয় এই পর্য্যন্তই সে বুঝিতে পারিবে। ইহার বাহিরে সে কিছু জানে না।

করিবে বলিয়া আশঙ্কা করিবেন না। সে আপনাদের সমস্ত সময় বৃথা নষ্ট করিবে ও তাহাকে এড়াইতে পারিবেন না বলিয়া ভয় করিবেন না। সে অলঙ্কারবিহীন ও আত্মস্তবিতা বিহীন হইয়া সরল মনে অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বাভাবিক ভাবে আপনাদের কাছে কথা বলিয়া যাইবে। তাহার চিন্তার বা কার্য্যের কথা আপনাদের নিকট বলিতে বসিয়া সে ভাল মন্দ দুইই বলিয়া ফেলিবে। উহাতে আপনারা কি মনে করেন তাহা তাহার মনে মোটেই আসিবে না। কোন কথা বলা মাত্র প্রথমই যে অর্থ প্রতীত হয় সে সেই অর্থে সোজাসুজি ভাবে আপন কথা বলিয়া যাইবে।

সাধারণতঃ বালকেরা আপাত প্রতীয়মান বুদ্ধ্যুৎকর্ষ প্রতিপাদক এক একটি কথা বলিয়া থাকে, আর আমরা আনন্দের সহিত বলি এই বালক কালে বেশ বুদ্ধিমান হইবে। আবার তাহার কিছুকাল পরে সেই বালকই অর্থবিহীন শব্দরাশি উদ্গিরণ করিতে থাকে। তাহা শুনিয়া আবার দুঃখের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু আমার ছাত্র শ্রোতার হৃদয়ে এমন আশার সঞ্চারও করিবে না এবং হতাশার দুঃখও আনিবে না। কারণ সে বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলিবে না এবং অন্যে যাহা শুনিবে না এমন নিরর্থক কথা বলিয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয়ও করিবে না। তাহার চিন্তা বড়ই সীমাবদ্ধ। কিন্তু উক্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কোথাও অন্ধকার বা ছায়া নাই। সকলই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তাহার কিছু মুখস্থ নাই বটে। কিন্তু সে নিজে দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিয়াছে। সে অন্যান্য বালকের মত ভাল করিয়া পুস্তক পড়িতে পারে না বটে কিন্তু প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা তাহার অনেক অধিক। অন্যান্য বালকের মত তাহার মনটা জিহ্বাগ্রভাগে অবস্থিত নহে কিন্তু উহা মস্তিষ্কে অবস্থিত।

যদি তাহার কাছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও বশ্যতা সম্বন্ধে কিছু বল সে উহা মোটেই বুঝিবে না। তাহাকে কিছু করিতে আদেশ কর সে তাহা বুঝিবে না। কিন্তু যদি বল "হে বালক আজ যদি তুমি আমাকে এই কাজটুকু করিয়া দাও ভবিষ্যতে আমি তোমার উপকার করিব।" তবে সে তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবে, কারণ সে তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত এবং বুঝিতে পারে যে তোমায় উপকার করিলে তুমি চিরকালের জন্য তাহার বাধ্য হইয়া রহিলে। সম্ভবতঃ তোমার কিছু উপকার করিতে পারিলে তাহার মর্য্যাদা বাড়িবে এই চিন্তা করিয়াও সে সুখ বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু সে যদি শেষোক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তোমার উপকার করিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে শিক্ষার প্রকৃতি সিদ্ধ পথ হইতে সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, আর তুমি অহঙ্কারের কবল হইতে তাহার সম্যক্ রক্ষা বিধান করিতে পার নাই।

তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সর্ব্বপ্রথমে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহারই সাহায্য প্রার্থনা করিবে তা সে রাজাই হউক আর সামনা মুটেই হউক। তাহার কাছে এই ক্ষেত্রে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই।

তাহার প্রশ্ন করিবার ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার বেশ জ্ঞান আছে যে তুমি তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে দায়ী নও। সে জানে তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমার পক্ষে অনুগ্রহের কার্য্য। আর তুমি দয়াপরবশ হইয়াই সে অনুগ্রহ করিতে যাইতেছ। তাহার কথাবার্ত্তা সরল ও সংক্ষিপ্ত। তাহার কণ্ঠস্বর, চেহারা ও অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সে অন্যের অনুরোধ রক্ষা করিতে এবং অগ্রাহ্য করিতে তুল্য অভ্যস্ত। উহাতে ক্রীতদাসোচিত তোষামোদ মাখান বশ্যতার ভাবও নাই, আর প্রভুজনোচিত ঔদ্ধত্য এবং কর্কশ স্বরও নাই, কিন্তু আছে মানব জাতির প্রতি একটা বিশ্বাসের ভাব

উদার ও হৃদয়স্পর্শী ভদ্রতার ভাব। স্বাধীন অথচ অনুভূতিপ্রবণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির স্বাধীন ক্ষমতাশালী ও সদয় ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে যাইয়া যে ভাব হওয়া স্বাভাবিক তাহার আছে সেই ভাব। তুমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলে সে তোমাকে ধন্যবাদ দিবে না বটে কিন্তু মনে মনে বুঝিবে যে তুমি তাহাকে অনুগৃহীত করিয়া রাখিলে। আর যদি তুমি তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য কর সে তজ্জন্য আক্ষেপ করিবে না এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেই থাকিবে না কারণ সে জানে যে তাহাতে কিছু লাভ নাই। সে বলিবে না "আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না," কিন্তু বলিবে "আমার অনুরোধ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইল।" কেহ আমাকে একটা কাজ করিতে অনুরোধ করিলে আমি যদি তাহার নিকট স্বীকার করি যে উহা রক্ষা করা আমার সাধ্য নয় তবে সে আমার উপর রাগান্বিত হয় না।

তাহাকে আপন মনে স্বাধীন ভাবে চলিতে দেও — কোন কথা বলিও না। সে কি করে এবং কি ভাবে করে তাহার পর্য্যবেক্ষণ কর। সে যে স্বাধীন তাহা সে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। তাই সে একেবারে খেয়াল না করিয়া কোন কাজ করেনা অথবা সে কাজ করিতে পারে শুধু এইটুকু দেখাইবার জন্যও কোন কাজ করে না। সে সর্ব্বদা সতর্ক ও কর্ম্মঠ। সকল কার্য্যেই তাহার বাল্যকালোচিত ক্ষিপ্রকারিতা আছে। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সে কোনও কাজ করে না। তাহার যাহাই ইচ্ছা হউক না কেন, সে যাহা করিতে সমর্থ নহে তেমন কাজে হাত দেয় না কারণ সে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছে যে তাহার বলের পরিমাণ ঠিক কত। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করে তাহার অবলম্বিত উপায় উক্ত উদ্দেশ্যের উপযোগীই হইয়া থাকে। কোনও কার্য্যে কৃতকাম হইতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় না হইয়া সে

প্রায়ই সে কার্য্যে ব্রতী হয় না। সে যাহাই দেখুক না কেন অতি মনোযোগের সহিত দেখে এবং দৃশ্যমান বস্তুর দোষ ও গুণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকে। যাহা কিছুই তাহার দৃষ্টিপথে পড়ুক না কেন তৎ-সম্বন্ধে নির্ব্বোধের মত কেবল কতকগুলি প্রশ্ন করিতে থাকা তাহার স্বভাব নয়। কোনও প্রশ্ন মনে উদিত হইলে স্বয়ং উহার উত্তর বাহির করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা না করিয়া সে অন্যকে উহা জিজ্ঞাসা করে না। কার্য্য করিতে বসিয়া অতর্কিত ভাবে কতকগুলি বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে অন্য বালকের মত বিরক্তিবোধ করে না এবং সহসা কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে সে অন্য বালকের মতন ভীত হয় না। তাহার সুপ্ত কল্পনা এখনও চেষ্টা করিয়া জাগ্রত করা হয় নাই। সুতরাং সে কোনও বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া দেখে না, যাহা হইতে ঠিক যতটুকু বিপদের সম্ভাবনা তাহাই বুঝিতে পারে, সুতরাং বিপদে আত্মহারা হইয়া পড়ে না। অপ্রতিবিধেয় বাধা বিঘ্নের কাছে তাহাকে ইতিপূর্ব্বে অনেক বার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে অতএব বিপদে পড়িলে সে আর কাঁদাকাটি করিয়া অস্থির হয় না। অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক শক্তির নিকট জন্মাবধি মস্তক পাতিয়া দিতে দিতে সে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং যে বিপদ্ই উপস্থিত হউক না কেন, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকে।

তাহার কাছে খেলা ও কার্য্য দুইই সমান। সে এতদুভয়ের মধ্যে কোন ও পার্থক্য দেখিতে পায় না। সে প্রত্যেক কার্য্যই নিরতিশয় আগ্রহের সহিত এবং অবাধে করিতে আরম্ভ করে। তাহা হইতেই তাহার মনের টান এবং জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। এই বয়সের বালক বিমল সন্তোষ প্রদীপ্ত ও হাসিভরা মুখে কত গুরুতর বিষয় লইয়া খেলা করে। আবার কত ২৫ সামান্য আমোদ জনক বিষয়ে কেমন গুরুগম্ভীরভাবে নিযুক্ত হয়! এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছেন?

সে বাল্যকালের পরিপক্কাবস্থায় পৌছিয়াছে — পূর্ণ বিকাশ পাইতে তাহার সুখভোগ পরিহার করিতে হয় নাই। কিন্তু সুখভোগের ভিতর দিয়াই তাহার বাল্যজীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

প্রকৃতি তাহাকে যতটা স্বাধীনতা ও সুখ ভোগ করিতে দিয়াছেন তাহা সে করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বয়সে যতটা বিচার শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব তাহাও সে করিয়াছে। যদি এই সুকুমার বয়সে আমাদের সকল আশা ছিন্ন করিয়া যম তাহার উপর কঠোর দণ্ড চালনা করিয়া বসে তবে তাহার মৃত্যুর জন্য, কিম্বা তাহার বিগত জীবনের জন্য আমাদিগের অনুশোচনা করিবার কারণ থাকিবে না। আমরা তাহার দুঃখের বোঝা গুরু করিয়াছিলাম — এই স্মৃতি আমাদিগের শোকাবেগ বাড়াইতে পারিবে না। আমাদের এই কথা বলিবার অবসর থাকিবে যে অন্ততঃ যে কয়টা দিন সংসারে ছিল তাহা সে সুখেই কাটাইয়াছে — প্রকৃতি তাহাকে যে সুখটুকু সম্ভোগ করিতে দিয়াছিলেন আমরা তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করি নাই।

আমার প্রস্তাবিত বাল্যকালোচিত শিক্ষা প্রণালীর অসুবিধা এই যে দূরদর্শী ব্যক্তি ব্যতীত ইহার সারবত্তা, আর কেহ বুঝিতে পারে না এবং এই প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত বালক সাধারণ দর্শকের চক্ষে একটা অপদার্থ বলিয়া গণ্য হয়।

শিক্ষক সাধারণতঃ ছাত্রের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের স্বার্থ লইয়াই অধিকতর ব্যস্ত। তিনি প্রমাণ করিতে চান যে শিক্ষাকার্য্যের ভার লইয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও বৃথা অতিবাহিত করেন নাই — কাজেই তাহার তাহাতে ন্যায্য দাবী আছে। তিনি ছাত্রকে এমন কতকগুলি বিষয় শিখাইয়া দেন যে প্রয়োজন হইবামাত্র অন্যের সমক্ষে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। সেইগুলির প্রকৃত পক্ষে কোন উপকারিতা আছে কিনা তাহা দেখেন না — কেবল উপর চটক থাকিলেই হইল। গুণাগুণ

বিচার না করিয়া অনেকগুলি অসার বিষয় শিখাইয়া বালকের স্মৃতি শক্তি ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন। পরীক্ষার সময় শিক্ষক ছাত্রকে সেই সব অসার বস্তুর প্রদর্শনী খুলিতে সাহায্য করেন আর পরীক্ষকের মনস্তুষ্টি বিধানান্তর দোকান পসার গুটাইয়া চলিয়া যান।

আমার ছাত্র সম্পদ্ বিহীন। প্রদর্শনী খুলিবার মতন তাহার কিছুই নাই। আপনাকে ছাড়া তাহার দেখাইবার আর কিছু নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের গুণাগুণ যত সহজ অন্যে দেখিতে পায় বালকের গুণাগুণ তত সহজ দেখিতে পায় না। এমন দ্রষ্টা কে আছেন যে দৃষ্টিপাত মাত্র বালকের বিশেষত্বগুলি ধরিয়া ফেলিতে পারেন? তেমন দ্রষ্টা একবারে নাই তাহা নহে। তবে তাহাদের সংখ্যা অতি কম। শত সহস্র জনকের মধ্যেও তেমন লোক একজন আছেন কিনা সন্দেহ।

দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালকগণের শিক্ষা এই তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয়। বয়সের অনুপাতে জীবনের এই ভাগেই মানুষের বল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী থাকে এবং এই সময়টার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। ইহাই পরিশ্রম ও অধ্যয়নের কাল। তাই বলিয়া এই সময়ে সর্ব্ববিধ বিষয় অধ্যয়ন করাইতে হইবে না। যে যে বিষয় বালক প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করে কেবল সেই সকল বিষয়েরই অধ্যাপনা করিতে হইবে। যে যে বস্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মঙ্গলজনক তাহা নির্ণয় করিয়া উহাদিগেরই অনুসন্ধান করা বালকের একমাত্র কার্য্য। শিক্ষকও সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্ব্বক ছাত্রকে তাহা নির্ণয় ও অনুসন্ধান করিতেই সাহায্য করিবেন। ইতিহাস এই বয়সের উপযোগী বিষয় নহে। এই বয়সে নৈসর্গিক ঘটনাবলীই বালকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে এই জন্য সে নৈসর্গিক ঘটনাবলী পাঠ করিতে নিযুক্ত হয় এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞান তাহার অনেক বাধা বিঘ্ন

দূর করে। সে নিজে নিজে অনেক যন্ত্র প্রস্তুত করে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে অনেক যন্ত্র উদ্ভাবনও করে।

বালক তাহার অবলম্বনীয় পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে না — তাহার নিজের বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হয় সেই পথই অনুসরণ করে। নির্জ্জন দ্বীপস্থ "রবিন্‌সন্ ক্রুশোই" তাহার আদর্শ স্থানীয় হয় এবং রবিন্‌সন্‌ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামক পুস্তকই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পুস্তক। তাহার কোন না কোন প্রকার হস্তশিল্প শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার এক প্রয়োজন এই যে ভবিষ্যতে তাহার কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে তাহার যখন ঠিক নাই অতএব এই শিক্ষা তাহার জীবিকা অর্জ্জনের সাহায্য করিতে পারে। আর উহার অন্য প্রয়োজন এই যে এই শিক্ষার বলে সে সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবে — নিষ্ক্রিয়তা হেতু জীবন কখনও ভার বোধ হইবে না।

শরীর চালনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতেও একটা অনুরাগ জন্মে। তজ্জন্য মনও বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ভবিষ্যতে বড় বড় বিষয় অধ্যয়নে যোগ্যতার পথ প্রস্তুত হয়। জীবনের এই ভাগ শেষ হইলেই বাল্যকালের অবসানও যৌবনের আরম্ভ হয়।

অধ্যয়নের বয়স।

যৌবনারম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষকে মোটের উপর দুর্ব্বল ও পরবশ বলা যাইতে পারে সত্য কিন্তু জীবনের এই ভাগেও এমন একটি সময় আসে যখন অভাবাদি মোচনের জন্য যতটুকু দরকার বলের পরিমাণ তদপেক্ষা অধিকতর হইয়া পড়ে। এবং বিবৃদ্ধমান্ মানব শুধু বলের পরিমাণ হিসাবে দুর্ব্বল থাকিলেও আপেক্ষিক সবলতা লাভ করে। তাহার স্বাভাবিক অভাব সমূহ এখনও পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয় না।

তাহার বর্ত্তমান বল বর্ত্তমান অভাব সমূহ পূরণ করিয়াও উদ্বৃত্ত হয়। সুতরাং পূর্ণ বয়স্ক মানবত্বের মাপ কাঠিতে তাহাকে দুর্ব্বল বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু বালকত্বের হিসাবে সে খুবই সবল।

এই যে মানুষের দুর্ব্বলতার কথা বলিলাম উহার মূল কি? বাসনা এবং পরিপূরণের শক্তি এতদুভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যই উক্ত দুর্ব্বলতার কারণ। প্রবল প্রবৃত্তি নিচয় আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। তাহার কারণ এই যে উহাদের চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য আমাদের স্বাভবিক শক্তি অপেক্ষাও অধিকতর শক্তির প্রয়োজন হয়।

অতএব আমাদিগের বাসনা যত কমিয়া যায় আমরা ততই অধিকতর বলশালী হইয়া পড়ি। বাসনা যাহা যাহা চায় তাহা তাহা পূরণ করিবার পরও যদি অন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে তবেই বুঝিতে হইবে কিছু উদ্বৃত্তশক্তি আছে সুতরাং ঈদৃশ লোক বাস্তবিকই বলশালী। বাল্যকালের তৃতীয় স্তরেই এই অবস্থা ঘটে — এইক্ষণ আমরা এই তৃতীয় স্তরের কথাই আলোচনা করিতে যাইতেছি। ইহা যৌবনোদ্গমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কাল। ইহাকে কৈশোরাবস্থা বলা যাইতে পারে।

দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বালকের অভাব অপেক্ষা শারীরিক শক্তি ক্ষিপ্রতর বেগে বাড়িয়া উঠে। সে প্রায় ভ্রূক্ষেপ ব্যতিরেকে জলবায়ু ও ঋতুভেদজনিত যাবতীয় ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য করে। স্বাভাবিক উত্তাপেই তাহার চলিয়া যায়, গাত্র বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক ক্ষুধাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট — ক্ষুধা উদ্দীপনের জন্য মুখরোচক দ্রব্যাদির আবশ্যক হয় না। ঘুম ধরিলে মাটিতে শুইয়াই তাহার গাঢ় নিদ্রা হয়। অতএব তাহার যে যে বস্তুর প্রয়োজন আপনা আপনিই সে সব পায়। তাহার খাম খেয়ালী নাই। সুতরাং যে সকল বস্তু তাহার করায়ত্ত তাহার বাসনা সেই সেই বস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই

সময়ে তাহার শক্তি কেবল সর্ব্ববিধ অভাব পূরণক্ষম নহে কিন্তু তদপেক্ষাও বেশী। সারাজীবনের মধ্যে কেবল এই ভাগটিরই এই সৌভাগ্য ঘটে। জীবনের এই ভাগে যে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকে বালক তাহা দিয়া কি করিবে? ভবিষ্যতে কাজে আসিতে পারে এইভাবে উক্ত শক্তির প্রয়োগ করা সঙ্গত নয় কি? বয়োবৃদ্ধি হইলে বর্দ্ধিত অভাবাদির পূরণের জন্য এই শক্তি সঞ্চিত রাখা উচিত নয় কি? যে আজ বাল্যকালে বেশ বলিষ্ঠ বোধ হইতেছে সেই ভবিষ্যতে পূর্ণ বয়স্ক হইলে তৎকালের হিসাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। তবে বর্ত্তমানের উদ্বৃত্ত শক্তি ভবিষ্যৎ দুর্ব্বলতা দমনোদ্দেশ্যে রাখিয়া দেওয়াই তো সঙ্গত। কিন্তু শক্তি তো আর ধনধান্য নয় যে কোষে বা ভাণ্ডার গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইবে। উক্ত শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে আপনার করিতে হইলে উহা স্বীয় দেহ ও মনে, স্বীয় বাহুতে ও স্বীয় মস্তিষ্কে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। সুতরাং জীবনের এই অংশ পরিশ্রম করিবার কাল, জ্ঞানলাভ করিবার কাল এবং অধ্যয়ন করিবার কাল। একথা আত্মার স্বকপোল কল্পিত নহে প্রকৃতিরই এই অভিপ্রায়।

মানবের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। অনেক বিষয়ই আমাদের অজ্ঞেয়। আর অন্যান্য মানবগণ যে সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন তৎসমুদয় সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করার শক্তিও আমাদের নাই। পরস্পর বিপরীত প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা যুগলের মধ্যে একটী মিথ্যা বরং অপরটী সত্য। সুতরাং মিথ্যার সংখ্যা যত সত্যের সংখ্যাও তত। সংসারে মিথ্যার সংখ্যা যখন অফুরন্ত অতএব সত্য বা তত্ত্বের সংখ্যাও তাই। সুতরাং কোন্ কোন্ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে এবং কোন্ সময়ে দিতে হইবে তাহা বাছনি করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের জ্ঞান-গম্য বিষয় সমূহের মধ্যে কতকগুলি অলীক, কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং কতকগুলি কেবল আমাদিগের অহঙ্কার বর্দ্ধক। যে বিষয়গুলি

প্রকৃত পক্ষেই মঙ্গলজনক কেবল সেইগুলিই জ্ঞানীগণের আলোচ্য, আর বালকগণকে জ্ঞানী করিয়া তোলাই যখন আমাদিগের উদ্দেশ্য সুতরাং তাহাদিগেরও কেবল সেইগুলি পাঠ্য। কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা সম্ভবপর কেবল তাহা দেখিলে হইবে না। কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করিলে খুব উপকারে আসিবে তাহাও দেখিয়া লইতে হইবে। আবার যে যে বিষয় শিক্ষা করিলে বুদ্ধির পরিপক্কতার এবং মানব সমাজের বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন বালকগণের পক্ষে সেই সমুদয়ও শিক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বালকের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হইতে এইগুলিও বাদ দিতে হইবে। কারণ সেই সমুদয় বিষয় তত্ত্ব জ্ঞাপক হইলেও উহা শিখিতে যাইয়া বালকের অনভিজ্ঞ মস্তিষ্ক নানা বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে পারে। এইরূপে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর করিয়া ফেলাতে যাবতীয় বিষয়সমূহের তুলনায় বালকের পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িল বটে। কিন্তু বালকের মানসিক শক্তির দুর্ব্বলতার কথা মনে করিলে উহাই খুব বেশী মনে করিতে হইবে।

অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে মানব বুদ্ধির সম্মুখে জগৎটা খুলিয়া দিল তাহার দুর্জ্জয় সাহস বলিতে হইবে। শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটিবশতঃ বালকের জ্ঞান রাজ্যের চতুর্দ্দিকে কি বিশাল গভীর অজ্ঞান সমুদ্র বিরাজ করিতেছে। হে শিক্ষক মহাশয়, আপনি আপনার ছাত্রকে এই বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া চালাইয়া নিতেছেন। আর তাহার সম্মুখে প্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করিতে যাইতেছেন—কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া সাবধান হউন। আপনার নিজের এবং আপনার ছাত্রের মস্তিষ্কের ক্ষমতা সম্বন্ধে একবার কৃতনিশ্চয় হউন। নতুবা আলোচ্য বিষয়ের কাঠিন্য হেতু আপনাদের মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারে। মিথ্যার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যে মুগ্ধ হইবেন না, গর্ব্বমদিরার আঘ্রাণে মত্ত হইবেন

না। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন — অজ্ঞতা কখনও অনিষ্ট-প্রসূ হয় না কিন্তু ভুলই মারাত্মক। আমরা যাহা জানি না তাহা হইতে ভুলের জন্ম হয় না কিন্তু আমরা যাহা জানি বলিয়া মনে করি অথচ প্রকৃত পক্ষে জানি না তাহা হইতেই অধিকাংশ ভুল জন্মিয়া থাকে।

কৌতূহল উদ্দীপন।

একই সহজাত সংস্কার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থকে। প্রথমে মানুষ শরীর খাটাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে শরীরের বিকাশ সাধনের জন্য সতত সচেষ্ট থাকে। তারপরে মানুষ কেবল মানসিক কার্য্য করিতে চায়, সর্ব্বদা জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য যত্নবান্ হয়। বালকগণ ছেলে বয়সে বড় অস্থির থাকে, আবার পরে তাহারা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়। আমরা এখন যে বয়সের কথা আলোচনা করিতেছি এই বয়সে সুপরিচালিত কৌতূহলই তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া থাকে। কিন্তু এই কৌতূহলের মধ্যেও শ্রেণী ভেদ করা আবশ্যক। এক খাটি বা নৈসর্গিক কৌতূহল, জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই আকাঙ্ক্ষা ; অন্য, মিথ্যা বা অসার কৌতূহল। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা নাই কিন্তু জ্ঞানী বলিয়া সম্মান লাভ করিবার ইচ্ছা আছে।

এক প্রকারের জ্ঞান-পিপাসা আছে উহা লোকচক্ষে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইবার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর গৌণভাবেই হউক যে যে বিষয়ের সহিত আমাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের সম্পর্ক আছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার যে নৈসর্গিক কৌতূহল তাহারই উপর অন্য প্রকারের জ্ঞানপিপাসা প্রতিষ্ঠিত। মানুষে সুখ-লাভের ইচ্ছা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। এই ইচ্ছার কখনও পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি ঘটে না। তাই আমরা সুখ বর্দ্ধনের উপায়ান্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

কৌতূহল বৃত্তির মূল সূত্রটী সহজাত বটে কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রবল মনোবৃত্তিগুলির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিকাশ পাইয়া থাকে। নৈসাগক ঘটনাবলীর দিকে তোমার ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ কর — দেখিবে সে কৌতূহলী হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি তুমি এই কৌতূহল বৃত্তিকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার উক্ত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না। তাহাকে তাহার বুদ্ধিগম্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং নিজে নিজেই উহার উত্তর নির্ণয় করিতে দেও। বালক নিজে নিজে যদি একটি সত্য উদ্ভাবন করিয়া থাকে তবে সেই জন্যই যেন উক্ত তত্ত্বটি আয়ত্ত করে। একটা সত্য তুমি তাহাকে বলিয়া দিয়াছ এইজন্য যেন উহা আয়ত্ত করিবার প্রবৃত্তি না হয়। তাহার বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে না কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিজে নিজে বাহির করিতে হইবে। একবার যদি লোকমতকে বিচারের আসন ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে আর সে বিচার করিতে চাহিবে না, সে কেবল অন্যের মতের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া পড়িবে।

বালককে ভূগোল শিক্ষা দিতে বসিয়া তুমি কত গোলক, মানচিত্র প্রভৃতি আনিয়া বস। এই সব যন্ত্রতো আর আসল বিষয় নহে, এইগুলি আসল বিষয়ের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রতিকৃতির পরিবর্ত্তে আসল জিনিষ দেখাইয়া শিক্ষা আরম্ভ কর না কেন? তবেই তো তুমি যাহা বলিবে সে তাহা বুঝিতে পারিবে।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় তোমার ছাত্রকে লইয়া বেড়াইতে যাও। চক্রবালে অবাধে অস্তগামী সূর্য্য দেখা যাইতে পারে এমন এক স্থানে যাইয়া দাঁড়াও। চতুর্দ্দিকস্থ নানা বস্তুর অবস্থান লক্ষ্য করিয়া ঠিক করিয়া রাখ কোথায় সূর্য্য ডুবিয়া যায়। পরদিন ভোরবেলা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হও। পূর্ব্বাকাশে অরুণরাগ দেখিয়া

বুঝিতে পারিবে যে সূর্য্য শীঘ্রই উদিত হইবে, উজ্জ্বলতা ক্রমশঃই বাড়িবে। পূর্ব্বাকাশে যেন আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। জ্যোতি দেখিয়া অনেকক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিবে যে প্রভাত হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই কল্পনা করিবে এই সূর্য্য দেখিতেছি অবশেষে দেখিবে সত্য সত্যই সূর্য্য উদিত হইল। বিজলীর মত প্রথম একটা আলোকময় বিন্দু দেখা দিল। পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে আলোকে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ছায়াময় আবরণ অন্তর্হিত হইল। আমাদিগের বাড়ী ঘর আবার দৃষ্টিগোচর হইল, এক অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইল। রাত্রি কালে উদ্ভিজ্জগৎ নূতন তেজে তেজস্বী হইয়াছে। নবাগত দিবসের স্বর্ণময় কিরণ সংস্পর্শে উজ্জ্বলীকৃত শিশির কণসিক্ত লুতাতন্তুজাল আলোক প্রতিফলিত করিয়া এবং বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়াই উহার পরিচয় দিতেছে। মুখর পক্ষিকুল কলকূজনচ্ছালে জগৎপাতার বন্দনা করিতেছে। পক্ষিগণ শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে এইমাত্র জাগরিত হইয়াছে তাই তাহাদের কণ্ঠ যেন নিদ্রালসজড় ও ক্ষীণ। তাহাদের প্রভাতকালীন কাকলী যেমন মধুর ও ধারাবাহী তেমন অন্য কোন সময়ে হয় না। ইহাতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ এমন এক মাধুর্য্য ও নবীনত্ব লাভ করে যে তাহাতে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পর্য্যন্ত একটা সাড়া পড়ে। এমন মহৎ, এমন সুন্দর এবং এমন প্রীতিকর দৃশ্য দেখিয়া কাহারও মন অসাড় থাকিতে পারে না। এমন মধুর সময়ে কাহারও মন নাচিয়া না উঠিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ দৃশ্যে শিক্ষক মোহিত হইয়া ছাত্রের মনে তাহার স্বকীয় প্রবল অনুভূতি প্রদান করিতে চান এবং মনে করেন নিজে যাহা অনুভব করেন তাহার দিকে ছাত্রের মনোযোগ আনিতে পারিলেই উক্ত অনুভূতি জাগিয়া উঠিবে। কি মূর্খতা! স্বভাবের চমৎকারিত্ব বহির্জ্জগতের বস্তু নহে, দর্শকের হৃদয়েই উহার জন্ম। উহা দেখিতে হইলে

তদুপযোগী অনুভব বৃত্তির উদয় হওয়া চাই। বালক বিবিধ বস্তু দৃষ্টিগোচর করে বটে কিন্তু কিরূপ বন্ধনে উহারা পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য কোথায়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এই সমুদয় বিবিধ জাতীয় বোধের সমবায় সম্ভূত জটিল ধারণা মুহূর্ত্ত মধ্যে করিয়া ফেলিতে হইলে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বালকের তাহা নাই। যে যে মনোবৃত্তির ক্রিয়ার প্রয়োজন বালকের এখনও তাহাদের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। যদি সে কখনও মরুভূমি অতিক্রম না করিয়া থাকে, উত্তপ্ত বালুতে তাহার পা যদি না পুড়িয়া থাকে, বিবিধ শৈলখণ্ড হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যোত্তাপে যদি সে কখনও অস্থির না হইয়া থাকে তবে সে কেমন করিয়া লাবণ্যময়ী উপত্যকার শৈত্য সুখ সম্ভোগ করিবে? কেমন করিয়া সে ফুলের সুগন্ধ এবং শিশিরের শীতল শীকর সম্ভোগ করিবে? কোমল ও সুখস্পর্শ শস্পাচ্ছাদিত প্রান্তরে পাদচার করিতে; করিতে যে পা ধীরে ধীরে নামিয়া পড়ে তজ্জনিত সুখ সে কেমন করিয়া অনুভব করিবে? প্রেমিক প্রেমিকার বিশ্রম্ভালাপের মাধুর্য্য যে এখনও আস্বাদ করিতে পারে নাই সে কেমন করিয়া পাখীর মি গান শুনিয়া সুখী হইবে? দিন ভরিয়া কি কি আমোদ প্রমোদ ভোগ করা যাইতে পারে ইহা যে কল্পনা করিতে না পারে সে কেমন করিয়া দিবসারম্ভের সুখ সম্ভোগ করিবে? কাহার কোমল করপল্লবস্পর্শে প্রকৃতি এমন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যে জানে না সে কেমন করিয়া প্রকৃতির সুবিন্যস্ত সুশোভন দৃশ্যাবলী দেখিয়া আনন্দলাভ করিবে?

বালক যে বিষয় বুঝিতে পারে না সেই বিষয়ে তাহার সহিত আলাপ করিবে না। তাহার নিকট কোন বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা করিওনা। তোমার বাগ্মিতার পরিচয় দিও না, আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করিও না এবং কোনও কবিতা পাঠ করিও না। সাহিতে

ভাবের খেলা ও রুচির চর্চ্চা করিবার সময় এখন তাহার মোটেই নয়। তাহার নিকট যাহা বলিবে তাহা যেন স্পষ্ট ও সরল হয়, মোটেই যেন প্রবল মানববৃত্তির উত্তেজক না হয়। এখনও এই ভাবেই চলিবে। উদ্দাম ভাবপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের জন্য ব্যস্ত হইও না। সেই সময় শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বালক যথাসম্ভব নিজের কাজ নিজে নিজে করিতেই অভ্যস্ত হইবে — একবারে অক্ষম না হইলে আর সে পরের সাহায্যপ্রার্থী হইবে না সুতরাং সে কোনও নূতন বস্তু পাইলে নিঃশব্দে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবে। সে চিন্তাশীল হইবে — বহু প্রশ্ন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। অতএব যথাসময়ে যথোচিতভাবে তাহার নিকট বস্তু উপস্থিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। একবার তাহার কৌতূহল সম্যক্‌রূপে জাগ্রত হইলে, তাহাকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটি প্রশ্ন করিবে যেন উহা হইতেই সে উত্তরের আভাস পাইতে পারে।

এখন যে কথা আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহার অনুসরণ করা যাউক। বালককে সূর্য্যোদয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে দেও; উদয়ের দিকে কোন কোন পর্ব্বত বৃক্ষ বা অন্যান্য বস্তু আছে তাহা লক্ষ্য করিতে দেও — ঐ সমুদয় বস্তু সম্বন্ধে সামান্য একটুকু গল্প করিতে দেও — তারপর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বল "কাল তুমি ঐখানে সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দেখিয়াছিলে। আজ আবার এইখানে উদিত হইয়াছে। এমন হইল কেন?" আর কিছু বলিবে না। যদি সে প্রশ্ন করে তাহা না শুনিয়া অন্য কথা পাড় তাহা হইলে বালক নিশ্চয়ই ঐ বিষয় লইয়া স্বয়ং চিন্তা করিতে থাকিবে।

বালককে মনোযোগী হইতে অভ্যস্ত করিতে হইলে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন তত্ত্ব তাহার মনে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট করিতে হইলে তাহাকে কিছু

কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে তজ্জন্য ব্যস্ত হইও না। উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস উক্ত বিষয়ের চিন্তা করিয়া সে তত্ত্ব নিজে নিজেই বাহির করুক। বর্ত্তমানে আলোচ্য তত্ত্বটি যদি তাহার মনে না আসে তবে প্রশ্নটি বিপরীতভাবে স্থাপন করিয়া তাহার বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেও। অস্তগমন হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত সূর্য্য কোন পথে চলে তাহাও যদি বুঝিতে না পারে, উদয়াবধি অস্তগমন পর্য্যন্ত কোন পথে চলে তাহা সে বুঝিতে পারিবে। এইস্থলে তাহার দর্শন জ্ঞানই তাহাকে শিক্ষা দিবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের সাহায্যে প্রথম প্রশ্ন বুঝাইয়া দেও। তোমার ছাত্র যদি নিরেট মূর্খ না হয় তবে আর সে এই তুলনার সাহায্যে না বুঝিয়া পারিবে না। ইহাই তাহার ভূগোল বিষয়ক প্রথম পাঠ।

আমরা ধীরে ধীরে এক বস্তুর আলোচনা হইতে অন্য বস্তুর আলোচনায় অগ্রসর হইব। একটির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যটিতে হস্তার্পণ করিব না এবং জের করিয়া বিষয় বিশেষে তাহার মনোযোগ টানিয়া আনিব না। সুতরাং এই পাঠ হইতে সূর্য্যের কক্ষপথ এবং পৃথিবীর আকার বিষয়ক পাঠে যাইতে অনেক দিন লাগিবে। সমুদয় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের আপেক্ষিক গতিই একই নিয়মের অধীন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে কোন জ্যোতিষ্কের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে পরে অন্যান্যগুলির পর্য্যবেক্ষণে সুবিধা হয়। অতএব পৃথিবীর আহ্নিক গতি হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পে অল্পে গ্রহণের আলোচনা সময় সাধ্য হইলেও তত কঠিন নয়—ববং দিবারাত্রি ভেদ ভাল করিয়া বুঝা তদপেক্ষা কঠিন।

সূর্য্য একটী বৃত্তাকার পথে দৃশ্যতঃ পৃথিবী পরিভ্রমণ করে—প্রত্যেক বৃত্তেরই একটি কেন্দ্র আছে। এই বৃত্তের কেন্দ্র পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া দেখা যায় না। কিন্তু উহার সহিত সমসূত্রে অবস্থিত দুইটি বিন্দু আমরা ভূপৃষ্ঠে চিহ্নিত করিতে পারি। মনে করি

এই বিন্দুত্রয় ভেদ করিয়া একটী দণ্ড চলিয়া গিয়াছে এবং উহা উভয়দিকে আকাশ মণ্ডলে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাই পৃথিবীর মেরুদণ্ড এবং সূর্য্যের আপাত প্রতীয়মান গতিপথেরও মেরুদণ্ড। একটি গোলকাকার লাটিমের ঘূর্ণন হইতে আকাশগোলকের মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন বুঝা যায়। লাটিমের শীর্ষ বিন্দু ও অধোবিন্দু যথাক্রমে মেরুদণ্ডের উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর মতন। বালক উত্তর মেরু চিনিতে পারিয়া আনন্দিত হইব — সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুচ্ছের নিকটে যে ধ্রুবতারা আছে আমি তাহাকে উহা দেখাইয়া দিব। এই দর্শনে এক রাত্রি আমাদের আমোদে কাটিবে। অল্পে অল্পে আমরা কতকগুলি নক্ষত্র চিনিয়া ফেলিব - এই করিতে করিতেই গ্রহগণ ও নক্ষত্র পুঞ্জগণ দেখিবার জন্য তাহার ইচ্ছা জন্মিবে।

আমরা গ্রীষ্মঋতুর মধ্যভাগে সূর্য্যোদয় লক্ষ্য করিয়াছি। খ্রীষ্টমাসের দিন অথবা শীতকালে অন্য কোন দিন আমরা সূর্য্যোদয় লক্ষ্য করিব। কারণ আমরা মোটেই অলস নই এবং শীতকে মোটেই গ্রাহ্য করি না। গ্রীষ্মকালে যে স্থলে দাড়াইয়া সূর্য্যোদয় লক্ষ্য করিয়াছি শীতকালেও তথায়ই লক্ষ্য করিব। কিছুকাল কথাবার্ত্তা বলার পর আমাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে, দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পূর্ব্বে সূর্য্য যেখান হইতে উদিত হইয়াছিল এখন সেখান হইতে উঠিতেছে না। ঐ যে ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বে উঠিয়াছিল — এখন ঐ যে ঐ স্থান হইতে উঠিতেছে। সূর্য্য যে দিক হইতে উদিত হয় তাহাই পূর্ব্বদিক — তবে গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বদিক এক এবং শীতকালের পূর্ব্বদিক আর!” হে নবীন শিক্ষক, বালকের এই অভিজ্ঞতার পর তোমার পথ অনেক পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ গোলক সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইলে কিরূপ বিবেচনার সহিত পাঠ দিতে হয়, কেমন করিয়া পৃথিবীটাকেই

গোলক কল্পনা করিতে এবং প্রকৃত সূর্য্যকেই কল্পিত সূর্য্য মনে করিতে হয়।

আসল বস্তু এক আর উক্ত বস্তুজ্ঞাপক চিহ্ন আর।

সাধারণতঃ আসল বস্তু প্রদর্শন অসম্ভব না হইলে উহার প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিও না। কারণ তাহা হইলে বালকের প্রকৃত বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। বাহ্য-চিহ্নই তাহার সমগ্র মনোযোগ গ্রাস করিয়া ফেলে।

সৌরজগৎ বিষয়ে পাঠ দিবার জন্য সাধারণতঃ একটা যন্ত্রের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উহাতে পৃথিবীর একটা কাষ্ঠময় গোলক স্থাপিত আছে উহাই পৃথিবী স্থানীয়। উহার চতুর্দ্দিকে পেষ্ট বোর্ড বা তাম্রফলক বিনির্ম্মিত কতকগুলি বৃত্তাকার পদার্থ নানাভাবে সংযোজিত আছে। উহারা অন্যান্য গ্রহের গতিপথ দ্যোতক — উহাদের গায়ে কত কি অঙ্কপাত করা আছে! সমস্তটা দেখিয়া মনে হয় ইহা যেন এক অপূর্ব্ব ভোজবাজির যন্ত্র। উহা দেখিতে বালকদের ভয় হয়। পৃথিবীর স্থলাভিষিক্ত গোলকটি অত্যন্ত ছোট! বৃত্তগুলির সংখ্যা খুব বেশী, আকারও খুব বড়। এমন কতকগুলি বৃত্ত আছে যাহাদের কোনও প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকটা বৃত্তই পৃথিবী হইতে বৃহত্তর। পেষ্ট বোর্ড পুরু। তাহা দেখিয়া মনে হয় বৃত্তগুলি যেন কঠিন পদার্থ আর তাহা হইতেই এই ভুল ধারণা জন্মিতে চায় যে প্রকৃত প্রস্তাবেই এই বৃত্তগুলির সত্ত্বা আছে। তুমি যখন বালককে বলিবে এই বৃত্তগুলি কল্পিত, উহাদের বাস্তব সত্ত্বা নাই তখন বালক হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে। সে নিজে যাহা দর্শন করিতেছে এবং তুমি যাহা বলিতে চাও ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

কল্পনাবলে আমাদিগকে বালকের স্থানে উপস্থাপিত করিয়া লইতে কি আমরা মোটেই শিখিব না? আমরা তাহার চিন্তার প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করি না কিন্তু মনে করি তাহাদিগের চিন্তাপ্রণালীও যেন ঠিক আমাদেরই মত। সর্ব্বদাই আমাদিগের নিজেদের বিচার প্রণালী অনুসরণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে গ্রথিত কতকগুলি তত্ত্ব বালকের মনে জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেই এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অদ্ভুত রকমের ধারণা এবং ভ্রান্তিও দিয়া থাকি।

বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আমরা সংশ্লেষণ কি বিশ্লেষণ প্রণালীর ব্যবহার করিব এখনও নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই যে উহাদের একতরেরই ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে। একই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কখনও সংশ্লেষণ কখনও বা বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বন করিতে পারি। বালক হয় তো মনে করিবে যে সে বিশ্লেষণের পথে চলিয়াছে কিন্তু আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে শিক্ষকগণের চিরাচরিত প্রথা অর্থাৎ সংশ্লেষণের দিকেও নিয়া যাইতে পারি। এইরূপে উভয়বিধ প্রণালীর প্রয়োগ করিলে একতরের সত্যতা অন্যতর দ্বারা প্রমাণিত হইবে। পরস্পর বিপরীত দুইটা দিক হইতে একই সময় চলিতে আরম্ভ করিয়া সে কালক্রমে একই স্থলে আসিয়া পৌছিবে — তখন সে এই মনে করিয়া প্রফুল্ল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে যাহাকে সে দুইটা বিভিন্ন পথ মনে করিয়াছিল তাহা এক হইয়াই মিলিয়া গিয়াছে।

একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ভূগোল শিক্ষাদানে পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা যাউক। একদিকে বালকের বাসস্থান হইতে আরম্ভ করা যাইবে— পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর গতি এবং উহার বিভিন্ন অংশের পরিমাপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অপর দিকে, গোলক হইতে আরম্ভ করা যাইবে তথা হইতে

ধীরে ধীরে গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলের গতিপথ আলোচনা করিবে ও পরে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিমাপ করিবে এবং অবশেষে তাহার নিজের বাসস্থান তাহার আলোচনার বিষয় হইবে। ছাত্র যে সহরে বাস করে এবং তাহার পিতার মফঃস্বলে যে বাড়ী আছে এই দুইটি স্থানের বিবরণ ছাত্রের প্রথমকার আলোচ্য বিষয় হইবে। তারপর উক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নানাস্থানের কথা সে আলোচনা করিবে। ইহার পরের আলোচ্য বিষয় নিকটবর্ত্তী নদীসমূহ এবং সর্ব্বশেষে সূর্য্যের অবস্থান এবং পূর্ব্বদিক বাহির করিবার নিয়ম আলোচনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বালক যদি গোলকাবলম্বনে গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকে তাহা হইলে অল্পে অল্পে পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের অবস্থান অর্থাৎ পূর্ব্বদিক নির্ণয়ে আসিয়া পৌছিবে। সুতরাং সর্ব্ব শেষআলোচ্য বিষয় হইল — পূর্ব্ব বর্ণিত উভয় পন্থার মিলন বিন্দু। এই সব বিষয় প্রদর্শন করিয়া বালককে একখানা মানচিত্র আঁকিতে হইবে। এই মানচিত্র অতি সাধারণ রকমের হইবে। প্রথমে উহাতে কেবল দুইটি বিষয় অর্থাৎ মফঃস্বলের বাড়ী এবং সহরের বাড়ীই মাত্র সন্নিবেশিত হইবে। পরে অন্তবর্ত্তী স্থান সমূহের দূরত্ব ও অবস্থানের জ্ঞান তাহার যতই হইতে থাকিবে ততই সেইগুলিও উক্ত মানচিত্রে স্থান পাইবে। এখন বুঝিতে পারিবে যে বালক দিগ্ নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহারের পরিবর্ত্তে চক্ষুর ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া এখন তাহার কত সুবিধা হইল।

বালকের শিক্ষার এইরূপ সুবন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে একটুকু একটুকু পথ দেখাইয়া দেওয়া দরকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প হইবে এবং সেটুকুও যেন বালক টের না পায়। সে ভুল করে করুক। তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিও না। চুপ করিয়া থাক। কালক্রমে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সে নিজেই তাহা সংশোধন করিবে। অথবা বড় জোর এমন কিছু কর যেন সেই ভুলটার

দিকে বালকের দৃষ্টি পড়ে। যদি সে মোটে ভুল না করে তবে তাহার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ তো দূরে থাকুক অর্দ্ধাঙ্গও হইবে না। বিশেষতঃ, বালক তাহার দেশের যথাযথ ভৌগোলিক বিবরণ শিক্ষালাভ করুক ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে — সে কেমন করিয়া উহা নিজে বাহির করিতে পারে তাহা শিখানই মুখ্য উদ্দেশ্য। বালক মনে মনে মানচিত্র দেখুক বা না দেখুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাহার বুঝা চাই মানচিত্র আসল কোন্ বস্তুর প্রকাশক এবং কেমন করিয়া মানচিত্র তৈয়ার করিতে হয়।

তোমাদের ছাত্রগণের শিক্ষা এবং আমার ছাত্রের অজ্ঞতা এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখ। তোমাদের ছাত্রেরা মানচিত্র সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানে — আর আমার ছাত্র মানচিত্র প্রস্তুত করে। আমাদের মানচিত্রগুলি গৃহসজ্জার নূতন উপকরণ রূপে গণ্য হইবে।

বিজ্ঞান পাঠে অনুরাগ।

সর্ব্বদা মনে রাখিও যে যে ধারণা কয়টি বালকের মনে প্রবেশলাভ করিবে সেগুলি যেন নির্ভুল ও স্পষ্ট হয়। ইহাই আমার প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য। তাহাকে অনেক কথা শিখান আমার উদ্দেশ্য নহে। তাহার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা না জন্মে ইহাই আমি চাই। এইটুকু ঠিক থাকিলে সে যদি মোটে কিছুই না শিখে তাহাতেও আমি দুঃখিত নই। তাহার মন ভ্রম হইতে রক্ষা করিতে পারিলেই প্রকারান্তরে আমি উহা সত্যে পূর্ণ করিতে পারিব। যুক্তি ও বিচার অতি ধীরে ধীরে মনোমন্দিরে প্রবেশ করে, আর অসত্য ও কুসংস্কার দলে দলে সবেগে প্রবেশ করে। এই শেষোক্ত বিষয়গুলির হস্ত হইতে বালককে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাহা করি কই? বিজ্ঞান শিক্ষা দানের কথা বিবেচনা করিয়া দেখ। দেখিবে অপ্রতিবিধেয় বিপদসঙ্কুল,

অসীম ও অতলস্পর্শ সাগরে পা দিয়াছ! যখন দেখিতে পাই কোন ব্যক্তি বিদ্যানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া দ্রুতবেগে বিজ্ঞানের শাখা হইতে শাখান্তরে প্রবেশ করিতেছে, কোথায় যাইয়া যে থামিবে তাহা ঠিক পাইতেছে না, তখন আমার, বালকের সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করার কথা মনে হয়। প্রথমতঃ বালক এক বোঝা সংগ্রহ করে— তারপর আরও ভাল ভাল লোষ্ট্রখণ্ড দেখিতে পাইয়া লুব্ধ হইয়া পূর্ব্ব সংগৃহীত উপলগুলি ফেলিয়া দিয়া নূতন নূতন ভাল ভাল লোষ্ট্র কুড়াইতে থাকে। অবশেষে বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়ে— ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না। কাজেই সবগুলি ফেলিয়া দিয়া খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

দ্বাদশবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে সময় ধীরে ধীরে কাটিয়াছে। তখনকার জন্ত আমরা ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বালককে লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন নাই। তাহা করিলে তাহার সুকুমার বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যবহার হইতে ও অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু এখনকার অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। এখনকার সময় অতি সংক্ষিপ্ত। যাহা যাহা আমাদিগের প্রয়োজনে আসিতে পারে তাহার সবগুলি সংগ্রহ করিবার অবকাশ নাই। মনে রাখিবে উদ্দাম প্রবৃত্তি নিচয়ের আবির্ভাবের কাল ঘনাইয়া আসিতেছে। যেই তাহারা আসিয়া একবার দ্বারে আঘাত করিবে বালকের সর্ব্ববিধ চেষ্টা তদবধি কেবল তাহাদের জন্যই প্রযুক্ত হইতে থাকিবে। স্থির, ধীরভাবে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার সময় এত অল্প এবং লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত আরও এত বেশী বিষয়ে বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন যে, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে লেখাপড়া শিখাইয়া বালককে পণ্ডিত করিয়া তোলার ইচ্ছা নির্ব্বোধের কল্পনা মাত্র। তাহাকে বিদ্যা শিখান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়— কিন্তু উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহার যাহাতে বিদ্যালাভের জন্য অনুরাগ

জন্মে তাহা করা এবং পরে এই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইলে যাহাতে নিজে নিজে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে তেমন একটি সুপ্রণালী শিখাইয়া দেওয়া। সর্ব্ববিধ সুশিক্ষা প্রণালীরই ইহাই মূল সূত্র—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনোযোগ বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত করিতে অভ্যাস করারও ইহাই সময়। বাহ্য বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহার মনোযোগ টানিয়া আনিতে হইবে না কিন্তু স্বেচ্ছা ও আনন্দোৎপাদন দ্বারাই উহা করিতে হইবে; সাবধান থাকিও যে আলোচ্য বিষয় যেন বালকের পক্ষে বিরক্তিকর বা ক্লান্তিজনক হইয়া না পড়। কোন বিষয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়া ক্লান্তিজনক হইবার পূর্ব্বেই উহার আলোচনা পরিত্যাগ করিবে কারণ বালক বিষয়টি শিখিলে যে লাভ হইবে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বাধ্য করিয়া উহা শিখাইতে চেষ্টা করিলে অনিষ্ট তদপেক্ষা বেশী হইবে। সে যদি নিজে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তাহার কৌতূহলটুকু সঞ্জীবিত থাকে কেবল এই পরিমাণ উত্তর দিবে কিন্তু তাহার কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ করিবে না। সে যখন প্রশ্ন করে তখন সর্ব্বপ্রথমে তোমার দেখিতে হইবে—তাহার প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি? নূতন কিছু শিক্ষা করাই উদ্দেশ্য, না যাহা তাহা কহিয়া, নির্ব্বোধের মত কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া শুধু তোমাকে বিরক্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য। একবার যদি স্থির নিশ্চয় হইতে পার যে উত্তরের মর্ম্মের দিকে তাহার মনোযোগ নাই কেবল তোমাকে বিরক্ত করা এবং তোমার সময় নষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ থামিবে। সে কি বলে তাহা তত লক্ষ্য না করিয়া কি উদ্দেশ্যে বলিতেছে সেই দিকেই খেয়াল রাখিবে। এই পর্য্যন্ত এই সাবধানতার প্রয়োজন হয় নাই বটে কিন্তু যে দিন হইতে বালক বিচার করিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই এই সাবধানতা লইবার প্রয়োজন হয়।

কতকগুলি সাধারণ সত্যের শৃঙ্খল দ্বারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি পরস্পর সম্পর্কিত আছে এবং উহাদের সাহায্যেই বিজ্ঞানের ক্রম বিকাশ হইয়া থাকে। উক্ত সত্য-শৃঙ্খল সুধীগণেরই আলোচ্য বিষয় এবং সম্প্রতি আমাদের উহার প্রয়োজন নাই। আবার আর একটা শৃঙ্খল আছে। প্রত্যেক ঘটনা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের কার্য্য এবং তাহার পরবর্ত্তী বিষয়ের কারণ। এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা কৌতূহলের সাহায্যে পাঠকের ও শ্রোতার মনোযোগ সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখে। সাধারণ মানবগণ ইহাই অবলম্বন করিয়া থাকে এবং বালকগণের পক্ষে ইহারই প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা মানচিত্র তৈয়ার করিবার বেলায় যখন পূর্ব্বদিক্ বাহির করিয়াছিলাম তখন মাধ্যন্দিন-রেখা আঁকিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বভাগে ও পরভাগে কোন বস্তুর সমান ছায়া পাইলে তাহা হইতে যে মাধ্যন্দিন রেখা পাওয়া যাইতে পারে — ১৩ বৎসর বয়স্ক বালকের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কিন্তু এই রেখা অস্থায়িত হয়। ইহা আঁকিতেও সময় লাগে। আর ইহা আঁকিতে হইলে একই স্থানে অনেকক্ষণ থাকিতে হয় এবং অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই সব অসুবিধার কথা আমরা পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছি এবং পূর্ব্ব হইতেই বালককে দুঃখ কষ্টে অভ্যস্ত করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

বাজীকর।

কিছুকাল যাবৎ আমি ও আমার ছাত্র লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে ধুপ, রেশম, কাচ, মোম প্রভৃতি এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যে তাহাদের কোনটিকে অন্য কোন কোন পদার্থ দিয়া ঘর্ষণ করিলে উহা খড়, কূটা প্রভৃতি অতি পাতলা পদার্থ আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সেইগুণ নাই। ঘটনাক্রমে আমরা আশ্চর্য্যজনক রূপে আবিষ্কার

করিলাম যে একপ্রকার পদার্থ আছে তাহা বিনা ঘর্ষণে এবং দূরে রাখিলেই লোহার চূর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড আকর্ষণ করিতে পারে। উহার নাম চুম্বক, কিছুকাল পর্য্যন্ত উক্ত বস্তুর ঐ গুণ দেখিয়া আমরা আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম কিন্তু এই গুণ যে কোনও কাজে আসিতে পারে তাহা তখনও বুঝি নাই। অবশেষে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে চুম্বক দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে লৌহখণ্ডকেও এরূপ করা যাইতে পারে যে উক্ত লৌহখণ্ডের ও পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতা জন্মে। একদিন আমরা মেলায় যাইয়া দেখিলাম যে এক বাজীকর একটা জলপূর্ণ পাত্রে একটি মোমের হাঁস ভাসাইয়া দিয়াছে আর একখণ্ড চুম্বক উহার উপর দিয়া নিয়া হংসটিকে জলের উপরে যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে চালাইতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বটে কিন্তু আমরা একথা বলিলাম না যে বাজীকর ভোজবিদ্যা বলে এই অলৌকিক কাণ্ড করিল। কারণ আমরা তখন পর্য্যন্ত জানি না — বাজীকর কাহাকে বলে। কোন কার্য্য দেখিয়া অবিরত চমৎকৃত হইতেছি — অথচ উহার কারণ অবগত নহি। এতদবস্থায় হঠাৎ একটা কারণ অনুমান করিয়া লওয়া আমাদের স্বভাব নয়। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত কারণ অবগত হইতে না পারিব সে পর্য্যন্ত উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে আমরা লজ্জাবোধ করি না — এই ক্ষেত্রেও তাহা করি নাই।

বাড়ীতে ফিরিয়া কেবল মেলার হাঁসের বিষয়েই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলাম এবং শেষে উক্ত হাঁসের অনুকরণে আমরা একটা হাঁস তৈয়ার করিয়া ফেলিলাম। একটি চুম্বক-সূচি লইয়া উহা মোম দিয়া ঢাকিয়া দিলাম এবং যথাসম্ভব হাঁসের মত করিয়া গড়িয়া তুলিলাম। সূচির মোটা দিকটা হাঁসের ঠোঁটের ভিতর রহিল। হাঁসটি জলের উপর স্থাপন করিলাম, একটা চাবির অগ্রভাগ হাঁসের ঠোঁটের কাছে

ধরিলাম, এবং দেখিলাম বাজীকরের হাঁস যেমন তাহার রুটিখণ্ডের পেছনে পেছনে চলিয়াছিল আমাদের হাঁস ঠিক সেই ভাবে চাবির পেছনে পেছনে চলিয়াছে। ইহাতে যে আমাদের অপরিসীম আনন্দ হইল তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। হাঁসটি জলের উপর রাখিয়া দিয়া উহার কাছে আর কোন জিনিষ না দিলে উহা কোন্ দিক হইয়া দাড়ায় তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতাম বটে। কিন্তু আমাদিগের মন বিষয়ান্তরে আবদ্ধ থাকাতে আমরা আর কিছু লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

সেই দিন বৈকালেই বাজী দেখাইবার জন্য রুটি তৈয়ার করিয়া লইয়া আমরা আবার মেলায় যাইয়া হাজির হইলাম। বাজীকরের বাজী শেষ হইতে না হইতেই আমার ছাত্র আর ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল "এইটা কিছু কঠিন বিষয় নয়—আমিও উহা করিতে পারি।" অমনি তাহাকে বাজী করিতে দেওয়া হইল। যে রুটির ভিতর লৌহ খণ্ড লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল অমনি সে পকেট হইতে সেই রুটিখানি বাহির করিল। বাজির টেবিলের দিকে অগ্রসর হইবার সময় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। প্রায় কাঁপিতে কাঁপিতেই সে রুটিখানা হাঁসটার কাছে ধরিল। হাঁস রুটিখানার নিকটে গেল এবং উহারই সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন বালক আনন্দধ্বনিসহ নাচিতে লাগিল। সকলে করতালি দিতে লাগিল, তাহাতে বালকের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে যেন আত্মহারা হইল। বাজীকর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বালককে আলিঙ্গন করিল, তাহার কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং বলিল "অনুগ্রহ করিয়া আগামী কল্যও আসিবেন, কাল জনতা আরও বেশী হইবে এবং বেশী লোকের প্রশংসা ভাজন হইতে পারিবেন।" তরুণ বৈজ্ঞানিক গর্ব্বস্ফীত হইয়া বাজে কথা বলিতে যাইতেছিল আমি তাহাকে থামাইলাম এবং প্রশংসা

ভয়পূর্ণ অবস্থায় বাড়ীতে লইয়া গেলাম। বালক অধীর হইয়া পর দিনের নির্দ্দিষ্ট কাল মিনিটে মিনিটে গণিতে লাগিল—আমি তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। সে যাহাকে পাইল তাহাকেই কাল মেলায় যাইতে অনুরোধ করিল। তাহার ইচ্ছা সমগ্র মানব-মণ্ডলী তাহার বিজয় লাভের সাক্ষী হয়। সে নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাহার বহুপূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্টস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইল। গৃহ পূর্ব্বেই লোক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া বালকের বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। প্রথমে অন্যান্য খেলা হইল, বাজিকর অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিল, বালকের সে সব খেলার দিকে মোটেই মনোযোগ নাই। অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় তাহার গা বাহিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হইল। সে পকেটস্থিত রুটিখানার উপর কম্পমান হস্ত প্রদান করিল।

অবশেষে তাহার পালা আসিল। বাজীকর উচ্চরবে এই বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল। বালক সলজ্জভাবে নিকটে যাইয়া রুটিখানা সম্মুখে ধরিল। আহা! কি ঘটনা বিপর্য্যয়! কাল যে হাঁসটি এত বাধ্য ছিল, আজ সে অত্যন্ত অবাধ্য হইল। ঠোঁটটি রুটির দিকে ফিরান দূরে থাকুক আজ সে ঘুরিয়া বিপরীত মুখ হইল। কাল যত আগ্রহের সহিত বালকের হস্তস্থিত রুটির অনুসরণ করিতে ছিল আজ যেন সে সেই পরিমাণ বিরক্তির সহিতই উহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। বালক একবার বিফল মনোরথ হয় আর সকলে ঠাট্টা করিতে থাকে। এইরূপে বহুবার বিফল প্রয়াস হইবার পর বালক বলিতে লাগিল কে যেন চাতুরী করিতেছে এবং স্পর্দ্ধার সহিত বাজীকরকে নিজেই হংসটিকে আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করিল।

ঐ বাজীকর নিঃশব্দে এক টুকরা রুটি লইয়া হংসটির সম্মুখে ধরিল, আর হংসটি তৎক্ষণাৎ উহার দিকে চলিতে চলিতে উহার

হাতের কাছে আসিল। বালক ঠিক সেই রুটি টুকরা দিয়া চেষ্টা করিল কিন্তু হাঁসটি যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই কয়েক পাক দিয়া জলপাত্রটির কিনারায় গিয়া পৌঁছিল। আর লোকের ঠাট্টা সহ্য করিতে না পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া অবশেষে সরিয়া পড়িল। তারপর বাজিকর বালকের আনীত রুটি টুকরা দিয়াই খেলিতে লাগিল এবং নিজের রুটি দিয়া যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিল এইবারও তেমনই হইল। সমস্ত দর্শক মণ্ডলীর সম্মুখে সে যেন আমাদিগকে আরও অপ্রতিভ করিবার জন্য রুটির ভিতর হইতে সূচিখণ্ড বাহির করিয়া ফেলিল এবং পরে সেই রুটি দিয়া হাঁসের সঙ্গে ঠিক পূর্ব্বের মতই খেলিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি সকলের সম্মুখে এক টুক্‌রা রুটি কাটিয়া দিল, সে তাহা দিয়াও পূর্ব্বের মতই খেলিল। পরে তাহার দস্তানা দিয়া এবং হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়াও সেই খেলাই খেলিল। অবশেষে কক্ষের মধ্যখানে যাইয়া তাহার ব্যবসায়োচিত গর্ব্বস্ফীত স্বরে বলিতে লাগিল "হাঁসটি যে কেবল আমার অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া আদেশ মত কাজ করে তাহা নহে। সে আমার মুখের কথাও মানে।" সে আদেশ করিতে লাগিল আর হাঁসটিও তাহা পালন করিতে লাগিল। ডাইনে যাইতে বলে হাঁসটিও ডাইনে যায়, ফিরিয়া আসিতে বলে ফিরিয়া আসে, ঘুরিতে বলে ঘোরে। আদেশ করিবামাত্র তাহা প্রতিপালিত হয়। দর্শকগণ উচ্চতর রবে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, তাহাই আমাদের অপমান দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। আমরা চোরের মতন সরিয়া পড়িলাম এবং বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আমাদের কক্ষে দরজা দিয়া রহিলাম। আমাদের বিজয় লাভ প্রচার করিব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম তাহা আর হইল না।

পরদিন কে যেন আমাদের দরজায় ধাক্কা দিল। দ্বার খুলিয়া দেখি সেই বাজিকর উপস্থিত। সে এই বলিয়া মৃদুভাবে আমাদের নিন্দা করিতে

কাঁগিল "আমি এমন কি করিয়া ছিলাম যে আপনারা আমায় খেলাতে লোকেব অনাগ উৎপাদন করিয়া আমার জীবিকা বন্ধ করিবার যোগার করিয়াছিলেন? মোমেব তৈয়ারী একটা হাঁসকে আকর্ষণ করিবার মধ্যে এমন কি আশ্চর্য্যজনক কৌশল আছে যে তাহার খাতিরে আপনারা এক বেচারার অন্ন মারিতে যাইতেছিলেন? ঠিক্ জানিবেন, আমার যদি জীবিকা উপার্জ্জনেব অন্য পথ থাকিত তাহা হইলে আমি কখনই ইহা অবলম্বন কবিতাম না। আপনারা বিশ্বাস থাকা উচিত যে আমি সারাজীবন এই ব্যবসায় করিতেছি আব আপনাবা ২।৪ মিনিট উহাতে ব্যয় কবেন মাত্র — সুতবাং এই বিষয়ে আমার জ্ঞান আপনাদেব অপেক্ষা নিশ্চয়ই বেশী হইবে। আমি প্রথম দিন বাছার বাছার খেলা গুলি আপনাদিগকে দেখাইয়া ছিলাম না তাহার কাবণ এই যে যাহা যাহা জানা আছে তাহার সবগুলি একবারে প্রকাশ করিয়া ফেলা নির্ব্বোধের কার্য্য। উপযুক্ত অবসর না হইলে আমি আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেল গুলি দেখাই না। আমাব আবও অনেক ভাল ভাল খেলা জমা আছে উহা দ্বারা অবিবেচক যুবকদেব গর্ব্ব খর্ব্ব কবিতে পারি। মহাশয়গণ, যে কৌশল অবলম্বনে গতকল্য আমি আপনাদিগকে অপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি কবিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে শিখাইতেছি। আশা করি উক্ত জ্ঞান লাভ কবিয়া আপনাবা আর আমার অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হইবেন না এবং ভবিষ্যতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আর কাহাকেও জব্দ করিতে যাইবেন না।"

তারপর সে তাহার সব যন্ত্রপাতি দেখাইল। আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে একটী বালক টেবিলের নীচে লুকাইয়া থাকিয়া বড় একখানা চুম্বক নাড়িয়া চাড়িয়াই সব করিয়াছে। লোকটি তাহার যন্ত্রপাতি গুছাইয়া লইল। আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া এবং তাহার ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলাম। সে তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া কহিল,

"না, মহোদয়গণ, আমি আপনাদের ব্যবহারে এই পরিমাণ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই যে আপনাদিগ হইতে উপহার গ্রহণ করিতে পারি। আপনারা আমার উপর কৃতজ্ঞ না থাকিয়া পারিবেন না, তাহাই উপযুক্ত প্রতিশোধ হইল মনে করি। জানিবেন, মানুষ যত হীন ব্যবসায়ই করুক না কেন প্রত্যেকেরই একটা উদারতার জ্ঞান আছে! আমি খেলা দেখাইয়া পয়সা লই বটে কিন্তু শিক্ষা দিয়া পয়সা লই না।"

বাহির হইয়া যাইবার সময় সে আমাকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়া এই বলিয়া নিন্দা করিয়া গেল, "আমি এই ছেলেকে ক্ষমা করিতে পারি — সে অজ্ঞতা বশতঃ অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু আপনি তো তাহার অনুচেয় কার্য্যের দোষের প্রকৃতি অবগত ছিলেন। আপনি তাহাকে ইহা করিতে দিলেন কেন? আপনারা উভয়ে যখন একত্র বাস করেন, আর আপনি বয়স্ক তখন আপনার তাহাকে উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল। আপনার অভিজ্ঞতা তাহার চালকের কার্য্য করিতে পারিত। সে যখন বড় হইয়া তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে তখন আপনি তাহাকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করেন নাই বলিয়া নিশ্চয়ই আপনাকে মন্দ বলিবে।"

সে আমাদিগকে অত্যন্ত লজ্জিত করিয়া চলিয়া গেল। সহজে বালকের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে যে দোষ হইয়াছে তাহা আমি ঘাড় পাতিয়া লইলাম এবং স্বীকার করিলাম যে ভবিষ্যতে আর বালকের এইরূপ অনুরোধ গ্রাহ্য করিব না এবং ভবিষ্যতে এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিব। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রে এখন যে সম্পর্ক আছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার সময় আসিতেছে। তখন শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য্য ও কর্কশতা পরিত্যাগ করিয়া সমবয়স্ক ও সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির প্রতি আচরণীয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনটা ধীরে ধীরে হওয়াই প্রার্থনীয়। পরে কি দাঁড়াইবে বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার আভাস পাওয়া দরকার।

পরের দিন আবার আমরা মেলায় গেলাম। যে বাজীকরের গুপ্ত-রহস্য শিখিয়াছিলাম তাহার খেলা দেখিতেই গেলাম। এবার অতি সন্তর্পণে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার মুখের দিকে চাহিতে আমাদিগের সাহস হইল না। সে বড়ই সৌজন্য প্রদর্শন করিল — আমাদিগকে সসম্মানে আসন প্রদান করিল। ইহাতে আমাদের অপমান জনিত মনঃকষ্ট যেন বাড়িয়া গেল। সে রীতিমত তাহার খেলা দেখাইল — কিন্তু আমাদিগের দিকে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হাঁসের খেলাটাই বেশী করিয়া দেখাইল। আমরা তাহার উদ্দেশ্য বেশ বুঝিতে পারিলাম কিন্তু একটি কথাও বলিলাম না। এই অবস্থায় আমার ছাত্র যদি একটি কথাও বলিত তবে তাহার পক্ষে তাহা ঘোরতর অপরাধের কার্য্য হইত।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া এত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ না হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। এই একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে কত শত উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। মানুষের মন প্রথম গর্ব্বস্ফীত হইলে তাহার প্রতিফল স্বরূপ কত মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নবীন শিক্ষকগণ, ছাত্রের মনে অহঙ্কার কখন দেখা দেয় তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। যদি উহার প্রথম আবির্ভাবের প্রতিফল স্বরূপ উহাকে অবমাননা ও লাঞ্ছনা গ্রস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে আর এই দোষ দূরীকরণের জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিতে হইবে না।

অন্যান্য পদার্থের ভিতর দিয়াও চুম্বক লৌহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ইহা শিখিবার পর ঐরূপ একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আমরা অধীর হইয়া পড়িলাম। টেবিলের উপরিভাগের মত একটা কাষ্ঠ ফলকে খুড়িয়া উহাতে একটি দীর্ঘ অগভীর গর্ত্ত করিলাম। পরে উহা জলে পূর্ণ করিলাম। এবং উহাতে একটা হাঁস ভাসাইয়া

দিলাম। হাঁসটী অপেক্ষাকৃত মজবুত করিয়া গড়িলাম। এই যন্ত্রের কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে বহুক্ষণ লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিলাম হাঁসটি যখন স্থির থাকে তখন প্রায়ই একমুখী হইয়া থাকে। দিক্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হাঁসটি উত্তরমুখী হইয়া থাকে। আর কিছুর প্রয়োজন নাই। এইতো আমাদের কম্পাস আবিষ্কৃত হইয়া গেল; আর না হইলেও ইহাই আবিষ্কারের পথ বটে। এখন হইতে আমাদিগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার আরম্ভ হইল।

ব্যাবহারিক বিজ্ঞান।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উষ্ণতা ও জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন। মেরু প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইলে স্থানভেদে ঋতুর পার্থক্য ক্রমশঃ স্পষ্টতর রূপে অনুভূত হয়। সমস্ত পদার্থই শীতে সঙ্কুচিত এবং উত্তাপে প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ তরল পদার্থের বেলাতেই সহজে পরিমাপ করা যাইতে পারে। সুরাসার বিশিষ্ট তরল পদার্থেই ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। উষ্ণতামান যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ধারণা ইহা হইতে আসিতে পারে। বাতাস আমাদিগের চোখে মুখে লাগে সুতরাং উহার বাধা প্রদানের ক্ষমতা আছে। বায়ু একটি জড় পদার্থ আর ইহা প্রবহমান। আমরা বায়ু দেখিতে পাই না বটে কিন্তু উহা স্পর্শ করিতে পারি। একটা গ্লাস উপুর করিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ধর, উহার ভিতরস্থ বায়ু বাহির হইয়া যাইবার জন্য পথ করিয়া না দিলে গ্লাসটি জলে একেবারে ভরিবে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় বায়ুর চাপ দিবার ক্ষমতা আছে। গ্লাসটি নীচের দিকে আরও চাপিয়া ধর — গেলাসের অভ্যন্তর ভাগ সবটা পূর্ব্বে বায়ুতে পূর্ণ ছিল। এক্ষণে দেখিতে পাইবে জল উহার অভ্যন্তরে ক্রমশঃ বেশী বেশী উঠিতেছে। অবশ্য একবারে সমুদয় অভ্যন্তর ভাগ জলে পূরিয়া যাইবে না।

ইহাতে বুঝা গেল বায়ুকে কতক পরিমাণে সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে। বায়ুপূর্ণ একটি বল মেজেতে নিক্ষেপ করিলে যতদূর লাফাইয়া উঠে অন্য কোন পদার্থে পূর্ণ থাকিলে ততদূর উঠে না। ইহাতে প্রমাণ হইল বায়ু বেশ স্থিতিস্থাপক। স্নান করিতে যাইয়া হাত, পা ছড়াইয়া জলে ভাস। তারপর হাত দুইখানা ধীরে ধীরে জলের উপর উঠাইতে চেষ্টা কর দেখিবে কেমন একটা ভার বোধ করিতেছে অতএব দেখা গেল বায়ুর ভার আছে। কোনও অতি লঘু বস্তুর উপর এক দিক্ হইতে বায়ুর চাপ পড়ুক। আর তার ঠিক বিপরীত দিক হইতে অন্য কোনও দ্রব্যের ওজন ইহার উপর চাপ প্রদান করুক যেন বস্তুটি স্থির থাকে। তারপর সেই বস্তুটি ওজন করিলেই বায়ুর ওজন পাইলে। এইরূপ ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই বায়ুমান যন্ত্র, বকযন্ত্র, হাওয়ার বন্দুক, এবং বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থিতি-বিজ্ঞান ও জল স্থিতি বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম এইরূপ সামান্য পরীক্ষা হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। এইসব শিক্ষা করিবার জন্য আমার ছাত্র কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে আশ্রয় লউক — ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। বিবিধ যন্ত্র প্রদর্শন আমি ভালবাসি না। আড়ম্বর সহকারে বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা প্রদর্শনই বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করে। নানাবিধ যন্ত্র দেখিয়া বালক ভীত হইয়া পড়ে। অথবা ঐসব পরীক্ষার ফল দেখিতে যে মনোযোগের আবশ্যক যন্ত্রগুলির অদ্ভুত আকারই তাহার অনেকটা দখল করিয়া বসে।

আমার ইচ্ছা — আমাদের সমুদয় যন্ত্র আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লই। যন্ত্র তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে মোটেই কোন পরীক্ষা করিব না তাহা বলিতেছি না। সহসা ঘটনাক্রমে একটা পরীক্ষা হইয়া গেল তাহাতে একটা তত্ত্বের আভাস পাওয়া গেল। তারপর উহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ধীরে ধীরে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। এই যন্ত্রগুলি তত নিখুঁত ও নির্ভুল হইবার প্রয়োজন নাই।

স্থিতি-বিজ্ঞানের প্রথমকার পাঠের জন্য আমি তুলা দণ্ডের ব্যবহার করিতে চাই না। একখানা চেয়ারের পশ্চাৎ ভাগের উপর একগাছা লাঠি স্থাপন করিব — নাড়িয়া চাড়িয়া চেয়ারের দুই দিকেই যাহাতে লাঠির সমান সমান অংশ থাকে তাহাই করি। তারপর লাঠির উভয় প্রান্তে সমান সমান ওজনের বস্তু স্থাপন করিয়া দেখি লাঠিগাছা নড়েনা চড়েনা ঠিক আছে। তারপর লাঠির অংশ দুইটি অসমান করিয়া লই এখন দুই প্রান্তে সমান সমান ওজনের বস্তু রাখিলে লাঠি ঠিক থাকিবে না। যে দিকটা যত দীর্ঘতর সেইদিকের বস্তুর ওজন তত লঘুতর করিলেই লাঠি ঠিক থাকিবে অর্থাৎ বস্তুদ্বয়ের ওজন লাঠির অংশদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের বিষমানুপাতী হইবে। তবেই দেখিলে আমার ছাত্র তুলাদণ্ড দেখিবার পূর্ব্বেই শিখিয়া লইল কিরূপে উহার ভুলসংশোধন করিয়া লইতে হয়।

আমরা এইরূপে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া যখন কোন বিষয় শিক্ষা করি তখন উক্ত বিষয়ক জ্ঞান খুব যথাযথ ও স্পষ্ট হয়। তার পর, আমাদের বিচার শক্তি যদি অন্যের মতের বশ্যতা স্বীকার করিতে অভ্যস্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে এইরূপে নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা, ধারণার সহিত ধারণার সংযোগ সাধন দ্বারা এবং নূতন নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন দ্বারা আমরা অতিশয় কৌশলী হইতে পারিব। এমন অনেক লোক আছেন যাহারা নিজে পোষাক পড়েন না ভৃত্যগণই তাহাদিগকে পোষাক পড়াইয়া দেয়, ভৃত্যগণই সর্ব্বদা তাহাদের আজ্ঞা পালন করে — কোথাও যাইতে হইলে নিজ পায়ে চলেন না। ঘোড়া গাড়ীতেই সর্ব্বদা চলাফেরা করেন। কালক্রমে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুব দুর্ব্বল হইয়া তো পড়েই এমন কি তাঁহারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন ; যাহারা স্বয়ং মানসিক চালনা না করিয়া অন্যের [illegible] সর্ব্বদা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদেরও সেই দশা। তাহাদের মন [illegible] ও দুর্ব্বল

হইয়া পড়ে যে আর খাটিতে পারে না। বয়লো রেছাইনকে কবিতা লিখিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন যে তাহার শিক্ষাধীন থাকিয়া রেছাইনের কবিতা লেখা শিখিতে অনেক কষ্ট হইয়াছিল। বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার বেলায় পরিশ্রম লাঘবের জন্য অনেক প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু যে প্রণালী অনুসারে ছাত্রের প্রচুর পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিতে হয় তেমন প্রণালীরই এখন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ধীরগামী ও পরিশ্রম সাপেক্ষ তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালীর একটী উৎকৃষ্ট ফল এই যে উহাতে পুস্তকগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কর্ম্মঠ হয়—হস্ত পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত হয় এবং জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি অভ্যাস গঠিত হয়। আমাদের পরীক্ষায় সাহায্য করিবার জন্য এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য এতগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় যে আমরা অবশেষে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়া থাকি। যদি চাঁদা দ্বারাই সর্ব্বদা কোণের পরিমাণ নির্ণয় করি তবে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোণের পরিমাণ অনুমান করার আর প্রয়োজন থাকে না। চক্ষু নির্ভুল ভাবে রৈখিক দূরত্ব অনুমান করিতে পারে কিন্তু সেই কার্য্য জরিপী শিকলের উপর চাপান হইয়াছে। হাত দিয়া ধরিয়া বস্তুর ভার অনুমান করা যাইত এক্ষণে ষ্টীল ইয়ার্ড নামক যন্ত্র সে কাজ করিতেছে। যন্ত্র যতই পটুতার সহিত নির্ম্মিত হইবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ততই অপটু ও অক্ষম হইয়া পড়িবে। যদি আমরা যন্ত্র দ্বারাই পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ি তবে আমাদের দেহাংশভূত যন্ত্রগুলির যন্ত্রত্ব ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিব।

বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রের পরিবর্ত্তে আমরা যখন নিজে নিজে কোন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে যাই তখন আমাদিগের অনেক নৈপুণ্য ও বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হয়। তাহাতে আমরা ভ্রান্তিগ্রস্ত না হইয়া

বরং লাভবান্ই হইয়া থাকি। স্বাভাবিক ক্ষমতার সহিত কলাবিদ্যার সংযোগ সাধন করাতে আমাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য যেমন বাড়িয়া যায় শিল্প-কুশলতাও তেমনি বাড়িয়া যায়। কোন বালককে কেবল গ্রন্থ-পাঠে আবদ্ধ না রাখিয়া যদি কোন কারখানার কাজে লাগাইয়া দেই তবে তাহাকে হাতে কলমে যে কাজ করিতে হইবে তাহাতে তাহার মানসিক উন্নতি বিধানেরও সাহায্য হইবে। কারখানায় খাটিবার কালে সে নিজকে একজন সামান্য কারিগর মনে করে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সে পণ্ডিত হইয়াও উঠে। এইরূপ কার্য্য করার অন্যান্য উপকারিতাও আছে। পরে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিব। আমরা দেখিতে পাইব যে জ্ঞানচর্চ্চালব্ধ আমোদ প্রমোদ মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকেও অগ্রসর করে।

আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে নিরবচ্ছিন্ন পুঁথিগত বিদ্যা বাল্যকালের উপযোগী নহে, বালক যে বয়সে যৌবনে পা দেয় সে বয়সের পক্ষেও উহা উপযোগী নহে।

বালকদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গভীর তত্ত্ব-সমূহ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই বটে। কিন্তু যে যে পরীক্ষা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, সেইগুলি এমনভাবে পর পর গাঁথিয়া দিতে হইবে যেন তাহারা সহজে মনে রাখিতে এবং প্রয়োজন হইলেই স্মরণ করিতে পারে। কারণ এতাদৃশ কোনও রূপ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া না লইলে আমরা বিভিন্ন ঘটনাবলী এমন কি যুক্তিনিচয়ও বহুকাল মনে রাখিতে পারি না।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুসন্ধান করিতে বসিয়া অতি সাধারণ এবং সর্ব্বদা চখে পড়ে এইরূপ নৈসর্গিক ঘটনা হইতে আরম্ভ করিবে। তোমার ছাত্র যেন ঐ ঘটনাগুলিকে শুধু ঘটনা বলিয়াই মনে করে, কারণ বলিয়া মনে না করে। একখানা পাথর হাতে লইয়া আমি

উহা বায়ুর উপর স্থাপন করিতে চাই বলিয়া দেখাই। আমার হাতে খুলি, অমনি পাথরখানা পড়িয়া যায়। অমল এই পর্য্যন্ত আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল — আমি তাহার দিকে চাহিয়া বলি "পাথরখানা পড়িল কেন?" এমত প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন বালকই দ্বিধা করিবে না। আমি পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা না লইলে অমলও দ্বিধা বোধ করিত না। যে কোন বালক বলিয়া উঠিবে "পাথরখানা ভারী, তাই পড়ে।" আচ্ছা, 'ভারী, এই কথাটার অর্থ কি? কেন? যাহা ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া যায় তাহাই ভারী।" আমার নবীন বৈজ্ঞানিক এই পর্য্যন্ত পৌছিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের এই প্রথম পাঠটি ছাত্রকে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে কতটুকু সাহায্য করিবে ঠিক বলিতে পারি না। তবে ইহাতে যে শিক্ষাটুকু হইবে সেটুকু যে হাতে কলমের শিক্ষা তাহাতে আর ভুল নাই।

কিছুই মানিয়া লইবে না — শিক্ষা ছাত্রের প্রয়োজন নির্ব্বাহের অনুগামী হইবে।

বালকের বুদ্ধিবৃত্তি যতই পরিপক্ক হইতে থাকে তাহার জন্য কার্য্য নির্ণয় করিতে ততই অধিকতর বিবেচনার প্রয়োজন। নিজের সম্বন্ধে এবং যে যে বিষয়ের সহিত তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তৎসম্বন্ধে কালক্রমে বালক এতদূর বুঝিতে পারে যে কি করিলে তাহার মঙ্গল হইবে ও কিরূপ কাজ করা তাহার পক্ষে সম্মানজনক। তখন হইতেই সে কার্য্য ও খেলার পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবে অর্থাৎ বুঝিতে পারিবে যে কার্য্য করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে খেলিলে বিশ্রামলাভ হয় — উক্ত বিশ্রাম প্রদানই খেলার মুখ্য প্রয়োজন। এখন হইতে প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় বালকের পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি কেবল আমোদপ্রদ

হইলে সে যতটা মনোযোগ দিত এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ দিবে। অনেক প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আমাদিগের অনেকস্থলে বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় শিশুকাল হইতেই আমরা ইহা জানি। তাই অনভীপ্সিততর বিপদ্ বা অধিকতর অনিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে অনেক সময় লঘুতর বিপদ্ বা অনিষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরণ করিয়া লইতে হয়। ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। যুক্তিযুক্ত হইলে এই ভবিষ্যদৃষ্টির ফলেই মানবজাতি যাবতীয় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে — আবার অলৌক্তিক হইলে উহাই সর্ব্ববিধ অসুখের কারণ হইয়া পড়ে।

আমরা সকলেই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু তাহা লাভ করিতে হইলে সুখ কি [illegible] তাহা জানা আবশ্যক। প্রকৃতির পন্থানুযায়ী লোকের পক্ষে উহা অতি সহজবোধ্য। সুখ বলিতে সে বোঝে — স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, জীবন ধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ এবং ক্লেশ ও যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ। নীতি ও ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সুখ কি এ প্রশ্নের উত্তর অন্য রকম হইয়া পড়ে কিন্তু উহা আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। বালকগণ কেবল শারীরিক সুখকর বস্তুতেই আমোদ পাইয়া থাকে — যাহাদের গর্ব্বের উদ্রেক হয় নাই অথবা পরের মতরূপ বিষ দ্বারা যাহাদিগের স্বভাব বিকৃত হয় নাই সেই সমুদয় বালকের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে খাটে। এই বিষয়টি আমি এত প্রয়োজনীয় বোধ করি যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা সত্ত্বেও ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উল্লিখিত হইল বলিয়া আমার মনে হয় না।

যখন বালকেরা পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগের ভাবী অভাব পূরণ করিতে আরম্ভ করে বুঝিতে হইবে যে তখন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা সময়ের মূল্য বুঝিতে আরম্ভ

করিয়াছে। সেই বয়সে যে যে বিষয় তাহাদের পক্ষে উপকারী এবং যাহার উপকারিতা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে সেই সেই বিষয়ই তখন প্রধানতঃ লক্ষ্য হইবে। উক্ত বিষয় সমূহে সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে তাহাদিগের মতি জন্মাইতে হইবে এবং সেই সেই কাজ করিতে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। নৈতিক উৎকর্ষাপকর্ষ বা সামাজিক রীতিনীতির কথা বালকদিগের নিকট পাড়িতে হইবে না— কারণ তাহাদের তখনও সেই সব বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। আমরা অনেক সময় ভাসা ভাসা ভাবে, বালকগণকে বলিয়া থাকি এই বিষয়টি জানা তোমাদের পক্ষে উপকারী। অথচ তাহারা বুঝিতে পারে না কেমন করিয়া তাহাদের পক্ষে উপকারী। সেই সব বিষয়ের দিকে জোর করিয়া তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। আবার যদি বলা যায় "তোমরা বড় হইলে এই সমুদয় বিষয় তোমাদের উপকারে আসিবে" তাহাও কম নির্বুদ্ধিতার কার্য্য নহে কারণ যে উপকার তাহারা নিজেরা বুঝিতে পারে না কল্পনার চক্ষে দেখিয়া লইয়া তৎতৎ বিষয়ে অনুরাগী হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

অন্যে এইরূপ বলে এই বলিয়া কোন কিছু মানিয়া লওয়া বালকের উচিত নহে। যাহা নিজে উপকার জনক বলিয়া অনুভব করে না তাহা তাহার পক্ষে উপকার জনকই নহে বলিলে হয়। তাহার বুদ্ধির বর্ত্তমান গণ্ডী হইতে তাহাকে কিছুদূর অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেওয়াটা তুমি পরিণাম-দর্শিতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পার— কিন্তু উহা তোমার ভুল। কারণ যে অস্ত্রের ব্যবহার করিতে সে এখনও শিখে নাই তুমি অনর্থক তাহার হস্তে সেই অস্ত্র দিতে যাইতেছ। অথচ উহা করিতে যাইয়া তাহাকে এমন একটি বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতেছ যাহা মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। ইন্দ্রিয়গণের সম্যক্ পরিচালনা প্রসূত বুদ্ধির মোটামোটি বিকাশকেই আমি উক্ত

সাধারণ সম্পত্তি বলিতেছি। পরের দ্বারা চালিত হইতে, অন্যের হাতের যন্ত্র হইতেই তুমি সর্ব্বদা তাহাকে শিখাইতেছ। বাল্যাবস্থায় যদি তুমি তাহাকে অত্যন্ত বশ্য করিতে চাও তবে বড় হইলে সে অন্ধ-বিশ্বাসী এবং পদে পদে প্রতারিত হইবে। তুমি সর্ব্বদাই তাহাকে বলিয়া থাক "আমি তোমাকে দিয়া এখন যাহা যাহা করাইতে চাই তাহার সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য — তবে তুমি এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছ না বটে। আমি তোমাকে যাহা যাহা করিতে বলি তাহা তুমি কর বা না কর তাহাতে আমার কি আসিবে যাইবে? তোমার নিজের উপকারের জন্যই তোমাকে দিয়া এই সব করান্ হইতেছে।" এইরূপ সুন্দর সুন্দর কথা বলাতে ভবিষ্যতে তাহার কোন প্রবঞ্চক বা মূর্খের হস্তে পড়িবার পথই পরিষ্কার করা হয়। হয় কোন ধূর্ত্ত তাহাকে ফাঁদে ফেলিবে না হয় কোন কল্পনা সর্ব্বস্ব ও বচন সর্ব্বস্ব মূর্খ তাহার নিজের অসার মত তাহাকে দিয়া গ্রহণ করাইয়া লইবে।

বালক যাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে না প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির এমন অনেক বিষয় সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইহা সম্ভব বা সঙ্গত যে বেশী বয়সের মানুষের যাহা জানা উচিত বালকেরও তাহাই শিখিতে হইবে? বালকের পক্ষে বর্ত্তমানে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই তাহাকে শিখাইতে চেষ্টা কর তবেই দেখিবে তাহার যথেষ্ট কাজ যুটিয়াছে। বালকের পক্ষে বর্ত্তমানে অর্জ্জনীয় বিদ্যার ক্ষতিসাধন করিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ কালের উপযোগী বিষয় শিখাইতে চেষ্টা কর কেন? হয়তো তাহার জীবন তৎকাল পর্য্যন্ত পৌছিতেও না পারে। এই কথার উপর তুমি হয়তো বলিবে "যে বয়সে যে জ্ঞানের ব্যবহার করিতে হইবে সেই বয়স উপস্থিত হইলে কি আর তাহা শিখাইবার সময় থাকিবে?" এই প্রশ্নের উত্তর

দিতে আমি অক্ষম। তবে ইহা নিশ্চিত যে অগ্রে শিখাইতে চেষ্টা করিলে সে তাহা শিখিতে পারিবে না। কারণ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষক এবং আমাদিগের নিজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না কোন্ বিষয় আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী হইবে। বালক জানে যে সে কালে প্রাপ্ত-বয়স্ক হইবে। প্রাপ্ত-বয়স্কাবস্থার যে যে বিষয় বালকের বোধগম্য তাহাদের সাহায্যে বালকের শিক্ষাদান-কার্য্য অনেকটা সুকর হয় সত্য। কিন্তু যে যে অবস্থা সে বুঝিতে পারে না সেই সেই বিষয়ে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখাই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই কথাটাই উপর্য্যুপরি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বদিক্ বিনির্ণয়।

আমি বক্তৃতা পছন্দ করি না। বালকেরা উহাতে মনোযোগ দেয় না এবং উহা মনেও রাখে না। কথা চাই না, চাই আসল জিনিষ। আমরা শুধু মুখের কথাকেই বড় উচ্চ আসন দিয়া ফেলি। আমাদিগের শব্দ-সর্ব্বস্ব শিক্ষাপ্রণালীর ফলে প্রকৃত জ্ঞানহীন বচন-সর্ব্বস্ব মানবই গঠিত হইয়া উঠে।

মনে কর আমরা সূর্য্যের আপাত প্রতীয়মান গতির পথ এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বদিক বাহির করিবার প্রণালী আলোচনা করিতেছি এমন সময়ে সহসা আমাকে বাধা দিয়া অমল জিজ্ঞাসা করিল "এই সব বিষয়ের প্রয়োজন কি? এই স্থলে একটা সুন্দর বক্তৃতা করিবার কি সুবিধা প্রাপ্ত হইলাম! তাহার এই প্রশ্নটির উত্তরচ্ছলে আমি তাহাকে কত কি বলিতে পারিতাম! বিশেষতঃ আমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য যদি লোক পাইতাম তবে কত বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারিতাম। আমি ভ্রমণ ও বাণিজ্যের উপকারিতার কথা বলিতে পারিতাম।

আরও নানা বিষয় আমার আলোচনার বিষয়ীভূত হইত যথা, জলবায়ু ভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উৎপন্ন দ্রব্যের কথা; ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার; পঞ্জিকার উপকারিতা; কৃষি বিদ্যায় ঋতু পর্য্যায় নির্ণয়; নৌবিদ্যা; এবং আমাদিগের অবস্থান কোথায় তাহা না জানিয়াও ঠিক নির্ভুলভাবে সমুদ্র পথে ভ্রমণের কথা। ছাত্রের মনে বিবিধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মাইবার ছলে এবং উক্ত বিষয় সমূহে তাহার প্রবল অনুরাগ উদ্রেক করিবার ছলে আমি হয়তো রাজনীতি, উদ্ভিদ বিচার, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতিষ, এমন কি সমাজ বিজ্ঞান এবং আন্তর্জ্জাতিক আইনের আলোচনা করিতেও পারিতাম। কিন্তু আমার বক্তৃতা শেষ হইলে দেখিতে পাইতাম যত বড় বড় কথা বলিয়াছি তাহার একটিও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সে আবারও সম্ভবতঃ জিজ্ঞাসা করিতে চাহিত "পূর্ব্বদিক বাহির করিয়া লাভ কি?" কিন্তু পাছে আমি রাগ করি এই ভয়ে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না। তাহাকে জোর করিয়া যাহা শোনান হইয়াছে তাহা বুঝিবার ভাণ করাই সে তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিত। তথা কথিত বড় বড় বিষয় শিক্ষা দিবার ফল প্রায় এইরূপই দাড়াইয়া থাকে।

কিন্তু আমার ছাত্র অমল সামান্য চাবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে সুতরাং সে পূর্ব্বোক্ত দীর্ঘ বক্তৃতাতে কিছুতেই কাণ পাতিবে না। যেই তাহার দুর্ব্বোধ্য একটি শব্দ উচ্চারিত হইবে অমনি সে তথা হইতে দৌড়িয়া পলাইবে, নিজের মনে আপন কক্ষে খেলিবে, আমার একাকীই শূন্য গৃহে বক্তৃতা করিতে হইবে। এই সুসম্বদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোন কাজ হইল না। এর চেয়ে সহজ একটা উপায় বাহির করা যাউক।

অমল যখন আমাকে বলিতেছিল "ইহা জানিয়া লাভ কি?" তখন আমরা আমাদিগের স্নানের ঘাটের উত্তরে যে অরণ্য অবস্থিত

তাহারই কথা আলোচনা করিতেছিলাম। আমি বলিলাম "তুমি সম্ভবতঃ ঠিক কথাই বলিয়াছ। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। যদি বাস্তবিকই তাহাতে কোন উপকার না হয় তবে আর ঐ দিকে চেষ্টা করিব না। কারণ আমাদের বাস্তবিকই উপকারে আসিতে পারে এমন কত কি বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা করিতেই তো সময়ে কুলায় না।" তারপর আমরা বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইলাম। ঐ দিন আর ভূগোলের আলোচনা হইল না।

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের আগে একটা ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হইল। ইহাতে অমল যারপর নাই সুখী হইল কারণ বেড়াইতে যাইবার জন্য সকল বালকই প্রস্তুত হয়। আর অমল ভ্রমণেও বেশ পটু। আমরা অরণ্যে প্রবেশ করিলাম ইতস্ততঃ বেড়াইলাম, অবশেষে দিকহারা হইয়া গেলাম। বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিলাম কিন্তু ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম না। বেলা হইতে লাগিল। রৌদ্রের কিরণ প্রখর হইয়া উঠিল, আমরা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলাম। বৃথা ঘুরিতে লাগিলাম। যেখানেই যাই দেখি কেবল অরণ্য, প্রস্তরখনি ও প্রান্তর, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। উত্তাপতপ্ত, অবসাদক্লিষ্ট ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমরা যতই ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, ততই আরও বিপথে যাইতে লাগিলাম। অবশেষে বসিয়া পড়িয়া বাহির হইবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য বালকের মত অমলও এতদবস্থায় কেবল কাঁদিতে লাগিল। সে জানিতে পারে নাই যে আমরা স্নানঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, মাঝখানে কেবল একটি সংকীর্ণ বনভূমি আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার কাছে এই সঙ্কীর্ণ বনস্থলী টুকুই একটা বৃহদরণ্য। অরণ্যের ঝোপ জঙ্গলে তাহার মাথা ডুবিয়া গিয়াছিল।

কিছুকাল নীরব থাকিয়া আমি তাহাকে ব্যস্ত সমস্তভাবে বলিলাম "অমল এখান হইতে বাহির হইবার জন্য আমরা এখন কি করিব?"

অমল—(গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতেছিল)—আমি জানি না। আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি—আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইয়াছে। আমি কিছুই করিতে পারি না।

শিক্ষক—আমি কি তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় আছি? কাঁদিলেই যদি খাওয়া মিলিত, তবে আমিই কি না কাঁদিয়া থাকিতাম? কাঁদিয়া কোন লাভ নাই এখন রাস্তা বাহির করিতেই হইবে। তোমার ঘড়ীটা দেখি সময় কত?

অমল—এখন ১২টা বাজিল আর এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি খাইতে পাইলাম না।

শিক্ষক—তাহা সত্য। বারটা বাজিল আমিও এখন পর্য্যন্ত খাইতে পাই নাই।

অমল—আপনার খুব ক্ষুধা লাগে নাই কি?

শিক্ষক—সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে এইখানে বসিয়া থাকিলে আহার আপনা আপনি আসিবে না। কি বলিলে, বারটা? কাল কি ঠিক্ এই সময়েই স্নানের ঘাট কোথায় তাহা দেখিয়াছিলাম না? এই বন হইতেও কি উহার অবস্থান দেখা যাইতে পারে না?

অমল—হাঁ, গত কল্য আমরা অরণ্য দেখিয়াছিলাম আর এখান হইতে সহর দেখা যায় না।

শিক্ষক-সেটা দুঃখের বিষয় বটে। সহরটা চোখে না দেখিলেও এখান হইতে কোন দিকে হইবে তাহা জানিতে পারিলে কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় হইত।

অমল—হাঁ হইতো।

শিক্ষক—তুমি কি বলিয়াছিলেনা যে অরণ্যটি—

অমল—আমাদের স্নানের ঘাটের উত্তরে।

শিক্ষক—যদি তাহা সত্য হয় তবে স্নানের ঘাট অবশ্য—

অমল—অরণ্যের দক্ষিণে হইবে।

শিক্ষক—দ্বিপ্রহরের সময় উত্তর দিক বাহির করার উপায় জান।

অমল—হাঁ; ছায়া দেখিয়া বাহির করা যায়।

শিক্ষক—কিন্তু দক্ষিণ দিক কিরূপে বাহির করিবে?

অমল—কেমন করিয়া আমরা তাহা বাহির করিতে পারি?

শিক্ষক—উত্তরের বিপরীত দিকই দক্ষিণ।

অমল—তাহা সত্য; ছায়া যে দিকে বিস্তৃত তাহার বিপরীত দিক বাহির করিলেই হইল। আঁ। এই তো ঠিক দক্ষিণ দিক। স্নানের ঘাট অবশ্য এই দিকে আছে। এই দিকে একবার তাকাইয়া দেখি।

শিক্ষক - সম্ভবতঃ তুমি ঠিক দিকই বাহির করিয়াছ। চল, জঙ্গলের মধ্যে এই পথ দিয়া চলিয়া যাই।

অমল - (আনন্দে হাতে তালি দিতে দিতে) ঐতো স্নানের ঘাট দেখা যায়। আমার সম্মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এখন তবে আমরা প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের আশা করিতে পারি। তাড়াতাড়ি আসুন। দিগ্নির্ণয় শিখিয়া তবে লাভ আছে।

লক্ষ্য করিবে শেষ কথা কয়টি সে উচ্চারণ না করিয়া থাকিলেও তাহার মনে মনে অবশ্য উদিত হইয়া থাকিবে। ঐ কথাগুলি আমার মুখ দিয়া বাহির না হইলেই হইল। স্থির জানিও আজিকার পাঠ সে জীবনে কখনও ভুলিবে না। যদি তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া কেবল কল্পনা বলে এই বিষয় শিখাইতাম তবে পরের দিনই সে উহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইত। যতদূর সম্ভবতঃ কাজ করিতে করিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহা করা সম্ভব হইয়া উঠে না তাহাই কেবল মুখের কথায় শিখাইতে হয়।

রবিন্‌সন ক্রুসো।

চক্ষু, হস্ত ও প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। কেবল পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষাদান প্রায়ই অফলপ্রসূ ও ভ্রমাত্মক হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় আমরা যাহা বুঝি না পুস্তক পাঠে আমরা কেবল তাহার সম্বন্ধে কথা বলিতেই শিখি। তথাপি শিক্ষা দিতে যাইয়া পুস্তকের সাহায্য যখন লইতেই হইবে তখন আমি একখানা পুস্তকের নাম করিতে চাই। প্রকৃতি সিদ্ধ নিয়মে শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে তাহার মত উৎকৃষ্ট পুস্তক আর নাই। অন্য কোন পুস্তক পড়িবার আগে অমলকে এই পুস্তক পড়িতে দিব। বহুকাল পর্য্যন্ত এইখানাই তাহার একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হইবে আর বরাবরই উক্ত পুস্তকখানি তাহার নিকট সমাদৃত হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে আমরা যে যে আলোচনা করিব তাহা উক্ত পুস্তকেরই কোন না কোন উক্তির ব্যাখ্যা স্বরূপ হইবে। পরিপক্ক বিচার শক্তি লাভের পথে অগ্রসর হইয়া আমাদের যে যে বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইবে এই পুস্তকই তাহাদের সারবত্তা পরীক্ষা করিবে। আমাদের রুচি বিকৃত না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা বরাবরই উক্ত পুস্তক পাঠে আমোদ পাইব। এমন আশ্চর্য্যজনক পুস্তকখানা কি? ইহা কি **আরিষ্টটল, প্লিনি না বাফন?** না, উক্ত পুস্তকের নাম "রবিন্‌সন ক্রুসো?"

আবালবৃদ্ধ সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকটই এই পুস্তকে বর্ণিত উপন্যাসটী আমোদজনক। নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে একটী লোক একাকী অবস্থিত। তাহাকে সাহায্য করিবার লোক নাই। তাহার নিকট কোন যন্ত্রপাতি নাই। তথাপি আত্ম রক্ষার জন্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা দরকার সে তাহা সকলই যোগার করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহাই কেন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

সহস্র প্রকারে ইহা বালকদিগের পক্ষে প্রীতিকর করা যাইতে পারে। আমি এই পুস্তকের প্রথম ভাগেই একটি জনমানবহীন দ্বীপের কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম। আমি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম অমলকে যেন সমাজের সংসর্গ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া একটা নির্জ্জন দ্বীপে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই আখ্যায়িকায় সেই কল্পিত দ্বীপটাকে প্রকৃত দ্বীপে পরিণত করা হইল।

আমি অবশ্য স্বীকার করি যে সমাজবদ্ধ মানবের পক্ষে ইহা প্রকৃত অবস্থা নহে এবং যতদূর অনুমান করা যায় অমল কখনও এমন দ্বীপের অধিবাসী হইবে না কিন্তু এইরূপ অবস্থানে থাকিয়া অন্যান্যের কথা বিবেচনা করা সুবিধাজনক। কুসংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আলোচ্য বিষয়গুলি স্বরূপতঃ কিরূপ তাহা বিচার করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীই অবলম্বন করিতে হয়। নিজকে সমাজ হইতে পৃথক্ ভূত মনে করিতে হইবে এবং তদবস্থায় উক্ত আলোচ্য বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা মনে হয় তদনুসারে বিচার করিতে হইবে।

পুস্তকখানার প্রায় সমস্ত উপখ্যান ভাগই (জাহাজ জলমগ্ন হওয়া অবধি ঐ দ্বীপে অন্য এক জাহাজ যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করা পর্য্যন্ত) উক্ত বয়সে অমলের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ ও আমোদজনক হইবে। ক্রুসোর দুর্গ মেষদল এবং চাষের কথা বলিয়া আমি সর্ব্বদা তাহার মন ব্যাপৃত রাখিতে পারিব। ক্রুসোর ন্যায় অবস্থায় পড়িলে তাহার যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন পুস্তকের পরিবর্ত্তে আসল জিনিষের সাহায্য লইয়া তাহাকে সেই সব বিষয় শিক্ষা দিব। আমি তাহাকে রবিন্‌সনক্রুসোর পাঠ অভিনয় করিতে প্রোৎসাহিত করিব। সে কল্পনা করিবে যে সে যেন চর্ম্মময় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, একটা বড় টুপী মাথায় দিয়াছে, তাহার হাতে অসি আছে, এক কথায় ঐ অদ্ভুত ব্যক্তির যাহা যাহা ছিল তাহার যেন সেই সকলই আছে। সে যে একটা প্রকাণ্ড

ছাতার নীচে থাকিত বালকের পক্ষে তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও সেটাও বাদ পড়ে নাই। আমি আশা করি তাহার কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সে অন্য কিছুর উদ্ভাবন করিয়া সেই কাজ চালাইয়া লইবে। তাহার আদর্শ পুরুষ রুসোর কার্য্যকলাপ সে ভাল করিয়া দেখুক তারপর বিচার করুক যে রুসো যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহার কোনটি অনাবশ্যকীয় ছিল কি না এবং তিনি যে ভাবে যাহা করিয়াছিলেন তাহা অন্য কোন রূপে করিলে ভাল হইত কিনা। সে রুসোর ত্রুটি বাহির করুক যেন অনুরূপ অবস্থায় পড়িলে রুসোর মত ভুল না করিয়া ফেলে। রুসোর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ সম্ভবতঃ সে ও নিজের জন্য সেইরূপ অবস্থা সংঘটনের কল্পনা করিবে। এই বয়সে মানব স্বভাবতঃই হর্ষোৎফুল্ল থাকে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করিলে এবং স্বাধীনতা পাইলেই সে আপনাকে ধনী মনে করিয়া থাকে। বালকের এই রকম খেয়ালের প্রয়োজনীয়তা কম নহে। যদি কোন বুদ্ধিমান লোক পরোক্ষভাবে বালকের মনে এই সব খেয়াল জাগাইয়া দেয় এবং উহার সদ্ব্যবহার করে তবে তাহার বড় উপকার হয়। বালক যদি ভাণ্ডার ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হয় তবে শিক্ষকের শিক্ষাদানের আগ্রহ অপেক্ষা বালকের নিজের শিখিবার আগ্রহই প্রবলতর হইবে। সে উক্ত ঘরের জন্য যাহা দরকার তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার বাহিরে কিছুই শিখিতে চাহিবে না। তখন তাহাকে কর্ম্ম-নিরত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে তো হইবেই না বরং মধ্যে মধ্যে অত্যধিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। বালকের সাংসারিক অবস্থা যত সচ্ছলই হউক না কেন তাহার কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে ইউরোপীয় সমাজে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। এমতাবস্থায় রুসের নিম্নলিখিত কথাগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর মত

হইয়া রহিয়াছে। "সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আপনাদের আস্থা আছে কিন্তু আপনারা চিন্তা করিয়া দেখেন না যে সামাজিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না এবং তাহা নিবারণ কল্লেও কিছু করিতেছেন না। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অধঃপতন সাধিত হইয়াছে, গরীবেরা ধনী হইয়া উঠিয়াছে, রাজা প্রজা হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্যের কসাঘাতে আপনাদের গায়ে কোন আঁচড় লাগিবে না এই কি আপনাদের বিশ্বাস? আমরা একটি বিষম সমস্যাময়যুগের দিকে—বিপ্লবের যুগের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তখন আপনাদের কি দশা হইবে তাহা বলিতে পারেন কি? মানুষে যাহা গড়িয়াছে মানুষ সেই সবই ধ্বংস করিতে পারে। প্রকৃতির নিয়মে গঠিত স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে না কিন্তু তাহা ছাড়া সব রকম চরিত্রেরই বিলোপ সাধন সম্ভবপর। আর প্রকৃতি কাহাকেও রাজা বা রাজপুত্র ধনী বা আভিজাত্য সম্পন্ন করেন নাই। সুতরাং যাহার জন্মগত অবস্থা যেরূপই হউক না কেন প্রত্যেকেরই কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।" আবার অমলের গল্প আরম্ভ করা যাউক। আমি তাহার জন্য সূত্রধরের ব্যবসায় বাছিয়া লইলাম। সে এবং আমি সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন করিয়া জনৈক প্রভুর অধীনে সূত্রধরের কার্য্যতো করিই এমন কি উক্ত কার্য্যের জন্য বেতনও গ্রহণ করি।

দেখিয়া অনুমান করা—ভাঙ্গা লাঠি।

আমার উদ্দেশ্যে যদি এই পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে পারিয়া থাকি তবে এ কথা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে আমার ছাত্র নিয়মিত ব্যায়াম এবং হাতের কাজ করিতে করিতে বেশ চিন্তাশীল হইয়াও উঠে। সত্য বটে সে সমাজের অন্যান্য লোকের সঙ্গে মিশিতে পারে নাই এবং তাহার মনের কোনও প্রবল ভাব এখনও জাগ্রত হয়

নাই। এই উভয় কারণে তাহার কতকটা মানসিক অলসতা আসিবার সম্ভাবনা ছিল বটে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ সেই অলসতা আসিতে পারে না। তাহার একাধারে চাষার মতন পরিশ্রম করিতে হয় এবং পণ্ডিতের মতন চিন্তা করিতে হয়।

ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে পরস্পরের ক্লান্তি অপনোদন করিতে নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহার উপরই শিক্ষাদানের নৈপুণ্য নির্ভর করে। পূর্ব্বে আমাদিগের ছাত্রের শুধু ইন্দ্রিয় জ্ঞানই ছিল কিন্তু এখন তাহার ধারণাও জন্মিয়াছে। আগে সে কেবল দর্শন শ্রবণাদির জ্ঞানলাভ করিতে পারিত এখন সে বিচার করিতেও পারে। পর্য্যায় ক্রমে বা একই সময়ে আমাদিগের কতকগুলি ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইলে আমরা উহাদের মধ্যে তুলনা করিতে থাকি। সেইরূপ তুলনা করিয়া নূতন নূতন সিদ্ধান্তেও উপস্থিত হইয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত তুলনা ও সিদ্ধান্তকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আমাদিগের এক প্রকার বিমিশ্র বা জটিল ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মিয়া থাকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর অনুভূতিকেই ধারণা বলিতেছি।

ধারণা গঠিত হইবার প্রণালী মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। উক্ত বিভিন্নতাই মানবের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশেষত্বের নিয়ামক। যাহার মন বস্তু নিচয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার ধারণা গঠন করে তাহাকেই বলিষ্ঠমনাঃ বলা যাইতে-পারে। আর আপাত প্রতীয়মান সম্পর্ক দেখিয়াই যে সন্তুষ্ট তাহার মন ভাসাভাসা বা পল্লব গ্রাহী আখ্যা পাইবার যোগ্য। বস্তু নিচয় ঠিক যেরূপ কেহ কেহ ঠিক সেইরূপই দেখিতে পায়। তাহাদিগের মন অভ্রান্ত বা নির্ভুল বলা যাইতে পারে। যে তাহা ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারে না তাহার মন বিকৃত বলিতে পারি। যদি সে কি প্রকৃত কি আপাত প্রতীয়মান সম্পর্ক মনে না আনিয়া স্বকপোল কল্পিত কতকগুলি সম্পর্কই দেখে তাহার

মন অসংযত বা বিশৃঙ্খল বলিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি ধারণায় ধারণায় তুলনা করিতেই পারে না তাহাকে দুর্ব্বল মনাঃ বলিব। যে যত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ধারণায় ধারণায় তুলনা করিতে পারে এবং উহাদের মধ্যে কি কি সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে তাহারই মানসিক ক্ষমতা তত বেশী বলিতে হইবে।

সরল ও বিমিশ্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সেই গুলিকেই আমরা সরল ধারণা আখ্যা দিলাম। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বেলায় আমাদিগের বিচার ক্ষমতা প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে। আমরা যাহা অনুভব করি তাহা যে প্রকৃত তাহাই কেবল উহা জোর করিয়া বলিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, বস্তু বোধ বা ধারণা করিবার সময় বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ ও কর্ম্মশীল থাকে। ইহা তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমূহকে একত্র করে, তাহাদের তুলনা করে এবং ইন্দ্রিয়গণের অসাধ্য নানা সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বস্তুবোধের মধ্যে ইহাই একমাত্র পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রকৃতি কখনও আমাদিগকে প্রতারিত করেনা, আমরা নিজেরাই আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আমাদের ভুল হয় না ধারণা বা বিচার করিতেই আমরা ভুল করিয়া বসি।

আট বৎসর বয়সের একটি বালককে বরফমিশ্র এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেওয়া হইল — সে উহার নাম জানে না। খাইতে বড় ঠাণ্ডা লাগিয়াছে তাই সে বলিয়া উঠিল "ইহাতে আমার মুখ পুড়িয়া গেল।" তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি খুব তীব্র হইয়াছে। উষ্ণতা ব্যতীত অনুভূতির এইরূপ তীব্রতার অভিজ্ঞতা তাহার আর নাই। তাই সে ইহাকেও উষ্ণতাই মনে করে। অবশ্য সে ভুল করিল। সে এক প্রকার যাতনা পাইয়াছে সত্য কিন্তু পুড়িয়া যাওয়ার যাতনা নয়। উক্ত অনুভূতিদ্বয় একই প্রকারের নহে কারণ যে ব্যক্তি উক্ত দ্বিবিধ অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছে সে কখনও উহাদের একটিকে অন্যটি বলিয়া মনে করে না। বালকের এই ভুলটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির দোষে ঘটে নাই। তাহার বিচার শক্তিই এই ভুলের জন্য দায়ী।

যখন কেহ সর্ব্বপ্রথমে দর্পণে মুখ দেখে, অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ভূতল নিম্নস্থ কোন কক্ষে প্রবেশ করে, অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল হইতে ঈষদুষ্ণ জলে হাত ডুবায়, দুই অঙ্গুলির মধ্যে একটা ছোট বল রাখিয়া ঘুরাইতে থাকে তখনও তাহার সেইরূপ ভুল হয়। এতদবস্থায় ঠিক্ যে অনুভূতি হয় তাহাই যদি সে প্রকাশ করে ও সিদ্ধান্ত করিতে বিরত থাকে তবে কখনও তাহার ভুল হয় না। কিন্তু যদি সে ইন্দ্রিয়ানুভূতি লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে যায়, বিচারশক্তির প্রয়োগ করিতে বসে, বিবিধ অনুভূতির মধ্যে তুলনা করে এবং যাহা তাহার উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় নাই অনুমান করিয়া এমন কতকগুলি সম্বন্ধ স্থাপিত করে তবেই তাহার ভুল হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ভুল নিবারণ বা সংশোধনের জন্য তৎতৎ বিষয়ের অভিজ্ঞতার আবশ্যক। রাত্রিকালে সঞ্চরণশীল মেঘের উপর বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। সে মনে করিবে মেঘগুলি স্থির হইয়া আছে চন্দ্রই বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাহার এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। বালক সাধারণতঃ দেখিতে পায় ছোট ছোট বস্তুই চলিয়া থাকে, বড় বড় বস্তু প্রায়ই স্থির থাকে। চন্দ্র যে পৃথিবী হইতে কত অধিক দূরে অবস্থিত সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা নাই। তাহার চক্ষে চন্দ্র অপেক্ষা মেঘগুলিই বড় দেখায়। চলিষ্ণু নৌকায় থাকিয়া বালক তীরের দিকে চাহিয়া মনে করে তীরটাই চলিতেছে। সে তাহার নিজের গতি বুঝিতে পারে না। সে মনে করে নিজে, নৌকাখানি, জলরাশি এবং পরিদৃশ্যমান চক্রবাল এই সবটা মিলিয়া যেন একটা পদার্থপুঞ্জ হইয়াছে — চলিষ্ণু তীরটা উহারই এক অংশ মাত্র।

একগাছি লাঠির অর্দ্ধেকটা জলমগ্ন থাকিলে বালকের কাছে উহা প্রথমতঃ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই অনুভূতিটা সত্যই বটে। এইরূপ দেখাইবার কারণ বালক না জানিলেও উহার সত্যতায় সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সুতরাং যদি তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর "কি দেখিতেছ?" সে অমনি উত্তর করিবে "একখানা ভাঙ্গা লাঠি দেখিতেছি" কারণ ভাঙ্গা লাঠি দেখিতেছি বলিয়াই সে স্পষ্টই বুঝিতেছে। কিন্তু বিচারশক্তি দ্বারা প্রতারিত হইয়া সে যখন আরও এক পদ অগ্রসর হয় এবং "ভাঙ্গালাঠি দেখিতেছি" কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া যখন বলে যে "লাঠিটা সত্য সত্যই ভাঙ্গা" তখনই তাহার ভুল হইতেছে। ইহার কারণ কি? তাহার বিচার শক্তি তখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসে — কেবল যাহাযাহা তাহার ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় তদুপরি সিদ্ধান্ত না করিয়া অনুমানের উপরও সিদ্ধান্ত করে। তাই প্রকৃতপক্ষে সে যাহা যাহা অনুভব করে না তাহাকেও সত্য বলিয়া প্রকাশ করে। এইস্থলে শুধু দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হইতে যে সিদ্ধান্ত করে স্পর্শেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানদ্বারা তাহার সত্যতা দৃঢ়ীকৃত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই।

খাঁটি খাঁটি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় এই:— অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া খুব সরল করিয়া লইতে অভ্যাস করিবে। উক্ত অভ্যাসের ফলে কালক্রমে এরূপ দাড়াইবে যে পরে দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় বিশেষের প্রয়োগ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত করিলেও উহা ভুল হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। তবেই এই দাড়াইল যে প্রথমতঃ এক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সত্যতা অন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। বহুবার এইরূপ করিতে করিতে শেষে এমন অভ্যাস হইবে যে একবিধ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য অন্যবিধ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হইবে না। তাহা হইলে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ানুভূতিই

এক-একটা ধারণায় পরিণত হইবে, আর এই ধারণা সত্যমূলক হইবে। জীবনের তৃতীয় স্তরে ছাত্রের মন এইরূপ ধারণা দ্বারা পূর্ণ করিতেই আমি প্রয়াস পাইয়াছি।

এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে যতদূর সহিষ্ণুতা ও সতর্কতার প্রয়োজন অধিকাংশ শিক্ষকেরই তাহা নাই। আবার উহা না থাকিলে ছাত্রকে নির্ভুলরূপে সিদ্ধান্ত করিতে শিখানও সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া যাউক। মনে কর জলমগ্ন লাঠিখানাকে আপাততঃ ভাঙ্গা দেখিতে পাইয়া বালক একটা ভুল সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। এখন যদি লাঠিখানা তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠাইয়া লও তবে তাহার ভ্রম দূর করিতে পার সত্য কিন্তু তাহাতে তাহার প্রকৃত শিক্ষা হইল কি? ইহা ত সে নিজেই শিখিতে পারিত। এইরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একটী সত্য শিখাইবার চেষ্টা করিও না। সে কেমন করিয়া নিজে নিজে যে কোন সত্য আবিষ্কার করিতে পারে তাহা শিখাইয়া দেও। যদি তুমি তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দিতে চাও, তবে সহসা তাহার ভ্রম দূর করিও না। অমল এবং আমি কিভাবে এই শিক্ষা লাভ করিতেছি দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহাই একবার দেখিয়া লও।

প্রথমতঃ কথা এই যে সাধারণ নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালককে লাঠিখানা ভাঙ্গা দেখায় কেন এই প্রশ্ন করিলে সে উত্তর করিবে "লাঠিখানা নিশ্চয়ই ভাঙ্গা।" কিন্তু অমল এইরূপ উত্তর করিবে কিনা সন্দেহ। সে শিক্ষিত হইবার বা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়োজন কখনও অনুভব করে নাই। তাই প্রমাণ ব্যতীত সহসা যে কোনও সিদ্ধান্ত করিয়া বসে না। আপাত দৃষ্টিতে যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা দ্বারা আমরা অনেক সময় প্রতারিত হই। বক্রপৃষ্ঠ দর্পণাদিতে বস্তুর প্রতিবিম্ব ইহার এক দৃষ্টান্তস্থল। অমল এই কথা বেশ জানে সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে যে প্রমাণ পাইল তাহা যে সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে

যথেষ্ট নয় তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। এতদ্ব্যতীত তাহার অভিজ্ঞতা আছে যে আমি যে যে প্রশ্ন করিয়া থাকি তাহাদিগের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য তাহারও এমন উদ্দেশ্য থাকে যাহা সে প্রথমতঃ বুঝিতে পারে না। সে জন্য বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার স্বভাব নয়। পক্ষান্তরে সে অত্যন্ত সাবধান ও মনোযোগী। উত্তর করিবার পূর্ব্বে প্রশ্নের অন্তর্নিহিত বিষয় সে বেশ তলাইয়া দেখে। যে উত্তর তাহার মনঃপূত হয় না তেমন উত্তর সে কখনও আমাকে দেয় না এবং সে সহজে কোনও উত্তর মনঃপূত করে না। তারপর আর এক কথা এই যে সে অথবা আমি কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তত্ত্ব যথাযথরূপে জানি এই বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে চাই না কিন্তু চাই যেটুকু সত্য আমাদের অধিগত হয় তাহা যেন যথাসম্ভব নির্ভুল হয়। অপর্য্যাপ্ত যুক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে আমরা যতটা দুঃখিত হইব তত্ত্ব মোটেই বাহির করিতে না পারিলে তত দুঃখিত হইব না। কোন বিষয় জানি না বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিতে আমরা ভালবাসি এবং অনেক বারই ঐরূপ স্বীকার করিয়া থাকি। তাই উহাতে আমাদিগের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু আমার ছাত্র অসাবধানতা বশতঃই হউক অথবা কষ্ট এড়াইবার উদ্দেশ্যেই হউক যদি "জানি না" বলে আমি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেই "আচ্ছা দেখা যাউক, ইহার বাহির করিতে চেষ্টা করা যাউক।"

লাঠিটার অর্দ্ধেকাংশ জলমগ্ন করিয়া লম্বভাবে রাখা গেল। লাঠিটা আপাততঃ দেখিতে ভাঙ্গাই দেখা যায় বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাঙ্গা কিনা তাহা বুঝিবার জন্য উহাকে জল হইতে উঠাইয়া লইবার পূর্ব্বে, এমন কি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে আরও কত কি করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা উহার চারিদিকে ঘুরিয়া আসি এবং তাহাতে দেখিতে

পাই উহার ভাঙ্গা অংশটুকুও যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। তবেই বুঝা গেল আমাদের চক্ষুই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। শুধু দৃষ্টিপাত দ্বারা তো আমরা কোন বস্তুর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি লাঠিটার অগ্রভাগে ঠিক খাড়া ভাবে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে উহা বাঁকা কি ভাঙ্গা দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুই কি লাঠিটাকে সোজা করিয়া ফেলিল? তৃতীয়তঃ, পাত্রস্থ জল নাড়িয়া চাড়িয়া দেই, জলে ঢেউ উঠে এবং লাঠিখানাও নানাভাবে ভগ্ন ও বক্র হইয়া ঢেউএর সঙ্গে সঙ্গে যেন আপন আকার ও অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। আমরা জলের যে গতি উৎপন্ন করিয়াছি তাহাই কি লাঠিটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল? কঠিন অবস্থাপন্ন বস্তুটাকে তরল করিল এবং গলাইয়া ফেলিল?

চতুর্থতঃ, আমরা পাত্র হইতে জল উঠাইয়া ফেলিতে থাকি এবং দেখিতে পাই পাত্রে জল যত নীচে পড়ে লাঠিখানাও তত সোজা হইয়া উঠে। এই পরীক্ষাগুলি ও দৃষ্টান্তগুলি আলোকের বক্রীভবনের নিয়ম বাহির করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? আমরা চক্ষুর উপর যে ভ্রান্তির আরোপ করি চক্ষুর সাহায্যেই উহা সংশোধন করিতে পারিতেছি। অতএব চক্ষু আমাদিগকে প্রতারিত করে একথা সত্য নহে।

মনে কর ছাত্রটি এমনই বোকা যে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষগুলি হইতেও সে সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। তাহা হইলে আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যার্থে স্পর্শেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিব। লাঠিটা জল হইতে উঠাইয়া না লইয়া বালককে লাঠি বরাবর হাতে দিয়া যাইতে দেও। এমন করিয়া সে লাঠির অগ্রভাগ হইতে জলনিমগ্ন প্রান্ত পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া যাউক। তাহার হাতে কোন কোণা বাজিবে না। সুতরাং বুঝিতে পারিবে যে লাঠিটা বক্র নহে।

তোমরা বলিতে পার এইরূপে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে তো রীতিমত যুক্তি শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শুধু একটা মত গঠন করার উপর নির্ভর করে না। সত্য বটে, কিন্তু তোমরা কি দেখিতে পাওনা যে মানব-মন যদবধি ধারণা করিতে শিখে তখন হইতেই সে যে মত গঠন করে তাহা যুক্তি বই আর কিছুই নহে। কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্বন্ধে জ্ঞাতসার হইলেই একটা মত গঠিত হইল বলিতে পারা যায়। অতএব যখনই আমরা একটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত অন্যটীর তুলনা করি তখনই আমাদের যুক্তি বা বিচার করা হয়। মত গঠন করিবার প্রণালী এবং যুক্তি করিবার প্রণালী একবারে একই বস্তু।

যদি এই পাঠ হইতেও অমল আলোকের বক্রী ভবনের কথা বুঝিতে না পারে তাহা হইলে আর সে উহা মোটেই বুঝিতে পারিবে না। সে কখনও কীটের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিবে না, সূর্য্যের কাল দাগের গণনা করিবে না। অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্র যে কি তাহাও সে জানিবে না।

তোমার ছাত্রগণ তাহার অজ্ঞতায় বিদ্রূপ করিবে এবং তাহা বড় অন্যায় হইবে না। কারণ এই সমুদয় যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সে এইগুলি আবিষ্কার করে ইহাই আমার ইচ্ছা। আর সে পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালী দ্বারাও যদি আলোকের বক্রীভবন বুঝিতে না পারে তাহা হইলে যে তাহার স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া শিখিবার আশা নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বয়সের বালকগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যত প্রণালী আমি অনুমোদন করি এই শেষ কথাটুকুই তাহাদের সকলের সারভূত বিষয়। দুইটী অঙ্গুলী উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে একটী ছোট বল রাখিয়া যদি একটি বালক ঘুরাইতে থাকে সে আপাত দৃষ্টিতে একাধিক বল দেখিতে পায় বটে কিন্তু যদি অন্য কোন উপায়ে তাহার নিঃসংশয়িত ধারণা না জন্মে যে বল

একাধিক নহে তবে আমি তাহাকে উক্ত বলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দিতেই চাহি না।

পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক বালক।

আমার ছাত্রের কতদূর মানসিক উন্নতি হইয়াছে এবং সে কোন পথে অগ্রসর হইয়াছে পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণ দ্বারা তাহা বোধ হয় সুস্পষ্টরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি বহু বিষয় তাহার শিক্ষার বিষয়ীভূত করিয়াছি দেখিয়া তোমরা হয়তো শঙ্কিত হইবে। তোমরা হয়তো আশঙ্কা করিতেছ যে এতটা বিদ্যার গুরুভারে তাহার মন দমিয়া পড়িবে। কিন্তু আমি তাহাকে বিদ্যোপার্জ্জনের এমন একটা পথ দেখাইতেছি যাহা দুর্গম নহে কিন্তু অসীম। সে পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয় আর সেই সুদীর্ঘ পথে চলিতে চলিতে পথের সুদীর্ঘতা বা অনন্ততার বোধ জন্মে। আমি তাহাকে কেবল তাহাকে কয়েক পদ চলিতেই শিখাইব যেন সে শুধু সূচনার জ্ঞানলাভ করিয়াই আপাততঃ নিরস্ত থাকে, বেশী দূর অগ্রসর না হয়। অতএব মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে আমি আমার ছাত্রকে সর্ব্বদেশদর্শী জ্ঞানলাভ করিতে শিখাইতেছি না বরং তাদৃশ জ্ঞানলাভ করা হইতে কি করিয়া বিরত থাকিতে হয় তাহাই শিখাইতেছি।

আত্ম চেষ্টায় শিখিতে বাধ্য হয় বলিয়া সে অন্যের যুক্তি গ্রহণ না করিয়া বিচার শক্তিরই প্রয়োগ করে। আমাদিগের অধিকাংশ ভুলের বেলায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে উহারা যতটা পর হইতে আগত ততটা আত্মকৃত নহে। অতএব অপরের মতের দাস্য-বৃত্তি না করা অভিপ্রেত হইলে শুধু সম্মানার্হ ব্যক্তি বিশেষের কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক পরিশ্রম করিলে দেহ যেমন সবল হইয়া উঠে, সেইরূপ আত্ম নির্ভরশীল হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে মানসিক চর্চ্চা করিলে মনও সবল হইয়া উঠে।

মনই হউক আর শরীরই হউক যাহার সামর্থ্যে যতটুকু কুলায় ততটুকু পর্য্যন্তই সহিতে পারে। কোনও বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া মুখস্থ করিবার পর স্মৃতির সাহায্যে উক্ত অধিগত বিষয় হইতে যাহা গ্রহণ করা যায় তাহা আর পরের জিনিষ থাকে না, উহা বুদ্ধির নিজস্ব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোন বিষয় দ্বারা স্মৃতির ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া রাখিলে হয় তো এই অবস্থা দাঁড়াইবে যে বুদ্ধি তথায় আপনার বলিতে কিছুই খুঁজিয়া পাইবে না।

অমলের জ্ঞান অতি অল্প কিন্তু যেটুকু আছে তাহা তাহার নিজস্ব। সে যাহা জানে সম্পূর্ণরূপেই জানে। তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞানই আধা আধা বা ভাসা ভাসা নয়। একটি প্রধান কথা এই যে যাহা সে ভবিষ্যতে কোনও দিন জানিবে তাহা সে বর্ত্তমানে জানে না। অন্যের অবগত এমন অনেক বিষয় আছে যাহা সে কোনও দিনই জানিবে না। আর সংসারে এমন অসংখ্য বিষয় আছে যাহা সে বলিয়া কেন কোন মানবই কোন দিন জানিতে পারিবে না। প্রত্যেক প্রকারের জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার জন্য সে প্রস্তুত আছে কারণ যদিও তাহার অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ বেশী নহে কিন্তু কি করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয় তাহা সে জানে। তাহার মন সর্ব্ববিধ জ্ঞান গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ আছে। যদিও সে বহু বিষয় শিখে নাই তথাপি তাহার বহু বিষয় শিখিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে। যে যে তত্ত্ব তাহার অধিগত হইয়াছে তৎ সমুদয় উদ্ভাবন করিবার প্রণালী যদি শিখিয়া থাকে এবং যে যে বিষয় সে বিশ্বাস করে সেই সেই বিষয়ের অনুকূলে যে যে যুক্তি আছে তাহা যদি সে শিখিয়া থাকে তবেই আমি সন্তুষ্ট হইব। আমি আবার বলিতেছি জ্ঞান দান করা আমার উদ্দেশ্য নহে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য প্রয়োজন হইলে কেমন

করিয়া উহা অর্জ্জন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া, বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে কোনটি কোন দরের তাহা পরিমাণ করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং সত্যানুরাগী হইতে শিক্ষা দেওয়া। এই প্রণালীতে আমাদের গতি অতি মন্থর হয় বটে কিন্তু বিপথে যাইবার আশঙ্কা থাকে না এবং এক-পাও ফিরিতে হয় না।

অমল কেবল প্রাকৃতিক বা জড়বিজ্ঞানই জানে। সে ইতিহাস অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্তও শোনে নাই। মানবগণ এবং বিবিধ বস্তু এতদুভয়ের মধ্যে যে যে অলঙ্ঘ্য ও স্থায়ী সম্পর্ক আছে তৎসমুদয় সে অবগত আছে। কিন্তু মানুষে মানুষে নৈতিক সম্পর্কের কথা সে এখনও জানে না। সে সহসা কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত করিয়া বসে না। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সাধারণ গুণাবলী থাকিলে সে তাহা লক্ষ্য করিয়া যায় কিন্তু উক্ত গুণাবলী সম্বন্ধে কোনও যুক্তি তর্ক করিতে বসে না। জ্যামিতিক চিত্র ও বীজগণিতের চিহ্নের সাহায্য সে বস্তুর আয়তন ও সংখ্যা সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করে। আয়তন ও সংখ্যা বিষয়ক জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন, তত্ত্ববাচক এবং বস্তু নিরপেক্ষ। এই যে তত্ত্বজ্ঞাপক জ্ঞান তাহা তাহার ইন্দ্রিয় উক্ত চিত্র ও চিহ্নের সাহায্যেই শিখাইয়া দেয়। কোন বস্তুর বিবিধ প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তাহার তেমন চেষ্টা নাই, তবে তাহার নিজের সহিত বস্তু সমূহের যে সম্পর্ক তাহা জানিতে চেষ্টা করে। তাহার নিজের সহিত বাহ্য বস্তু নিচয়ের যে সম্পর্ক সে তাহা দ্বারাই উক্ত বস্তু সমূহের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। এই মূল্য-নির্দ্ধারণ যথাযথ ও স্পষ্ট। উহাতে কল্পনা বা পরচ্ছন্দানুবর্ত্তনের কোনও অবসর নাই। যে বস্তু তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় তাহারই মূল্য তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে এই ধারণা হইতে কখনও বিচ্যুত হয় না এবং সাধারণের মত এই বিষয়ে তাহার উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না।

অমল পরিশ্রমী, সংযমী, সহিষ্ণু, স্থিরধীর এবং সাহসী। কল্পনা জাগরিত হইয়া কোন বিপদ্‌কে অতিরঞ্জিত করিয়া তাহার সমক্ষে প্রদর্শন করে না। অপ্রতিবিধেয় দুঃখের সহিত অনর্থক লড়াই করা তাহার স্বভাব নয়। তাই সে ধৈর্য্যের সহিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে এবং অতি অল্প সংখ্যক বিষয়ই তাহার নিকট ক্লেশকর বোধ হয়। মৃত্যু যে কি তাহা সে ভাল করিয়া বোঝেনা বটে কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া সে মৃত্যুকালে আর্ত্তনাদ ও ছট্‌ফট্‌ করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে। মৃত্যু সকলের পক্ষেই একটা বিভীষিকার বিষয়। সুতরাং স্বভাবের নিয়ম যদি বালককে ঐ ভাবে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে শিখাইতে পারে তবেই যথেষ্ট হইল।

এক কথায় বলা যায় যে নিজের ইষ্ট সাধন এবং অনিষ্ট নিবারণ কল্পে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক অমলের সে সবই আছে। সমাজে মানুষে মানুষে নানাবিধ সম্পর্ক আছে এবং ইহা আছে বলিয়াই মানুষের কতকগুলি সামাজিক গুণ থাকা আবশ্যক। ঐ সম্পর্কগুলির জ্ঞান হইলেই অমল সামাজিক গুণাবলী অর্জ্জন করিতে পারিবে। তাহার মন উক্ত সম্পর্কাবলীর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রস্তুতই আছে। সে আপনাকে অন্যনিরপেক্ষ মনে করে এবং অন্যে তাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিলেই সে সন্তুষ্ট থাকে। সে অন্যের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু আদায় করিতে চায় না এবং অন্যকে তাহার কিছু দেয় আছে বলিয়াও মনে করে না। মানব সমাজে সে একাকী এবং সম্পূর্ণ রূপে আত্মনির্ভরশীল। তাহার বয়সে যাহা হওয়া সম্ভব সে সম্পূর্ণরূপেই তাহাই হইয়াছে সুতরাং স্বাধীনতালাভে তাহার প্রকৃষ্টতম দাবী আছে। মানবের পক্ষে যে যে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী তাহা ছাড়া সে অন্য কোন ভুল করে না। যে পাপ মানবের এড়াইবার উপায় নাই তাহা ছাড়া তাহার অন্য

পাপ নাই। তাহার দেহ যন্ত্রটি সুস্থ ও কর্ম্মঠ, অঙ্গগুলি কার্য্যক্ষম, বুদ্ধিবৃত্তি কুসংস্কার বর্জ্জিত, পক্ষপাতবিহীন ও সত্যপরায়ণ এবং তাহার হৃদয় উদার, স্বাধীন এবং কখনও রিপুপরবশ নহে। আত্ম গরিমা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে কিন্তু তহার চরিত্রে এখনও উহা দেখা দেয় নাই। সে কখনও অন্যের মানসিক শান্তি ভঙ্গ করে না। প্রকৃতি যতটা স্বাধীনতা দিয়াছে ততটা স্বাধীনভাবে সে সুখ সন্তোষময় জীবন যাপন করিয়া থাকে। যে বালক পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্চদশবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছে সে তাহার বাল্যজীবন বৃথা অতিবাহিত করিয়াছে বলিয়া কি বিশ্বাস হয়?